পাভলভ পরিচিতি

(প্রথম খণ্ড)

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৩২/১এ বিধান সরণি
কলিকাতা-৪
থেকে প্রকাশিত

পাভলভ ইনষ্টিটিউট
১৩২/১এ বিধান সরণি
কলিকাতা-৪

মুদ্রক
রবীন্দ্রনাথ দাস
মুদ্রাকর প্রেস
১০/১সি মাবহাট্টা ডিচ লেন
কলিকাতা-৩

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট, ১৯৫৭

উৎসর্গ

অনুজা নলিনীর স্মৃতির উদ্দেশে

সূচী

ভূমিকা

পরিচিত অপরিচিত অনেকেই বহুদিন থেকে বাংলায় পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্তভিত্তিক মনোবিজ্ঞান বিষয়ক একখানি পুস্তক প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আমাদের তাগিদ দিচ্ছিলেন। বাংলা ভাষায় পাভলভের মস্তিষ্কাশ্রিত মনোবিজ্ঞানের কোনো বই লেখা হয়নি। ইংরিজিতে পাভলভের ও তাঁর সহকর্মীদের নির্বাচিত কিছু পরীক্ষানিরীক্ষার বিবরণের অনুবাদ আছে। ইভানভ স্মলেনস্কি, কে. এম. বিকফ, ই. এ. এ্যাসরেটিয়ান প্রমুখ কয়েকজনের পাভলভ সম্পর্কিত কিছু লেখারও ইংরিজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেইসব বই গবেষক ও বিজ্ঞানকর্মীদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করলেও, সাধারণ পাঠকের কাছে ঐ সব পুস্তকের আবেদন খুবই কম। বছর দশেক আগে আমেরিকা থেকে হ্যারী. কে. ওয়েলসের লেখা পাভলভ ও ফ্রয়েড সম্পর্কে দু'খণ্ডের একখানি বই প্রকাশিত হয়। বইখানি সহজ ভাষায় সাধারণের উপযোগী করে লেখা, ফলে পাঠক মহলে বেশ সমাদৃত হয়। বইটিতে পাভলভীয় মনোবিজ্ঞানের সুস্পষ্ট একটা ধারণা তো আছেই, তাছাড়া আছে পাভলভ এবং ফ্রয়েডের গবেষণাপদ্ধতির ও তত্ত্বগত পার্থক্যের বিচার-বিশ্লেষণ। বইটি এখন পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই শুভানুধ্যায়ীদের তাগিদ বেড়েছে। কাজটি আমাদের মত সীমিতশক্তি লোকের পক্ষে সত্যিই দুরূহ। তাই বহুদিন সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। কাজটির সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে এই দুরূহ দায়িত্ব পালনে অবশেষে এতদিনে প্রবৃত্ত হলাম।

মোট চার খণ্ডে 'পাভলভ পরিচিতি' প্রকাশিত হবে। বর্তমান (প্রথম) খণ্ডে যতদূর সম্ভব সরল ভাষায় পত্রাকারে ঘুম স্বপ্ন স্মৃতি সম্মোহন সম্পর্কে পাভলভের পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ তথ্য ও অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। অবশ্য বৈজ্ঞানিক যথাযথতা যাতে বজায় থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখা হয়েছে। কয়েক বছর আগে নাতনী স্থানীয় এক শ্রীমতী লেখকের কাছে জানতে চায়,—সম্মোহন কি ? সেই সূত্রে তার সঙ্গে পত্রালাপ শুরু হয়। মেয়েটি মনোবিদ্যার ছাত্রী নয়,

তবে আজকালকার অন্য সব শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের মত ফ্রয়েড, ইয়ুং-এর নাম জানে। 'নির্জ্ঞান', 'অবদমন', 'লিবিডো' কথাগুলোর মানে বোঝে। কিন্তু পাভলভ সম্পর্কে কিছুই জানে না। তাই তাকে সম্মোহনের শারীরবৃত্ত বোঝাতে গিয়ে লেখককে একেবারে ঘুম থেকে শুরু করতে হয়। 'মানবমন' পত্রিকাতে তার প্রশ্নগুলির উত্তর প্রকাশ করার পর দেখা গেল, সম্মোহন সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ফ্রয়েড, ইয়ুং, ম্যাক্‌ডুগাল ইত্যাদির মনস্তত্ত্বের অনেক কথা বলা হয়েছে। ক্লাইটম্যান প্রমুখ ফ্রয়ডোত্তর স্বপ্নসমীক্ষকদের কথা এসে গেছে, স্মৃতি প্রসঙ্গে নিউরোসার্জন পেনফিল্ড এসে পড়েছেন, ডি-এন-এ, আর-এন-এ প্রসঙ্গ উঠে পড়েছে। সবশেষে গণসম্মোহন প্রসঙ্গে এসেছে ম্যাক্‌লুহানের কথা। পাভলভের মস্তিষ্কভিত্তিক মনস্তত্ত্বের প্রাথমিক পরিচয় দিতে গিয়ে এ-যুগের কয়েকজন বিশিষ্ট মনস্তাত্ত্বিকদের সূত্র ও অভিমত স্বাভাবিক ভাবে আপনা থেকে এসে পড়েছে। ফলে এই খণ্ডটি প্রায় সমকালীন মনস্তত্ত্ব-প্রবেশিকা হয়ে পড়েছে।

প্রারম্ভে পাভলভের বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও পরিশেষে ফ্রয়েড, ইয়ুং, ম্যাক্‌ডুগাল, দেকার্তের অতি-সংক্ষিপ্ত পরিচয় ছাড়া বইটির আর সবটাই শ্রীমতী নাতনীর প্রশ্নের উত্তর পত্রাকারে লেখা।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে থাকবে পাভলভের শর্তাধীন-পরাবর্তভিত্তিক মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা, শিশু-মনস্তত্ত্ব, মস্তিষ্কটাইপ, মনোরোগ চিকিৎসা ও রোগ-ইতিহাসের বিবরণ। চতুর্থ খণ্ডে থাকবে পাভলভ, ফ্রয়েড ও স্কিনারের মতবাদ, চিকিৎসাপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনামূলক পর্যালোচনা।

এই স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রথম খণ্ডটিকে 'পাভলভ পরিচিতি— প্রাথমিকা বা উপক্রমণিকা' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। মনে হয় অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকার কাছে এই খণ্ডটি সহজবোধ্য হবে এবং মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে তাঁদের অন্তত আংশিক পরিচয় ঘটবে।

পাভলভের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ইভান্ পেত্রোভিচ্ পাভলভ্ (১৮৪৯-১৯৩৬) আমাদের দেশে এখনও অপরিচিত বললেই চলে। তাঁর 'কন্‌ডিশন্‌ড্-রিফ্লেক্স' কথাটি অল্পাধিক জানা আছে অনেকের কিন্তু এর সঠিক তাৎপর্য এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান ও প্রধানত মনোবিজ্ঞানের উপর পাভলভের এই 'কন্‌ডিশন্‌ড্-রিফ্লেক্স' আবিষ্কারের প্রভাব সম্বন্ধে আমাদের দেশের পণ্ডিত ব্যক্তিরাও সম্পূর্ণ সজাগ নন।

মনোবিজ্ঞান এই সেদিনও দর্শনশাস্ত্রের আওতার মধ্যে আটকা ছিলো। সত্যিকারের বিজ্ঞানের পর্যায়ে আসবার ও স্বাতন্ত্র্য লাভের চেষ্টা দেখতে পাই ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে। এই সময় জার্মানীতে ওয়েবার, মুলার, হেল্‌মহোজ প্রভৃতি ফিজিওলজিষ্টরা দর্শন ও শ্রবণইন্দ্রিয় বিষয়ক বহু নতুন তথ্য আবিষ্কার করেন, ইংলণ্ডে "Expression Of The Emotions In Men And Animals" বইখানি এই সময় প্রকাশিত হয় এবং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে জার্মানীতেই ভোকনার ও উন্দ্ মনস্তত্ত্বের পৃথক গবেষণাগার স্থাপন করেন। আমেরিকায় জন হপকিন্স ইউনিভারসিটিতে মনস্তত্ত্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক কাজকর্মের সূত্রপাত হয় ১৮৮১ সাল থেকে। এর কিছু আগে আবার মস্তিষ্কে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্রস্থান আবিষ্কার-পর্ব শেষ হয়েছে। মোট কথা উনিশ শতাব্দীর শেষ দিকে রহস্যবাদ ও অধ্যাত্মবাদের আওতা থেকে মনোবিজ্ঞান বেরিয়ে এলো স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে। প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার, এ্যানাটমী, ফিজিওলজী ও বায়োলজীর ক্রমোন্নতিই ক্রমশ দর্শনশাস্ত্র থেকে মনস্তত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে এলো। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছিল পদে পদে। মস্তিষ্ক যে মনন-ক্রিয়ার ভিত্তি এ ধারণা বৈজ্ঞানিকদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেলেও বিজ্ঞানের পক্ষে এ ধারণাকে বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত

করা সম্ভব হচ্ছিল না। মস্তিষ্ক যে কিভাবে কাজ করে—এ তাঁরা জানতেন না এবং মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানের সূত্রগুলি আবিষ্কারের পদ্ধতিও তাঁরা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। কাজেই নানারকম কল্পনার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না।

মনন-ক্রিয়া ও চৈতন্য সম্পর্কে দার্শনিকদের মতোই বৈজ্ঞানিকরাও অনুমানের ওপর নির্ভর করে এগুতে চাইলেন। বলা বাহুল্য, এ পন্থা বিজ্ঞানে অচল। ফল হল—হাজার রকমের থিওরী ও মনস্তাত্ত্বিকদের মধ্যে বিবদমান হাজার রকমের সম্প্রদায়। এইরকম ক্ষেত্রে যা ঘটে থাকে তাই ঘটলো। এঁরা সবাই সামন্ততান্ত্রিক যুগের "অমর, অপরিবর্তনীয়" আত্মাকে নস্যাৎ করলেন, এবং বললেন, মন মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু আবার, মস্তিষ্ক কতকগুলো জন্মগত অপরিবর্তনীয় বিশেষ বিশেষ গুণাবলীর আধার—এ-তত্ত্বের অবতারণা করে "নতুন বোতলে পুরণো মদ" পরিবেশনের কাজ করলেন। উইলিয়ম জেম্‌সের কথাই ধরা যাক। আত্মাকে অস্বীকার করে বললেন মস্তিষ্কই মনের আধার। এই মস্তিষ্কের দুটো দরজা ; সামনের ও পেছনের। সামনের দরজা হচ্ছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চৈতন্যের রাজ্য আর পেছনের দরজায় আছে অপরিবর্তনীয় সহজাত আদিম প্রবৃত্তি ও আবেগ ইত্যাদি। এই আদিম প্রবৃত্তির মধ্যে আছে ব্যক্তিগত সম্পত্তিলাভের বাসনা, সেই সম্পত্তি রক্ষার্থে লড়াইএর তাগিদ ও আরও নানা রকমের হিংসাত্মক ও পাশব মনোভাব। ভদ্রলোক বা শ্রমিক হবার যোগ্যতা ও জন্মগত অধিকার নিয়ে মানুষ জন্মায়। 'বিধিদত্ত' কথাটি কে উহ্য রেখে পূর্ববর্তীকালের প্লেটো, সেণ্ট জন, সেণ্ট টমাসের কথারই পুনরুক্তি করলেন মাত্র। পরবর্তীকালের ফ্রয়েডের মনের ত্রিস্তর গঠন-তত্ত্বের—(ইগো, সুপার ইগো, ইদ) মধ্যে ভিয়েনার তৎকালীন সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রতিফলন দেখা যায়। মানুষের নির্জ্ঞান মনই আসলে মানুষের ব্যবহার ও চিন্তাধারার নিয়ামক ;—এই তত্ত্ব জন্মগত সূত্রে আয়ত্ত প্রবৃত্তিগুলির প্রাধান্যই ঘোষণা করে না শুধু, মনোজগতের অপরিবর্তনীয়তারও ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। নির্জ্ঞানতত্ত্ব আসলে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের অজ্ঞতার স্বীকারোক্তি। মোট কথা, মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের অজ্ঞতা থেকেই মনস্তত্ত্বের এই দুর্যোগ। মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানের অনগ্রসরতার মূলে ছিল নতুন পদ্ধতির অভাব। পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিশেষ পদ্ধতির আবিষ্কার বিজ্ঞানে নতুন থিওরি আবিষ্কারের মতই গুরুত্বপূর্ণ। পাভলভ মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য একটি বিশেষ স্বকীয় পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই পদ্ধতির ওপর বহুলাংশে নির্ভর

করছিলো মনোবিদ্যার ভবিষ্যৎ। একটু পরেই এই পদ্ধতি নিয়ে আমরা আলোচনা করবো।

পাভলভ ও তাঁর আবিষ্কারের সম্যক্ পরিচয় দিতে হলে পাভলভের পূর্বসূরী সেচেনফ্ (Sechenov) সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা দরকার। এই সেচেনফই বোধ হয় প্রথম শারীরবৃত্তবিদ্ যিনি পুরোপুরি বস্তুবাদী দর্শনের দৃষ্টিতে মানসিকতার মস্তিষ্কাশ্রিত কার্যকলাপের সন্ধান করেন। তিনিই প্রথম বৈজ্ঞানিক, যিনি এ কথা জোরের সঙ্গে বলতে পেরেছিলেন যে মন দেহ নিরপেক্ষ তো নয়ই, বরং দেহের একটি অংশের, মস্তিষ্কের বিশেষ ধরনের বৃত্তি। ডারউইনের 'অরিজিন্ অব্ স্পেসিস্' প্রকাশিত হবার মাত্র চার বছরের মধ্যে সেচেনফের বহু আলোচিত পুস্তক 'রিফ্লেক্সেস্ অব্ দি ব্রেণ' (১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে) তখনকার দিনের পাদ্রীপুরুতদের আধ্যাত্মিক ধারণামূলে, ভাববাদী দর্শনের সুরক্ষিত দুর্গদ্বারে হেনেছিল প্রচণ্ড আঘাত। দুর্গের পতন ঘটেনি বটে কিন্তু চার দেয়ালেই কাঁপন লেগেছিল। জাবের দরবারে সোরগোল উঠেছিল।

সেচেনফ্ পরাবর্তকে (reflex) কেন্দ্র করে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। পরাবর্তের তিনটি পর্ব। প্রথম পর্বে, বহির্জগতের উদ্দীপনা ইন্দ্রিয়ের গ্রাহী অংশকে (চোখ, কান, নাক ইত্যাদি) উত্তেজিত করে; দ্বিতীয় পর্বে, এই উত্তেজনা-তরঙ্গ নার্ভ মারফৎ মেরুদণ্ড বা মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছয়। এখানে আবার নানারকম জটিল স্নায়ু-সংযোজন ঘটে; তৃতীয় পর্বে, এই উত্তেজনা তরঙ্গ বহির্বাহী নার্ভের মারফতে গিয়ে পেশী বা গ্রন্থিকে সঙ্কুচিত করে। নিম্নপ্রাণীর মধ্যে এই পরাবর্ত ক্রিয়া নিয়ে বহুবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এর আগে হয়েছিল এবং তার থেকে মেরুদণ্ডের উত্তেজনা-নিস্তেজনা সম্পর্কিত সম্যক জ্ঞান শারীরতত্ত্ববিদ্গণ লাভ করেছিলেন।

সেচেনফ্ বললেন, মানসিক ও আত্মিক সব রকমের ক্রিয়া-কলাপই মস্তিষ্কের কোনো না কোনো রকমের পরাবর্ত; অন্যান্য স্নায়ু প্রক্রিয়ার সঙ্গে মনন-ক্রিয়ার সংগঠনকারী পরাবর্ত ক্রিয়ার কোনো তফাত নেই।

তিনি বললেন: "The brain is an organ of the spirit i.e. a mechanism which when brought into activity by any kind of cause produces as final that series of external phenomena which we characterise as psychical

activity."* মনোজগতের সংখ্যাতীত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জটিল ক্রিয়াকলাপ মস্তিষ্কের কোনো না কোনো পরাবর্ত-সঞ্জাত। আপাত-দৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হলেও, এ ধারণা সত্য। মানসিক ক্রিয়াকলাপের, সে যে কোনো ধরনেরই হোক না কেন, প্রকাশ শেষপর্যন্ত পেশী সংকোচনে, বললেন সেচেনফ্: হয় কাজে, নয়ত লেখায় বা কথায়। খেলনা হাতে পেয়ে শিশুর আনন্দ, প্রথম প্রেমের আবির্ভাব-চিন্তায় নারীর দেহের মৃদু কম্পন, পিতৃভূমিকে ভালবাসার অপরাধে দণ্ডিত গ্যারিবল্ডির হাসি,—এ সবেরই অভিব্যক্তিতে দেখতে পাই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ জায়গার পেশীর সংকোচনজাত ক্রিয়া।

এ হল পরাবর্তের তৃতীয় পর্বের কথা।

এর পর তিনি দেখাতে চেষ্টা করলেন যে এই সব মানসিক ক্রিয়াকলাপের মূলে পরাবর্তের প্রথম পর্বের স্নায়ু উত্তেজনা বর্তমান। অর্থাৎ বাইরের কোনো উদ্দীপক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহী-অংশকে উদ্দীপ্ত করার ফলেই এই তৃতীয় পর্বের অভিব্যক্তি অর্থাৎ পেশী সঙ্কোচন ঘটছে। এখানে সেচেনফ্ প্রচলিত দুটি তত্ত্বের সাহায্য নিলেন। প্রথমটি লকের দার্শনিক মতবাদ: মানসিক সমস্ত জটিল ধ্যানধারণাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সরল অনুভূতির সমন্বয়। দ্বিতীয়টি নিম্নশ্রেণীর পরাবর্ত সংক্রান্ত অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক ধারণা যে বহির্বাস্তবের উদ্দীপনা ছাড়া পরাবর্তক্রিয়া ঘটতেই পারে না। এ দুটিকে মিলিয়ে সেচেনফ্ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন যে মননক্রিয়া পরাবর্তের প্রথম ও তৃতীয় পর্বের অনুষ্ঠান মেনে চলে। এখন প্রমাণ করা দরকার যে, ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনা ও পেশী সঙ্কোচনের মধ্যে মস্তিষ্কের ক্রিয়া নিহিত রয়েছে অর্থাৎ মস্তিষ্ক-মাধ্যমেই সংযোজনের ফলে গ্রাহী উদ্দীপনা বহির্বাহী উদ্দীপনায় রূপান্তরিত হচ্ছে, যার ফলে ঘটছে পেশী-সঙ্কোচন। তাহলেই মননক্রিয়াকে পরাবর্ত বলতে আর কোনো বাধাই থাকে না। এখানেও সেচেনফ্ নিম্নপ্রাণীর উদাহরণ দিয়ে তাঁর তত্ত্বকে সপ্রমাণ করার চেষ্টা করলেন। বলা বাহুল্য তাঁর এ বিপ্লবী ধারণাকে সুসংস্কৃত ও যথাযথভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছিল পরবর্তীকালে পাভলভ-উদ্ভাবিত বিশেষ পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা।

সেচেনফের ধারণাগুলি প্রমাণসাপেক্ষ হলেও খুবই চিত্তাকর্ষক ছিল নিঃসন্দেহে। তিনি অনুমান করলেন, মস্তিষ্কে এমন কতকগুলি কেন্দ্র আছে যাদের কাজ পরাবর্তের তৃতীয় পর্বকে প্রভাবিত করা। পেশী সঙ্কোচনের হ্রাস

বৃদ্ধির মূলে রয়েছে এই কেন্দ্রগুলির ক্রিয়াকলাপ। অবশ্য এ ক্রিয়াকলাপও বহির্জগতের ঘটনা বা উদ্দীপকের উপর নির্ভরশীল। এই প্রসঙ্গে মস্তিষ্কের নিস্তেজনা [inhibition] নিয়ে তিনি আলোচনা করেন।

পুরস্কারের লোভ বা শাস্তির ভয় দেখিয়ে শিশুর ব্যবহারকে প্রভাবিত করা যায়। বহির্বাস্তবের উদ্দীপকের প্রভাবেই শিশু অনেক ইচ্ছা দমন করে, অনেক অবাঞ্ছিত কাজ পরিহার করে। সামাজিক কারণে বড়দেরও অনেক রকমের মনোভাব ও আচরণ দমন ও নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষিত নিম্নপ্রাণীর মেরুদণ্ডের স্নায়ু নিস্তেজনার সঙ্গে এ ব্যাপারগুলো তুলনা করে সেচেনফ্ বললেন—এগুলো মস্তিষ্কের বিশেষ কেন্দ্রের নিস্তেজনার ফল।

সেচেনফের মতে চিন্তা হচ্ছে অনুচ্চারিত কথা। পরাবর্তের তৃতীয় পর্ব অর্থাৎ স্বরযন্ত্র, জিহ্বা ইত্যাদি স্বরোৎপাদক পেশী সঙ্কোচন দমনের ফলে চিন্তার জন্ম। তাঁর ভাষায়—"In a thought, we have both the beginning of a reflex and its continuation ; only the end of the reflex (i. e. the movement) is apparently absent." আবার প্রক্ষোভের বেলায় পরাবর্তের তিনটি পর্বই কাজ করছে, উপরন্তু তৃতীয় পর্বের ক্রিয়াকলাপ, পেশী সংকোচন অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। কোনো বিশেষ কারণে বা মস্তিষ্কের বিশেষ অবস্থায়, উদ্দীপকের সাড়া স্বাভাবিকতার সীমা ছাড়িয়েছে।

এইভাবে, সংবেদন, উপলব্ধি, সংকল্প, স্মৃতি, কল্পনা, প্রেম, বাৎসল্য ইত্যাদি মনের সমস্ত আবেগ অনুভূতিকে সেচেনফ্ মস্তিষ্কের পরাবর্তক্রিয়ারূপে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেন। আত্মিকক্রিয়ার প্রেরণা সব সময়েই জাগতিক ও পরিবেশের প্রভাবাধীন—এই ছিল তাঁর বক্তব্য। তদানীন্তন ভাববাদী ও ধর্মধ্বজীদের প্রচলিত প্রতিক্রিয়াশীল ধারণাকে আক্রমণ করলেন সেচেনফ্। রাতারাতি তাঁর "Reflex Of The Brain" এর নাম রাশিয়ার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। মন সম্পর্কিত এই বস্তুবাদী দলিলটিকে জার সরকার সহজভাবে নিতে পারলেন না। বইটি নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হল। তবে অধ্যাপক সেচেনফ উচ্চপদস্থ বন্ধুদের হস্তক্ষেপের ফলে নির্বাসনদণ্ড থেকে অব্যাহতি পেলেন।

শারীরবিদ্যার সম্যক জ্ঞান, মস্তিষ্ক ক্রিয়াকলাপের গবেষণা ছাড়া যে মনোবিদ্যার জ্ঞান লাভ অসম্ভব—এই ধারণাকে বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন

সেচেনফ্। "Strictly adhering to the principle of induction, physiology will begin with a detailed study of the more simple aspects of psychical life and will not rush at once into the sphere of highest psychological phenomena. Its progress will therefore lose in rapidity but it will gain in reliability." তাঁর এই কথাগুলো উত্তরকালে পাভলভের গবেষণা ও পরীক্ষানিরীক্ষাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল নিশ্চয়ই। ১৯১৫ সালে সেচেনফের দশম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে পাভলভ বলেছিলেন, "The application of the reflex principle to explain the activity of the higher nervous centres is a proof that causality can be applied to higher forms of organic nature. For this reason the name of Sechenov will forever remain dear to the Russian scientific world".

উচ্চতম মননক্রিয়া কার্যকারণ সম্পৃক্ত, প্রাকৃতবিজ্ঞানের নিয়মশৃঙ্খলা মনোবিজ্ঞানেও প্রযোজ্য,—সেচেনফের এই ধারণাদ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ইভান পেত্রভিচ। তাই গড়ে উঠতে পেরেছে বাস্তববাদী মনস্তত্ত্ব—যাকে আজ অসঙ্কোচে মনোবিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া যায়।

আত্মিক ক্রিয়াকলাপের কার্যকারণ সম্পর্ক সেযাবৎ কোনও নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে বাঁধতে পারেননি বিজ্ঞানীরা; কাজেই নানারকমের রহস্যবাদ ও অধ্যাত্মবাদের প্রসার ঘটছিল। জাগতিক নিয়মশৃঙ্খলার হদিশ অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া গেছে যে মস্তিষ্কের সাহায্যে, সেই মস্তিষ্ক তখনও পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত দেশ। পাভলভ তাঁর বিশেষ পরীক্ষা-পদ্ধতির সাহায্যে বহু উপাত্ত-তথ্য সংগৃহীত করলেন দীর্ঘদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে। এখন গবেষণাগারে উদ্দীপককে বিশ্লেষণ করা যায়, তার শক্তির তারতম্যও নিয়ন্ত্রণ করা চলে। তথ্যাদির সামন্ত্রীকরণের ফলে মস্তিষ্ক ক্রিয়ার সাধারণ কতকগুলো সূত্র পাওয়া গেল।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে হজম ক্রিয়ার উপর নতুন আলোকপাতের জন্য পাভলভ নোবেল প্রাইজ পান। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো চালাবার সময় কুকুরের লালা ঝরার দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে। যে লোকটি কুকুরের খাবার দিতো তার পায়ের শব্দ শুনলেই কুকুরদের লালা ঝরতে শুরু হতো। থালা-বাসনের শব্দ শুনলেও

লালা ঝরতো। কেন এই লালা ঝরে? কেন আপেল মাটিতে পড়ে?—প্রায় এই ধরনেরই প্রশ্ন। অতি সহজ প্রশ্ন, উত্তরও অতি সোজা সাধারণের কাছে। কুকুর বুঝতে পারছে খাবার আসছে, তাই। নিজের মনকে দিয়ে কুকুরকে বোঝবার এই প্রচেষ্টাই ছিল মনস্তত্ত্বের প্রশ্ন মীমাংসার উপায়। একে বলা যায় anthropo-morphic চিন্তা, দার্শনিকদের অন্তর্দর্শন (ইনট্রোস্পেকশান) পদ্ধতি। কিন্তু প্রকৃতি-বিজ্ঞানের দিক থেকে এ প্রথা অচল। ব্যক্তি-নিরপেক্ষ অব্‌জেক্‌টিভ্‌ বৈজ্ঞানিক সত্যে পৌঁছুবার রাস্তা এ নয়, একথা পাভলভ বুঝেছিলেন। তাঁর মনে জাগলো দুটি কথা: (১) কুকুর মানুষের মত চিন্তা করতে পারে, তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কোথায়? (২) মস্তিষ্কের কোন ধরনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে এই লালা ঝরার সম্পর্ক? কুকুরের পক্ষে এটা মনন ক্রিয়ারই সামিল। কিন্তু এই মননক্রিয়ার তাৎপর্য কী? কিভাবে এই মনন-ক্রিয়ার মস্তিষ্ক-ভিত্তিক ব্যাখ্যা মিলবে? এই চিন্তা থেকেই নতুন পদ্ধতির উদ্ভব।

ছোট একটি অস্ত্রোপ্রচার করে লালা নিঃসরণ গ্রন্থনালীর (স্যালিভারী ডাক্ট) এক প্রান্ত বাইরে এনে চামড়ার সঙ্গে সেলাই করে দেওয়া হলো। তারপর কুকুরটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলে তার ওপর পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো হলো। এই পাভলভীয় পদ্ধতিটি মস্তিষ্কবিজ্ঞান তথা মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যুগান্তর নিয়ে এলো। সুস্থ জীবন্ত প্রাণীর ওপর এর আগে ফিজিওলজিষ্টরা বড় একটা পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগ পেতেন না। একটা বিশেষ যন্ত্রকে দেহ থেকে আলাদা করে ফেলে তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দেখা হতো। বলা-বাহুল্য, সুস্থ গোটা প্রাণীর মধ্যে যন্ত্রটি অন্যান্য যন্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুন্ন রেখে কিভাবে কাজ করে যাচ্ছে, সেটা বোঝবার উপায় এ নয়। এদিক দিয়ে পাভলভ-পদ্ধতির উন্নত ধরন অনস্বীকার্য। লালা নিঃসরণ বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করা ও লালার পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হলো এই পদ্ধতিতে। খাদ্য দেখে বা খাদ্য পরিবেশকের পায়ের শব্দের দরুন লালা নিঃসরণ যে উচ্চতর মস্তিষ্কের ক্রিয়া, এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল না। এইবার উচ্চ মস্তিষ্কের ক্রিয়া কলাপের নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করার পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হলো। মস্তিষ্কের ক্রিয়া-কলাপের হদিশ নির্ণয়ের সূত্রপাত এই সময় থেকে। নিয়ন্ত্রিত ও পূর্বনির্ধারিত অবস্থার মধ্যে মস্তিষ্ক বিশেষ করে গুরু মস্তিষ্ক (করটেক্স-সেরিব্রাই) নিয়ে গবেষণা শুরু হলো প্রকৃতি-বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুযায়ী।

ঘণ্টা বাজানো হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে খাবার দেওয়া হচ্ছে কুকুরকে। কয়েকবার এইরকম করার পরে শুধু ঘণ্টা বাজানোর পর দেখা গেলো কুকুরের লালা ঝরছে ও সে খাবার জায়গার দিকে যাবার চেষ্টা করছে। এই হচ্ছে কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স আবিষ্কারের আদি এক্সপেরিমেন্ট। ঘণ্টাধ্বনিকে বলা হয় শর্তাধীন উদ্দীপক, (কণ্ডিশনড্ ষ্টিমুলাস্) ও কুকুরের ওপর তার প্রতিক্রিয়াকে বলা হয় শর্তাধীন পরাবর্ত (কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স)। খাদ্যের সঙ্গে মুখের সংস্পর্শে স্বাভাবিকভাবে যে লালা নিঃসরণ হয়ে থাকে তাকে বলা হয় শর্তহীন পরাবর্ত (আন্‌কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স); সাধারণের ভাষায় সহজাত আদিম জৈবক্রিয়া (ইন্‌স্‌টিঙ্কটুয়াল এ্যাক্‌টিভিটি)। এই ক্রিয়ার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন নেই। এই ক্রিয়ার কেন্দ্রস্থল নিম্নমস্তিষ্ক (সাবকর্‌টিকাল্ রিজিয়ান্)। কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স নিয়ে জীব জন্মায় না। এই রিফ্লেক্স বাইরের পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে গিয়ে আয়ত্ব করে। ঘণ্টাধ্বনি উচ্চ মস্তিষ্কের শ্রবণকেন্দ্রে উদ্দীপনা জাগায়। সেই উদ্দীপনার সঙ্গে সহজাত জৈব-ক্রিয়ার দরুন নিম্ন-মস্তিষ্কের উদ্দীপনার যোগাযোগ ঘটার ফলে পরবর্তীকালে শুধু ঘণ্টাধ্বনি খাদ্য-প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তোলে। এইভাবে জন্মের পর-মুহূর্ত থেকে মানব শিশু (সব প্রাণীই) বহির্বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে, নতুন গুণ আয়ত্ব করে ও পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে শেখে। এই হচ্ছে জীবজগতের-শিক্ষালাভের একমাত্র উপায়। এই ক্রিয়াকলাপ (কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স) একান্তভাবে উচ্চমস্তিষ্কের উপর নির্ভরশীল। আন্‌কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স জাতিগত (species) বৈশিষ্ট্য আর কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। এক এক জাতীয় প্রাণী কতকগুলো আন্‌কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স (সহজাত আদিম প্রবৃত্তি) নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, এগুলো তাদের শিখতে হয় না। মাকড়সার জাল বোনা, বাবুই পাখীর বাসা বাঁধা, এ সবই আন্‌কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স। মানবশিশু কতকগুলো সহজাত আদিম প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, সেগুলো মানবজাতির বৈশিষ্ট্য। অবশ্য সঠিকভাবে বলতে গেলে বলা উচিত, সহজাত প্রবৃত্তি বা 'ইন্‌ষ্টিংটুয়াল এ্যাক্‌টিভিটি' অনেকগুলো 'আন্‌কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্সের' জটিল মিশ্রণ থেকে উদ্ভূত। তবু সুবিধের জন্য এই প্রবন্ধে আমরা 'আন্‌কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স' আর 'ইন্‌সটিঙ্কটুয়াল্ এ্যাক্‌টিভিটিকে' একই অর্থে ব্যবহার করছি।

যে কুকুরকে কণ্ডিশনড্ করা হয়েছে অর্থাৎ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তার কাছেই মাত্র ঐ ঘণ্টা বাজানোর দাম আছে। অন্য কুকুর ঘণ্টা বাজানোর দ্বারা

উদ্দীপ্ত হবে না,—তার লালা ঝরবে না। শুধু ঘণ্টাধ্বনি নয়, যে কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উদ্দীপক দিয়ে (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক ইত্যাদি মারফৎ) কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স তৈরী করা সম্ভব। যে কোনো আন্‌কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্সের উত্তেজক ও বহির্জগতের যে কোনো উদ্দীপক এইভাবে সংযুক্ত হয়ে নতুন কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স তৈরী করতে পারে। অনেক পুরণো কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স এর ওপর ভিত্তি করে আবার নতুন কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স তৈরী হতে পারে।

একটা খুব দরকারী কথা এখনও বলা হয়নি। আন্‌কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স সর্বাবস্থায়, সব সময় একইভাবে কাজ করবে—এটা চিরস্থায়ী ব্যাপার। অর্থাৎ মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীতে পথ তৈরীই রয়েছে। কিন্তু কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স স্থায়ী নয় ও সর্বাবস্থায় কার্যকর হবে না। শর্তগুলি যথাযথ না হলে রিফ্লেক্স তৈরী হবে না। একবার একটি কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স তৈরী হলে সেটা চিরকালই টিঁকবে, এমন নয়। ঘণ্টা বাজানোর পর যদি কয়েকবার কুকুরকে খাবার দেওয়া না হয়, অর্থাৎ শর্তহীন উদ্দীপনা যদি বন্ধ থাকে, তবে ঘণ্টা বাজানোর পর লালা নিঃসরণ কমতে কমতে একেবারে শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়াবে। এমন কি ঘণ্টা বাজলে কুকুর হয়তো খাবারের পাত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স ভঙ্গুর বটে, তবে একবার একটি তৈরী হলে তার রেশ কিছুদিন অবধি থেকে যায়।

এর তাৎপর্য সবিশেষ। কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স মাধ্যমে জীব বাইরের জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে নিয়ত নিজেকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স যদি অপরিবর্তনীয় বা চিরস্থায়ী হত তাহলে সে সম্ভাবনা মোটেই থাকতো না। জীব জগতের নতুন শিক্ষা সম্ভব হতো না।

আগেই বলেছি পাভলভ দেখিয়েছেন যে কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স তৈরী হয় শুধু উচ্চমস্তিষ্কে (সেরিব্রাম)। প্রাণীজগতে বিবর্তনের সঙ্গে স্নায়ুমণ্ডলী জটিলতর হতে হতে মানুষের বেলায় মস্তিষ্ক এমন কতকগুলো নতুন ধর্মের আধার হয়েছে, যা একান্ত মানবীয়। এর ফলে মানুষের পক্ষে শুধু পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে বেঁচে থাকা নয়; পরিবেশকে, বহির্বাস্তবকে, প্রকৃতিকে নিজের সুবিধামত পরিবর্তিত করার ক্ষমতা লাভও সম্ভব হয়েছে।

প্রসঙ্গত শর্তাধীন পরাবর্তের সৃষ্টি সম্পর্কে আরো দুচারটি শর্তের উল্লেখ করছি : প্রথমত, তথ্যাদির সাহায্যে বোঝা গেল লালানিঃসরক গ্রন্থির উত্তেজনার

একটি সার্বভৌম শর্ত আছে। খাদ্য দেখিয়ে গ্রন্থি উত্তেজিত করতে হলে প্রাণীটি ক্ষুধার্ত থাকা চাই। পেট ভর্তি থাকলে পরাবর্তক্রিয়ার উন্মেষ ঘটবে না। এর থেকে আমরা এই ধারণায় আসতে পারি যে সমস্ত মননক্রিয়ার শর্ত হল মস্তিষ্কের পূর্ব-প্রস্তুতি। মস্তিষ্কের যে জায়গায় বহির্বাস্তবের উদ্দীপক কাজ করবে, সে জায়গাটিতে আগে থেকে উত্তেজনাপ্রবাহ সঞ্চারিত থাকা দরকার। এই অন্তর-প্রক্রিয়াকে যতদিন না বিজ্ঞানালোকে ভালভাবে বোঝা গিয়েছিল, ততদিন একে কেন্দ্র করে অজ্ঞেয়বাদ বা রহস্যবাদের তত্ত্ব সম্প্রসারণ সহজ ছিল। এই ব্যবহারের গূঢ় উদ্দেশ্যটিও পাভলভের কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠল। খাদ্য উদ্দীপক সব সময়েই যদি প্রাণীকে উত্তেজিত করতে থাকে, তবে প্রাণীর পক্ষে অন্য উদ্দীপকে (আত্মরক্ষামূলক, বংশবৃদ্ধিমূলক) সাড়া দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। নতুন গুণ বা ধর্ম আয়ত্ত করাও যায় না। পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন হয় দুঃসাধ্য।

দ্বিতীয়ত, যদি খেতে না দিয়ে প্রাণীকে বারবার খাদ্য শুধু দেখানো হয়, তবে লালা নিঃসরণ ক্রমশ কমতে কমতে শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়াবে। আবার যে মুহূর্তে এক টুকরো খাবার মুখে গুঁজে দেওয়া হবে, অমনি দেখা যাবে লালাগ্রন্থি পূর্ণমাত্রায় সক্রিয় হয়েছে, লালানিঃসরণের পরিমাণ পূর্ব মাত্রায় ফিরে গেছে। প্রকৃতির এই মিতব্যয়িতা প্রাণীর অভিযোজন সহায়ক নিঃসন্দেহে। বাস্তবে ফলপ্রসূ না হলে যত শক্তিশালীই হোক না কেন, উদ্দীপক প্রাণীকে বেশীদিন উত্তেজিত করতে পারে না: প্রাণী মাত্রেরই অস্তিত্ব ও সুস্থতার পক্ষে এই ধর্ম অতি প্রয়োজনীয়। ছলনাময়ী মরীচিকা যে বেশীদিন প্রলুব্ধ করতে পারে না মানুষকে মস্তিষ্কের এ একটা বিশেষ সদ্‌ধর্ম।

তৃতীয়ত, জানা গেছে, একসঙ্গে দুটো উত্তেজক কাজ করতে পারে না। রুটি ও মাংস—এই দুই খাদ্যই কুকুরের সামনে উপস্থিত করা হল। নিজস্ব ধর্ম অনুযায়ী রুটির লালা নিঃসারক ক্ষমতা নরম মংসের তুলনায় অনেক বেশী। রুটি ভিজিয়ে চিবিয়ে গলাধঃকরণ করার জন্য চাই প্রচুর লালা। মাংস (ঝোল সমেত) গিলতে লালার প্রয়োজনই হয় না। এই দুই বিপরীতধর্মী (লালা নিঃসরণের দিক থেকে) খাদ্য পেলে কুকুর মাংসের দিকেই শুধু মন দেবে। লালা ঝরবেই না। কারণ মাংস অনেক বেশী শক্তিশালী উদ্দীপক। প্রকৃতির এই বিশেষ নিয়ম প্রাণীর কর্মক্ষমতাকে সচল ও সক্রিয় করে। একই

সময়ে মস্তিষ্ক দুটি উদ্দীপক দ্বারা আকৃষ্ট না হওয়ায় মস্তিষ্কের কার্যকারিতা অনেক বেড়ে যায়। পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে মানিয়ে নেবার সুবিধা হয়।

এই সব প্রাথমিক জ্ঞান লাভের ফলে আরও বিস্তারিত হল পাভলভের গবেষণাক্ষেত্র। ক্রমশ তিনি জটিলতার পরীক্ষাবিধিতে মনোনিবেশ করলেন। মানসিকতার রহস্যগ্রন্থি ক্রমশ উন্মোচিত হতে লাগল।

সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে ল্যাবরেটরীতে কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স তৈরী করে বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পাভলভ মস্তিষ্কবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কতকগুলো সাধারণ সূত্রের সন্ধান পান। মস্তিষ্ক-ক্রিয়া নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন ও কার্যকারণ সম্পর্কিত : তাঁর প্রামাণ্য গবেষণার ফলে আমরা আজ তা' জানতে পেরেছি। তাঁর সূত্রগুলি চিকিৎসা-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, ও বিশেষ করে মনোবিজ্ঞানের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসম্বন্ধে বিস্তার করা এখানে সম্ভব নয়। অতি সংক্ষেপে দুচারটে কথা বলবো।

দীর্ঘদিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পাভলভ আবিষ্কৃত জৈবক্রিয়া সম্পর্কিত বিশেষ কয়েকটি প্রামাণ্য সূত্র বিবৃত করছি।

প্রথমত- গুরুমস্তিষ্ক (মানুষ সমেত সমস্ত উচ্চ প্রাণীর বেলায়) দেহাভ্যন্তরস্থ যাবতীয় জৈব-ক্রিয়ার নিয়ামক ও নির্ধারক। প্রতিটি যন্ত্র, গ্রন্থি—সে হৃৎপিণ্ডই হোক আর থাইরয়েডই হোক, গুরুমস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রনাধীন। আমাদের স্নায়ুমণ্ডল দু'ভাগে বিভক্ত, একটি উচ্চ মনন-ক্রিয়ার (যথা—চিন্তা, বুদ্ধি, ইচ্ছাপ্রণোদিত ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদি) জন্য ও অপরটি স্বয়ংক্রিয় জৈব-ক্রিয়ার জন্য ; (হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, দেহের পরিমাণক্রিয়া ইত্যাদি) এই পুরণো ধারণা অচল প্রমাণিত হল। এসম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্যের সমাবেশ করেছেন পাভলভ ও তাঁর পরবর্তী বৈজ্ঞানিকের দল। এক কথায় একে বলে—নার্ভীজম্ (Nervism)।

দ্বিতীয়ত—গুরুমস্তিষ্ক কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স মারফৎ বহির্বাস্তবের সামান্যতম পরিবর্তনের সঙ্গে জীবদেহ ও সমস্ত সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাদির ক্রিয়াকলাপের সারাক্ষণ সম্পর্ক সাধন ও সামঞ্জস্য বিধান করে চলেছে। এর জন্যে প্রয়োজনমত আন্‌কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্সকে বহির্বাস্তবের নতুন নতুন উদ্দীপকের সঙ্গে কণ্ডিশনড্ করাতে হচ্ছে। একদিকে মস্তিস্ক নিয়ন্ত্রিত করছে জীবন ধারণ, আত্মরক্ষা, প্রজনন ইত্যাদি আন্‌কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্সের তাগিদে খাদ্যান্বেষণ, বিপদ থেকে দূরে থাকা, সঙ্গী খোঁজা ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মকে। আবার অন্যদিকে, এই সবের দরুণ

বহির্বাস্তবের যে পরিবর্তন ঘটছে, সেই পরিবর্তনের সঙ্গে দেহের ভিতরকার সমস্ত যন্ত্রাদির ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে, মানুষের সঙ্গে তার বহির্বাস্তবের এক চলমান সামঞ্জস্য (ডাইনামিক্-ইকুইলিব্রিয়াম্) রেখে চলেছে মস্তিষ্ক। এ দুটি সূত্র জীব-বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রের পক্ষে মহামূল্যবান।

তৃতীয় সূত্রটী মানব-মস্তিষ্কের বিশেষত্ব-বিষয়ক। মানব-মস্তিষ্ক পশু-মস্তিষ্কের ক্রমবিবর্তনের চরম পরিণতি, কিন্তু তাই বলে পশু-মস্তিষ্ক আর মানব-মস্তিষ্ক এক ধরনের নয়। জীবনের সায়াহ্নে মনোবিকার নিয়ে গবেষণার ফলে পাভলভ এই সিদ্ধান্তে আসেন যে : পঞ্চ-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্জগৎ (যা পশুদের একমাত্র জগৎ) ছাড়াও মানুষের ভাষাগ্রাহ্য একটি আলাদা জগৎ আছে। প্রাণীজগতের ক্রমবিবর্তনের ফলে, লক্ষ লক্ষ বছরের চেষ্টায় মানুষ ক্রমশ সোজা হয়ে দাঁড়াতে শেখে ও হাতের বিশেষ ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়। পশুজগৎ থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা হয়ে যাবার প্রথম ধাপ হাতিয়ার ব্যবহার করতে শেখা। এর পর এলো সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করার তাগিদ। প্রয়োজন হলো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা ও ভাববিনিময়ের। উৎপত্তি হলো শব্দের। সুশৃঙ্খলিত শব্দমালা থেকে তৈরী হলো বর্বর যুগের প্রথম ভাষা। আভ্যন্তরীণ কতকগুলো যন্ত্রপাতিতে (ভোক্যাল্ কর্ড, ল্যারিঙ্কস্) ঘটলো বিশেষ পরিবর্তন, সেই সঙ্গে মস্তিষ্কেরও। মানব-মস্তিষ্কে নতুন ধর্ম ও গুণ আরোপিত হলো। মস্তিষ্কের এই বিশেষ মানবীয় পরিবর্তন পশুদের অলভ্য অসংখ্য গুণের অধিকারী করে তুললো মানুষকে। বহির্বাস্তবের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সঙ্কেতকে ভাষা করলো সামান্যীকৃত ও বিয়োজিত (জেনারেলাইজড্ ও এ্যাবষ্ট্রাকৃটেড)। তার ফলে উদ্ভূত হলো সুস্পষ্ট চিন্তাধারা ও ধ্যান ধারণা। এই ভাষার দৌলতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবের বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন ও তার থেকে জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে শিখলো মানুষ। পশুর সম্বল শুধুমাত্র নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ চেতনা আর মানুষের কাজে লাগছে হাজার-হাজার বছর ধরে সঞ্চিত লক্ষ-লক্ষ মানুষের বিভিন্ন অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। দর্শন-কাব্য-বিজ্ঞান ইত্যাদি সবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সঙ্কেতের বিয়োজন ও সামান্যীকরণেরই ফল। বস্তুজগৎকে মস্তিষ্কে প্রতিফলিত করে চৈতন্যের ও জ্ঞানের উন্মেষ ঘটায় এই ভাষা। আবার এই প্রতিফলনজনিত জ্ঞানকে ইন্দ্রিয় মাধ্যমে বাস্তবের ওপর প্রয়োগ করে এর সত্য-মিথ্যা যাচাই করি, ভুল সংশোধন করি, বাস্তব-সত্যের দিকে আর এক ধাপ এগিয়ে চলি। এইভাবে ক্রমবিকশিত

হচ্ছে মানুষের জ্ঞান ও সভ্যতা। এইভাবে বিজ্ঞানীরা নিত্য নতুন তথ্য সংগ্রহ করে নতুন থিওরী তৈরী করছেন ; সেই থিওরী প্রয়োগ করতে গিয়ে তার অসম্পূর্ণতা ধরা পড়ছে, সংগৃহীত হচ্ছে আরও নতুন তথ্য, তৈরী হচ্ছে নতুন তত্ত্বের বুনিয়াদ। ভাষার দৌলতে মস্তিষ্কে যে নতুন বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটলো, পাভলভের পূর্ববর্তী আর কোন বৈজ্ঞানিক এই পরিবর্তনের স্বরূপ নির্ণয় করতে সক্ষম হন নি।

পাভলভ মস্তিষ্কের এই সংযোজিত স্তরটির নাম দিলেন দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্র বা সেকেণ্ড সিগন্যালিং সিসটেম। প্রথম সাংকেতিক তন্ত্র হলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির স্তর। পশু ও মানুষ উভয়েই এই স্তরের অধিকারী। দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্রের অধিকারী শুধু মাত্র মানবমস্তিষ্ক। এ সম্বন্ধে জড়বাদী পণ্ডিতেরা অনুমানই করে এসেছেন এ যাবৎ। পাভলভের আবিষ্কার এই অনুমানকে বৈজ্ঞানিক সত্যের মর্যাদা দিলো। পশু-মন ও মানব-মন-এর প্রভেদ বুঝতে গিয়ে আধ্যাত্মিকতার আশ্রয় নেবার আর প্রয়োজন রইলো না। নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হলো যে, চৈতন্য মস্তিষ্কের উপর বহির্জগতের প্রতিফলন। মানব-মস্তিষ্ক বিবর্তনেরই এক বিশেষ অবস্থা। বস্তুই আদি ও প্রাথমিক : চৈতন্য বস্তু-সাপেক্ষ।

উল্লেখ করা উচিত যে, এই সাংকেতিক স্তর দুটি পরস্পর নিরপেক্ষ নয়। এক অপরকে শুধু প্রভাবিত করছে তাই নয়, এক অপরের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল : প্রথমটির বিশেষ বিবর্তনের ফলেই দ্বিতীয়টির উদ্ভব।

পাভলভের মতে দেহ-মন-সমান্তরালবাদ (সাইকোফিজিক্যাল্ প্যারালাল-ইজম্) দেহ-মন-একাত্মবাদ (সাইকোফিজিক্যাল আইডেন্টিটি) এর মতই ভ্রমাত্মক ও অবৈজ্ঞানিক। মননক্রিয়া মস্তিষ্কের কোষ-স্পন্দনের ওপর নির্ভরশীল মানে এই নয় যে,—মস্তিষ্কই মন। পাভলভ-মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে এই ধরনের ভ্রান্তধারণা সাধারণের মধ্যে চালু দেখা যায়। ওয়াটসন প্রবর্তিত ব্যবহারবাদ ও যান্ত্রিক জড়বাদের সঙ্গে পাভলভ-বিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই।

যাবতীয় মনন-ক্রিয়া (চৈতন্য-সমেত) বহির্বাস্তবের প্রতিফলন, এই নতুন সূত্রটি পাভলভীয় মনোবিজ্ঞানের বিশেষত্ব। মানুষে মানুষে যে প্রভেদ, (মনোগত ও ব্যবহারগত) তার অধিকাংশই জন্মগত বা বিধিদত্ত প্রভেদ নয়। পরিবেশের পার্থক্য থেকে সে-প্রভেদের অধিকাংশ উদ্ভব—এই হলো নতুন মনোবিজ্ঞানের সব থেকে বড় কথা। এর তাৎপর্য অপরিসীম। সেই আদিকালের দাস-সমাজ

থেকে আজকের ধনতান্ত্রিক সমাজে এই ধারণাই চালু যে,—মানুষে মানুষে মানসিকতার ও আচরণের পার্থক্য স্বাভাবিক ও অপরিবর্তনীয়। একদল লোক সংখ্যায় নগণ্য হয়েও সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর প্রভুত্ব করছে জন্মগত মানবিক গুণের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য ; এই ব্যাখ্যা বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে হয় না। শ্বেতজাতির প্রাধান্যের মূলে তাদের বুদ্ধি বা মানসিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব, একথা পাভলভবিজ্ঞান স্বীকার করে না। বুদ্ধি বা শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে মনস্তত্ত্বের চালু পরীক্ষাগুলির (আই, কিউ টেষ্টিং) বিশেষ গুরুত্ব পাভলভীয়ানদের কাছে নেই। বাস্তব পরিবেশ সব কিছুকেই প্রভাবিত করছে। এ সম্পর্কে লিওন্‌টিয়েভের গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিশুদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে লিওন্‌টিয়েভ দেখিয়েছেন যে, শিশুদের শিক্ষার কোন বিষয়ে পেছিয়ে থাকা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জন্মগত অক্ষমতা বা দৈন্য সঞ্জাত নয়, পরিবেশের প্রভাব সম্ভূত এই অনগ্রসরতা। ছয় সপ্তাহের বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি দ্বারা এই পশ্চাদপদ শিশুদের মস্তিষ্কে নতুন কণ্ডিশনড্‌ রিফ্লেক্স তৈরী করিয়ে তিনি আরও প্রমাণ করেছেন যে, মস্তিষ্কের অক্ষমতা অপরিবর্তনীয় নয়। (অনুসন্ধিৎসু পাঠক 'Communication at the XIV International Congress of Psychology ; Montreal 1954' পড়ে দেখতে পারেন)।

পাভলভীয় মনোবিজ্ঞানের মতে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ—আফ্রিকার তথাকথিত অসভ্য মানুষ থেকে শুরু করে অতি সভ্য আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ মানুষ—সকলেরই মস্তিষ্ক প্রথম ও দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের সমন্বয়ে গঠিত। অতি আধুনিক সভ্যতার উপকরণের মধ্যে যদি পশ্চাৎপদ কোন মানবগোষ্ঠিকে এনে ফেলা যায় ও সমান সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায়, তাহলে তারা কিছুদিন চেষ্টার ফলে আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারবে ও অগ্রগামী গোষ্ঠীদের সঙ্গে ঠিক পাল্লা দিতে পারবে।

পরিবেশ কণ্ডিশনড্‌ রিফ্লেক্সের মাধ্যমে নতুন শিক্ষা দিয়ে মানুষকে নতুন গুণের অধিকারী করে। এই শিক্ষাগ্রহণের জন্য মস্তিষ্কের সাংকেতিক স্তর দুটির অবস্থান ও সুস্থতাই যথেষ্ট।

মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই মনোবিজ্ঞানের আজ শৈশব অবস্থা। আমরা মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জটিলতার সবকিছু হদিশ আজ এর সাহায্যে দিতে হয়তো পারবো না, কিন্তু এই বিজ্ঞানের বিস্তারিত গবেষণার ও উন্নতির

মধ্যে নিহিত রয়েছে অশেষ সম্ভাবনা। আজ আমরা প্রকৃতির অনেক কিছু নিয়ম কানুন জেনে নির্দিষ্ট পরিকল্পনানুযায়ী বাইরের জগৎকে পরিবর্তিত করতে অন্তত আংশিকভাবে সক্ষম হচ্ছি। তেমনি আশা করা যেতে পারে, মনন ক্রিয়ার ও চৈতন্য বিকাশের সঠিক নিয়ম-কানুন জানার পর অন্তর্জগতকেও নির্দিষ্ট পরিকল্পনানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত করতে পারবো। ব্যক্তিমানস ও সমাজ-মানস এর বিচ্ছিন্নতা ও বিরোধের ফলে যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের সৃষ্টি, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে স্বার্থ নিয়ে যে হানাহানি, মনোবিজ্ঞানের উন্নতি নিশ্চয়ই তার দ্রুত অথচ শান্তিপূর্ণ সমাধান নির্ধারণে সহায়ক হবে।

এই প্রসঙ্গে বিকফের গবেষণালব্ধ একটি পরীক্ষার কথা উল্লেখযোগ্য। নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিকফ দেখিয়েছেন যে, মানুষের বেলায় তার দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তর (অর্থাৎ তার সর্বোচ্চ মানসিক স্তর) তার আনকণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্সকে খানিকটা অন্তত নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত করতে পারে। একটা উত্তাপ সম্পর্কিত এক্সপেরিমেন্টের কথা শুধু বলবো। ১১০° ফারেনহিট পর্যন্ত গরম করা একটি কয়েল পাইপ একজন লোকের চামড়ার উপর লাগিয়ে ও বারবার ঘণ্টা বাজিয়ে, ঘণ্টা বাজানোর সঙ্গে উত্তাপজনিত আনকণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্সকে [সহজাত ক্রিয়া—যেমন গরম বোধ ও স্থানীয় রক্তবাহী শিরাগুলির প্রসার (ক্যাপিলারি ডাইলেটেশন)] কণ্ডিশনড্ করা হলো। অর্থাৎ ঘণ্টা বাজালেই [উত্তাপ প্রয়োগ না করেই] লোকটি গরম অনুভব করতে লাগলো আর যন্ত্রে রক্তনলীর প্রসার ধরা পড়লো। তখন দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের একটি উদ্দীপক ঘণ্টার সঙ্গে প্রয়োগ করা হলো। বলা হোল—'ঘণ্টা বাজাই'। কয়েকবার এই রকম করার পর 'ঘণ্টা বাজাই' কথাটি ঐ ব্যক্তির উত্তাপ অনুভূতি ও রক্তনালীর প্রসার ঘটাতে পারলো। এখন কয়েল পাইপকে ১৫০° ফারেনহিটে উত্তপ্ত করা হোল। ১১০ ডিগ্রী উত্তাপ শীতের দেশে বেশ আরামদায়ক। কিন্তু ১৫০ ডিগ্রী যন্ত্রণাদায়ক। এ ছাড়া অল্প গরম যেমন রক্তবাহী নালীকে উত্তপ্ত করে রক্ত চলাচল বাড়িয়ে দেয়, ১৫০ ডিগ্রী গরম রক্তবাহী শিরাকে সংকুচিত করে রক্ত চলাচল কমিয়ে দেয়। এইবার কণ্ডিশনড্ করা লোকটি ও অন্য একটি লোকের চামড়ার ওপর ঐ ১৫০ ডিগ্রী উত্তপ্ত কয়েলটি রেখে তার ফলাফল দেখা হলো। বলা বাহুল্য, 'ঘণ্টা বাজাই' কথাটি দুইক্ষেত্রেই উচ্চারণ করা হলো আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে অবশ্য ঘণ্টা বা কোন কিছুর সঙ্গেই কণ্ডিশনড্

করা হয়নি। প্রথম ব্যক্তি আরামদায়ক গরম অনুভব করলো, তার যন্ত্রে দেখা গেল শিরার প্রসার; আর দ্বিতীয় ব্যক্তিটি যন্ত্রণাতে হাত সরিয়ে নিলো ও তার যন্ত্রে দেখা গেল শিরার সংকোচন। ভাষা ও চিন্তা (সামাজিক উদ্দীপক) আমাদের সহজাত প্রতিক্রিয়াকে যে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত করতে পারে তা বিকফের এ ধরনের এক্সপেরিমেণ্টগুলি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করছে। সোজা কথায় মানুষ সহজাত আদিম প্রবৃত্তি ও আবেগের দাসমাত্র নয়। পাশববৃত্তি সমাজের উদ্দীপকের সংস্পর্শে এসে পরিবর্তিত হয়েছে ও হচ্ছে। মানুষ শুধু বায়োলজিকাল নয়, প্রধানত সোশ্যাল। হিংসা, দ্বেষ, অবাধ যৌনাকাঙ্ক্ষা, আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি ইত্যাদির ওপরে সভ্যতার প্রলেপ লাগিয়েছে মাত্র মানুষ, এই ধরনের প্রচার উদ্দেশ্যমূলক ও অবৈজ্ঞানিক। মানুষের সভ্যতা আদিম প্রবৃত্তিগুলিকে মৌলিকভাবে পরিবর্তিত করছে ও করবে।

[১]

সম্মোহন কি ?

তোমার প্রশ্নটি খুবই সামান্য, কিন্তু উত্তরে যে মনোবিদ্যার মহাভারত লেখা হতে পারে, সেটা তুমি খেয়াল করেছ কি ? সম্মোহনবিদ্যার ইতিবৃত্ত লিখতে গেলে শুরু করতে হবে সেই আদিম কৌম-সমাজের রীতিনীতি, বিধিনিষেধ, ধ্যানধারণা থেকে, আর শেষ করতে হবে এ-যুগের দুই মহারথী পাভলভ ও ফ্রয়েডের পরস্পরবিরোধী তত্ত্বকথায় এসে।

শেষ থেকেই শুরু করা যাক।

নিজেকে জানবার চেষ্টা—অন্তরজগতের রহস্য উদ্‌ঘাটন-প্রয়াস—সৃষ্টির আদিপর্ব থেকেই শুরু করে এসেছে মানুষ। কিন্তু তার এই প্রয়াসের সাফল্যসূচনা মাত্র সে-দিনের কথা। সৌরজগৎ, পদার্থজগৎ, জীবজগৎ, উদ্ভিদজগৎ তাকে অনেক বেশি আকৃষ্ট করল; তার অনুসন্ধিৎসা তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে উৎসাহিত করল। গড়ে উঠল বিচ্ছিন্নভাবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা। গত শতকেই আবার এই সব বহির্জাগতিক বিজ্ঞানের মধ্যে পরস্পর-সান্নিধ্যের সূত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল। এংগেল্‌সের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি-বিচারে ধরা পড়ল বস্তুর গতি-প্রকৃতির পার্থক্য ও ঐক্য। পদার্থবিজ্ঞান তাঁর মতে—the mechanics of molecules, রসায়নবিজ্ঞান—the physics of atoms, আর জীব-বিজ্ঞান—the chemistry of albumin। সে-সময় নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, মলিকিউলার বায়োলজি, আধুনিক এ্যাসট্রোফিজিক্স-এর সূচনা হয় নি। ঘনসংযুক্ত বস্তুর গঠন-স্বাতন্ত্র্য নিয়ে গবেষণা শুরু হয় নি। কাজেই শুধু গতির প্রকারভেদ ও রূপান্তরণের দিকেই এংগেল্‌সের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল। সে যাই হোক, এর ফলে বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখার গবেষণায় ঘটল দ্রুত উন্নয়ন। এক শাখার গবেষণালব্ধ জ্ঞান অন্য শাখাকে প্রভাবিত করল। কিন্তু হায়! মনোবিদ্যা পড়ে রইল একপাশে অনাদৃত ও অবহেলিত। বাইরের জগতকে জানার সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তার বাঁচার সংগ্রাম ওতপ্রোতভাবে

জড়িত। তাই বহির্জাগতিক সমস্যা সমাধানের এই সামগ্রিক ও সংকল্পনিষ্ঠ প্রচেষ্টা। ক্রমশ বাইরের জগতের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রকৃতির নিয়মশৃঙ্খলের হদিশ পেয়ে প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করার ক্ষমতা আয়ত্তে এনেছে মানুষ। অমিত শক্তির অধিকারী হয়ে বুঝেছে আত্মজ্ঞান না জন্মালে—নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে না শিখলে—তার বহিরঙ্গের জ্ঞান হয়ত কোনো কাজেই লাগবে না, শুধু আত্মধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়া ছাড়া।

তুমি বলবে, সর্বকালের ধর্মশাস্ত্রতো এই জ্ঞানই প্রচার করেছে এতকাল। ভুলে যেও না, অতি আধুনিক ধর্মমতও অন্তত হাজার বছরের পুরণো। এ কথা স্বীকার করবে নিশ্চয়ই যে, দাস-শ্রমনির্ভর কৃষিসমাজে ধর্মশাস্ত্রদত্ত আত্মজ্ঞান হয়তো আত্মনিয়ন্ত্রণের পথ দেখাতে পেরেছিল, কিন্তু বর্তমান সমাজব্যবস্থায় সেই জ্ঞান অচল। আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে জানবার প্রচেষ্টা একান্তই স্বাভাবিক। তাই বলছিলাম, পাভলভ ও ফ্রয়েড দিয়েই শুরু করা যাক।

এই দুই মহারথীকে [বলা উচিত তাঁদের তত্ত্বকে কেন্দ্র করে] ঘিরে সারা পৃথিবীতে দুটি যুধ্যমান চমু ঠাণ্ডা-লড়াই-এর আবহাওয়াকে আরো ঘোরালো করে তুলেছে। পাভলভকে ঘিরে রয়েছেন অবজেকৃটিভ দৃষ্টিভঙ্গীধারী পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়াসীরা, আর ফ্রয়েডকে কেন্দ্র করে ভিড় জমিয়েছেন সাবজেকৃটিভ-স্কুলের অন্তর্দর্শনে বিশ্বাসী রথীবৃন্দ। এই দুই মনীষী সমসাময়িক। পাভলভ জন্মেছিলেন ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে আর ফ্রয়েড তার আট বছর পরে। মৃত্যুকাল যথাক্রমে ১৯৩৬ ও ১৯৩৯। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত দুজনেই সক্রিয় ও স্বধর্মনিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ী যোদ্ধা ছিলেন। তাঁদের গবেষণাপদ্ধতি ছিল কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো ধরনের—তত্ত্বও পরস্পরবিরোধী। মানসিকতা ও মনোবিকারের ইতিবৃত্ত-অন্বেষণে পাভলভ প্রকৃতিবিজ্ঞানের পথে উচ্চমস্তিষ্কের ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার গবেষণা নিয়ে মেতেছিলেন, আর ফ্রয়েড মানসিকতার হদিশ পেতে চেয়েছিলেন মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানের সহায়তা ছাড়াই মনের নিরুদ্ধ গুহার অভ্যন্তরে। দেহসম্পর্কবর্জিত চিত্তলোকের আদিম-কল্পনা প্রভাবিত করেছিল ফ্রয়েডকে। পাভলভ গিয়েছিলেন উচ্চস্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার বিজ্ঞানানুসৃত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে, ফ্রয়েড চলেছিলেন নিজের ও রোগীদের মনসমীক্ষার পথে। দুজনেই নতুন দিগন্ত আবিষ্কারের গৌরব করতে পারেন। দুজনেই নতুন পথের নির্দেশ দিয়েছেন

বলে দাবী করেছেন। পাভলভের আবিষ্কার—'উচ্চতর স্নায়ুবিজ্ঞান' আর ফ্রয়েডের আবিষ্কার—"অবচেতন মনের বিজ্ঞান"।

এঁদের পরস্পরবিরোধিতা শুধু সম্মোহনবিদ্যা ও অঙ্গাঙ্গীসম্পর্কিত ঘুম স্বপ্ন ইত্যাদি ব্যাপারেই নিবদ্ধ নয়। এছাড়া আরো অনেক ব্যাপারে, যেমন শিশুমন, শিশুশিক্ষা, মনোবিকারের কারণ ও চিকিৎসা, জীববিদ্যা, নৃবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি নানা দিকে এঁদের তত্ত্ব ও বিধান সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থার নির্দেশক।

তোমার ঔৎসুক্য শুধু 'সম্মোহনবিদ্যা' নিয়ে আমি জানি। কিন্তু অন্য বিষয় আমার চিঠিতে এসে পড়বেই। সম্মোহন সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলে ঘুম আর স্বপ্নের কথা আসতে বাধ্য। সম্মোহনের ইংরাজী নাম হিপনসিস্। বেয়ার্ড নামে ইংরেজ সার্জনের দেওয়া নাম। ঘুমেরই নামান্তর। আগে নাম ছিল মেস্মারিজম্। ডক্টর মেসমার সম্মোহিত অবস্থায় অভিভাবনের সাহায্যে রোগ সারিয়ে ইয়োরোপে একসময় আলোড়ন এনেছিলেন। শেষ বয়সে পরাজিত অপমানিত জীবনের বোঝা টানতে হয়েছিল তাঁকে। তবুও তাঁর নামের সঙ্গে অতি-প্রাচীন এই বিদ্যা এখনও জড়িয়ে আছে। তিনি অবশ্য মনে করতেন চৌম্বকশক্তির বিশেষ বিকাশ ঘটে সম্মোহিত অবস্থায়। তাঁর কথা এখন থাক। পাভলভ-ফ্রয়েডের কথাতেই আসা যাক। ঘুমন্ত আর সম্মোহিত অবস্থার সাদৃশ্য সকলেই লক্ষ্য করেছেন। সম্মোহনকারী ঘুমের অভিভাবন দিয়ে শুরু করেন তাঁর সম্মোহন-পর্ব। "ঘুমিয়ে পড়ুন—ঘুমিয়ে পড়ুন! হাত পা ভারী হয়ে আসছে, সারা দেহ অসাড় অবশ হয়ে আসছে···। আপনার ঘুম আসছে, গভীর ঘুম আসছে।···বাইরের সব শব্দ অস্পষ্ট হয়ে গেছে। আমার কথা ছাড়া অন্য কোনো কথা, অন্য কোনো শব্দ আপনার কানে যাচ্ছে না।"—কথাগুলো পরিচিত বলেই মনে হচ্ছে—তাই না? পাভলভ ও ফ্রয়েড দুজনেই সম্মোহিত অবস্থাকে এক ধরনের ঘুমন্ত অবস্থা বলেই মনে করেছেন। অবশ্য এই ঘুম সম্পর্কে তাঁদের দুজনের ধারণার মধ্যে কোনো মিল নেই।

ঘুম নিয়ে যত কাব্য রচিত হয়েছে, রামধনু বা প্রজাপতি নিয়েও বোধহয় তত হয় নি। রাত্রির ঘুমে একটি দিনের মৃত্যু আর ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি দিনের জন্ম। জন্ম মৃত্যুর মতই ঘুম আর জাগরণের ছন্দোময় আমাদের জীবন, তাই ঘুম যুগিয়েছে কবিমনে প্রেরণা। আবার কাব্যের পাশাপাশি ঘটেছে ঘুম নিয়ে নানা দার্শনিক চিন্তাধারার বিকাশ। সবটাই তার অতীন্দ্রিয় রহস্যময়তা।

আদিম মানুষ ঘুমকে যে অলৌকিক স্বপ্নলোকে প্রয়াণের সেতু মনে করবে এর মধ্যে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। দেহ নিশ্চল, বাইরের উদ্দীপকে সাড়া নেই, জীবনধারা স্তিমিত। কিন্তু স্বপ্নে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে বল্‌গা হরিণের পিছু ধাওয়া করে হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ এড়িয়ে উপস্থিত হয়েছে সে এক নতুন রাজ্যে, যেখানে দেখা হল মৃত পূর্বপুরুষদের সঙ্গে। আদিম মানুষ স্বপ্নঘটনাকে বাস্তব থেকে আলাদা করে দেখতে শেখে নি। কাজেই তার মনে জন্মেছিল দেহাতীত আত্মার প্রতীতি। বেশির ভাগ ধর্মশাস্ত্রে দেহ-মনের সম্পর্ক বিশ্লেষণ এই স্বপ্ন-নায়ক আত্মাকে নিয়ে। মানুষের আদিম ধর্মবিশ্বাস, 'সর্বপ্রাণবাদ'—এই স্বপ্ননায়ক আত্মাকে কেন্দ্র করে। ঘুম আর স্বপ্ন মানুষের জীবনদর্শনকে খুবই প্রভাবিত করেছে। স্পেন্সার ও ডারউইনের লেখায় এর স্বাক্ষর রয়েছে। এংগেল্‌স লিখেছেন—'From the very early times when men, still completely ignorant of the structure of their own bodies, under the stimulus of dream apparitions, came to believe that their thinking and sensations were not activities of their bodies, but of a distinct soul which inhabits the body and leaves it at death—from this time men have been driven to reflect about the relation between the soul and the outside world."

প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে অসহায় অজ্ঞ আদিম মানুষের মনে স্বভাবতই ঘুম আর স্বপ্ন কুসংস্কার ও অলৌকিক বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল। তা বলে মনে কোরো না এ-দিক দিয়ে আদিম যুগ পেরিয়ে আমরা খুব বেশি এগিয়েছি। দুঃস্বপ্ন দেখে আমরা আজও উদ্বিগ্ন হই। ধর্ম-বিশ্বাসের ঢাকনা দিয়ে পুরণো দিনের অনেক রহস্যময় অন্ধ-কুসংস্কারকে আমরা আজও পোষণ করছি। এখনও মুখে 'বিশ্বাস করি না' বলেও হস্তরেখাবিদদের কাছে হাত বাড়িয়ে দিই, ছেলেমেয়েদের কোষ্ঠি-ঠিকুজি তৈরী করাই। জন্মলগ্নে গ্রহনক্ষত্রের সমাবেশ ও অবস্থান জানতে সকলেই উদ্‌গ্রীব। তাই দৈনিক পত্রিকাগুলোতেও সাম্প্রতিককালে সামুদ্রিক-বিদ্যার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কিন্তু বিজ্ঞান আজ বদ্ধপরিকর কুসংস্কার আর রহস্যময়তার বিরুদ্ধে অভিযানে।

সম্মোহনের ইতিবৃত্ত জানবার আগে তোমাকে জানতে হবে ঘুম আর স্বপ্নের

বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা। তবেই বুঝবে সম্মোহিত অবস্থার শারীরবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য।

ঘুম সম্পর্কে বহুরকমের তত্ত্ব প্রচলিত। আমি কিন্তু ফ্রয়েড আর পাভলভের তত্ত্ব তোমাকে জানাব। কেননা এই দুটিরই গুরুত্ব বেশি।

[২]

জীবন ছন্দোময়। শুধু জীব নয়, গাছপালার মধ্যেও দেখবে এই ছন্দের খেলা। জীবনের জোয়ার-ভাটার ওঠানামা। অনেক গাছের পাতা রাত্রে গুটিয়ে যায়, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার নিজেদের মেলে ধরে। বিপাক ক্রিয়ার তারতম্য ঘটে দিবারাত্রির পরিবর্তনে। তবে উচ্চ প্রাণী, বিশেষ করে মানুষের মধ্যেই দেখা যায় ঘুম আর জাগরণের নির্দিষ্ট সীমারেখা ও পরিক্রমা-ছন্দের সুসম বিকাশ।

ঘুম আর জাগরণের সঙ্গে মাত্রা রেখে জৈব ক্রিয়ার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে ঘুমের বিভিন্ন মাত্রা লক্ষ্য করা যায়। এই মাত্রার বৈশিষ্ট্য প্রজাতির বিশেষ পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। কুকুর বিড়াল ইত্যাদি গৃহ-পালিত প্রাণী দিনরাতে অনেকবার ঘুমোয়। কোনো কোনো প্রাণী দিনে ঘুমিয়ে রাত্রে শিকারের সন্ধানে বের হয়। কুকুর-বিড়ালের ঘুমকে বলা হয় বহুমাত্রিক ঘুম আর মানুষের ঘুমকে বলি একমাত্রিক ঘুম। অবশ্য বয়স ও অবস্থা-ভেদে এর তারতম্য ঘটে। শিশুদের ঘুম বহুমাত্রিক। বৃদ্ধ ও অনেক লোক (যাঁদের দুপুরে কাজ থাকে না) দ্বিমাত্রিক ঘুমে অভ্যস্ত।

শিফ্‌ট ডিউটি যাঁরা করেন, তাঁরা অবস্থানুযায়ী ঘুমের সময়কে বদলে নিতে অভ্যস্ত। কোনো কোনো প্রাণী একটা গোটা ঋতু ঘুমিয়ে কাটায়। শীতকালীন বা গ্রীষ্মকালীন এই ঋতু-নিদ্রা বা hibernation-এর সঙ্গে দৈনন্দিন ঘুমের কিছুটা পার্থক্য আছে। ঋতু-নিদ্রাকালীন অবস্থায় প্রাণীদেহে এক বিশেষ ধরনের বিপাক ক্রিয়া চলে। অনেক প্রাণীর দৈহিক তাপমাত্রা এ সময়ে বাইরের তাপমাত্রার সমানাঙ্কে এসে পৌঁছায়।

না-খেয়ে থাকার চেয়ে না-ঘুমিয়ে থাকা অনেক বেশি কষ্টকর। মানুষই হোক আর ইতর প্রাণীই হোক, না ঘুমিয়ে কেউ বাঁচতে পারে না। কুকুরের বাচ্চাদের

ওপর পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা গেছে যে ৪।৫ দিন না ঘুমুতে দিলে তারা বাঁচে না। বয়স্ক কুকুরদের অবশ্য ২০।২২ দিন বাঁচতে দেখা গেছে। এক আধুনিকতম পরীক্ষায় দেখা গেছে ৮ দিনের দিন কুকুরগুলো (নিদ্রানিবারক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও) ঘুমিয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে দুটি কুকুর আর ঘুম থেকে ওঠেনি।

ঘুমের গুরুত্ব অসীম; ঘুম জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। নিশ্চয়ই তুমি মুচকি হেসে ভাবছ—আমি বাড়িয়ে বলছি।

গত বছর তুমি যখন 'অনিদ্রারোগে' ভুগেছিলে, আমি তোমাকে অন্য কথা বলেছিলাম। মাস তিনেক তুমি ঘুমুতে পারোনি। অনেক রোগী বছরের পর বছর না ঘুমিয়ে বেঁচে থাকে—তোমাকে বলেছিলাম। মিথ্যা কিন্তু বলি নি। 'অনিদ্রা রোগ' মস্তিষ্কের বিশেষ অসুস্থ অবস্থা। এই অবস্থায় মস্তিষ্কের অনেকগুলো কোষ প্রায় ঘুমন্ত অবস্থাতেই থাকে। রাত্রে ৬।৭ ঘণ্টা গভীর ঘুমের মধ্য দিয়ে কোষগুলো সজীব ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। অধিকাংশ অনিদ্রারোগে গভীর ঘুম হয় না বটে, কিন্তু আধঘুমন্ত অবস্থার মধ্য দিয়ে দিনরাত কাটে। কাজেই মস্তিষ্ককোষগুলোর ক্ষয় ক্ষতি বিশেষ কিছু ঘটে না। যখন স্নায়ুকোষের উত্তেজনা নিয়ে আলোচনা করব তখন ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। এখন শুধু জেনে রাখো, ঘুম আর জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থায় আমরা সুস্থ মানুষেরাও অনেক সময় কাটাই– যাকে পাভলভপন্থীরা বলেন—hypnoid state, এবং এই অবস্থায় মস্তিষ্ককোষগুলো খুব বেশি পরিশ্রান্ত হয় না। অনিদ্রারোগে এই 'hypnoid state' দীর্ঘতর হয়, কাজেই গভীর ঘুম না হলেও খুব বেশি ক্ষতি হয় না।

জাগ্রত আর নিদ্রিত অবস্থার মধ্যে শারীরবৃত্তিক পার্থক্য অনেক। জাগ্রত অবস্থায় তুমি তোমার পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন। চোখ কান সজাগ। ধর, তুমি ক্লাসে লেকচার শুনছ। কোন ছেলে কিভাবে তোমার দিকে তাকাচ্ছে, তা তোমার নজর এড়াচ্ছে না। তোমার পিছনের বেঞ্চের ছেলেরা ফিস ফিস করে যে কথাগুলো বলছে তাও তোমার কানে আসছে। পাশের মেয়েটির চুলের সুবাস তোমার নাকে যাচ্ছে। মৃদুস্পর্শের অনুভূতিও তোমাকে চঞ্চল করতে পারে। ঘরের তাপমাত্রার আধিক্য তোমাকে বিচলিত করতে পারে। ক্লাস থেকে উঠে ছেলেদের ভিড় এড়িয়ে, চৌকাঠ পেরিয়ে কমনরুমে আসতে তোমার অসুবিধা হবে না। এত কথা বলার অর্থ, তোমার কেন্দ্রীয় স্নায়ুসংস্থা ও ইন্দ্রিয়গুলো এই জাগ্রত অবস্থায় পুরোপুরি সক্রিয়। সব সময় অবশ্য

এর বহিঃপ্রকাশ নজরে পড়বে না। যখন দুপুরে খাওয়ার পর তোমাদের বারান্দায় ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে দূরের পাহাড়টার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাক তখন হয়ত মনে হবে তোমার মস্তিষ্ক কাজ করছে না। তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিশ্চল, দৃষ্টি দূরবদ্ধ, আঁচলটা লুটিয়ে পড়েছে, ভিজে চুলগুলো নিয়ে বাতাস খেলা করছে। মৃদু নিঃশ্বাসের সঙ্গে বুকের ওঠানামা ছাড়া জীবনের আর কোন লক্ষণই তোমার মধ্যে নেই। তুমি কিন্তু জাগ্রত। তোমার কেন্দ্রীয় স্নায়ুসংস্থা ও ইন্দ্রিয়গুলো সক্রিয়। পরিবেশের পরিবর্তন যত সূক্ষ্মই হোক না কেন, তোমার ইন্দ্রিয় মারফত মস্তিষ্কে পৌঁছুচ্ছে। তোমার পেশী, অস্থিসংযোগ, গ্রন্থি, পাকাশয়, লিভার, বৃক্ক, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি দেহের ভিতরকার সমস্ত যন্ত্র তাদের খবর পাঠাচ্ছে মস্তিষ্কের কাছে। মস্তিষ্ক খবরগুলো শুধুই যে গ্রহণ করছে,—তা মনে কোরো না। সঙ্গে সঙ্গে অবস্থানুযায়ী নির্দেশ পাঠাচ্ছে ঐসব আন্তরযন্ত্রের কাছে। তাদের সুষ্ঠু ও সুসমন্বিত পরিচালনা নির্ভর করছে এই নির্দেশের ওপর। বাইরের জগতের সূক্ষ্মতম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আন্তরযন্ত্রগুলিরও সাংগঠনিক পরিবর্তন ঘটছে। কেন্দ্রীয় স্নায়ুকেন্দ্র এই পরিবর্তনের নিয়ন্ত্রক। এইবার ভাবা যাক, বাইরের পাহাড়টার চূড়ায় একখণ্ড ধূসর মেঘ ভেসে আসতে ঝাপসা হয়ে গেল পাহাড়টার রূপরেখা। বিস্মৃতির অতল থেকে হারিয়ে যাওয়া একটা মুখ তোমার মনের মুকুরে অস্পষ্ট ছায়া ফেলল। চোখ বুজিয়ে মুখটাকে তুমি স্মৃতির তুলির টানে উজ্জ্বল করার চেষ্টা করছ। নিশ্চল দেহ, স্তিমিত শ্বাসপ্রশ্বাস, মুদিত নয়ন, কিন্তু এখনও তুমি জেগে আছ। মস্তিষ্ক স্মৃতিমন্থনে রত। কল্পমূর্তি গঠনে ব্যস্ত। তোমার সুঠাম গ্রীবা আরও সুন্দর দেখাচ্ছে; চাপা উত্তেজনায় পেশীগুলো ঈষৎ স্ফীত।

এবার ঘুমন্ত তোমাকে কল্পনা করা যাক। সমস্ত পেশী শ্লথ হয়ে গেছে। সুন্দর মুখের রেখাগুলো নিশ্চিহ্ন। একটা হাত এলিয়ে পড়েছে দেহ-বরাবর, আর একটা হাত বুকের উপর। গ্রীবার সে মনোরম ভঙ্গী আর নেই—পেশীগুলো শিথিল। ঠোঁট দুটো সন্নিবদ্ধ নয়; দন্তরুচিকৌমুদীর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। যে রেখাগুলো তোমার ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলত—তাদের অভাবে তোমাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে। এককথায় একটু বোকা বোকা মনে হচ্ছে তোমাকে। তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ। বাইরের উদ্দীপনায় [যদি খুব তীব্র না হয়] সাড়া দেবার ক্ষমতা হারিয়েছ। ইন্দ্রিয়গুলো আর ভালমত কাজ করছে না। অনুভূতি, কল্পনা সবই মন্দীভূত। শৈশবে যখন ঘুমিয়ে পড়তে, তখন একেবারে নিষ্ক্রিয়

হয়ে যেত ইন্দ্রিয়গুলো। এখন অতটা না হলেও আলতো ছোঁয়া, মৃদু শব্দ তোমার কেন্দ্রীয় স্নায়ুসংস্থানে পৌছুচ্ছে না। একটা মশা কানের কাছে গুঞ্জন করছে—তুমি শুনছ না। আলগোছে তোমার ঠোঁটের ওপর বসল, তুমি হস্ত সঞ্চালনে তাড়াবার চেষ্টা করলে না। বাইরে তোমার প্রিয় পাখিটি ডেকে উঠল, তোমার চোখেমুখে খুসির ঝিলিক খেলল না। তোমার স্নায়ুসংস্থা নিস্তেজিত।

এই অবস্থায় কিন্তু সব পেশী শিথিল হয়ে পড়ে নি। দেহের ক্লেদাদি যাতে অসাড়ে নির্গত না হয় এইজন্যে মস্তিষ্কের বন্দোবস্ত অনুসারে মূত্রাশয় ও বৃহদন্ত্রের পেশীগুলো প্রেষিত।

এই অবস্থায় তোমার আর কি কি শারীরবৃত্তিক পরিবর্তন ঘটছে, শুনবে? হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন মৃদু ও মন্থর হয়েছে। রক্তের চাপ কমে গেছে। রক্তপ্রবাহ মন্দগতি হয়েছে—বিশেষ করে মস্তিষ্ক, যকৃৎ, বৃক্ক ইত্যাদিতে। রক্তবাহী সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরাগুলো প্রসারিত হওয়ার ফলে ত্বক উষ্ণতর, যদিও বিপাকক্রিয়া মন্দীভূত হওয়ায় দেহের তাপ নিম্নমুখী। শ্বাসপ্রশ্বাস গভীর ও সমছন্দ। মাঝে মাঝে সশব্দে গর্জন করে উঠছে তোমার নাসিকা। রাগ করলে? রাগ কোরো না। এটা শরীর-ধর্ম। শুধু আমার নয়, তোমার মত সুন্দরীর নাসিকাও মাঝে মাঝে ধ্বনিময় হয়। ঘুমের মধ্যে তালুর যে-অংশ নরম সেটা শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ার ফলে শব্দ হচ্ছে। এটা স্বাভাবিক ব্যাপার, নিন্দনীয় নয়। বাতাস ঐ ঝুলে পড়া তালুতে ধাক্কা খাচ্ছে—তাই এই শব্দ। যন্ত্রপাতি কম কাজ করছে। এখন তাদের বিশ্রাম। কিন্তু সকলের নয়। পাকযন্ত্র তার সমস্ত গ্রন্থি সমেত বেশ সক্রিয়। রাতের খাওয়াটা হজম করতে ব্যস্ত। আর সক্রিয় স্বেদগ্রন্থিগুলো। তোমার কপালে স্বেদবিন্দু চক্‌চক্ করছে। ভালই দেখাচ্ছে।

দিনের বেলায় জাগ্রত অবস্থায় দেহের ক্ষয়ক্ষতি ঘটছে, এখন ঘুমের ভেতর দিয়ে ক্ষতিপূরণ হচ্ছে। এ-ক্ষতিপূরণ কোন্ অংশের বেশি প্রয়োজন জান? উচ্চমস্তিষ্কের যে-অংশকে কর্টেক্স বলি সেই দামী অংশের। এখানকার কোষগুলো ভারী কোমল, এতটুকু আঘাতেই ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু এরা তেজবীর্য ও কর্মশক্তিতে কারো থেকে কম যায় না। পেশী ও গ্রন্থির কোষগুলোর সাময়িক পুষ্টির বন্দোবস্ত নিজেদের মধ্যেই খানিকটা সঞ্চিত থাকে। মস্তিষ্ককোষেরা সে-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাদের কোনো স্থানীয় ভাণ্ডার নেই। আবার প্রয়োজনও এদের বেশি, বিশেষ করে অক্সিজেন আর গ্লুকোজ চাই সাধারণ কোষের থেকে কয়েকগুণ বেশি।

সারা দেহযন্ত্রের নিয়ন্ত্রক আর নিয়ামক এরা—কাজেই তোয়াজে রাখতে হয়। তোয়াজে রাখার বন্দোবস্ত কিন্তু ঠিকই আছে। লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এমন জটিল ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে, যার ফলে এই কোমল অথচ অসীম শক্তিশালী অমূল্য স্নায়ুকোষগুলো তাদের নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যেতে পারে। রক্ত কোষগুলোতে খাদ্য আর অক্সিজেন যোগায়, এটা নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে। মস্তিষ্ককোষে এই রক্ত সরবরাহের ঢালাও ব্যবস্থা। প্রতিটি কোষের চারদিকে কৈশিক রক্তবাহী শিরা। প্রতিটি কোষ যেন শিরা-উপশিরার জালে জড়ানো। মস্তিকের রক্তবাহী শিরা-উপশিরা সব একসঙ্গে করলে কত লম্বা হবে জান? প্রায় ১০০ কিলোমিটার। মিনিটে এক লিটার করে রক্ত এর ভেতর দিয়ে সঞ্চারিত হচ্ছে। যে শিরাটি মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ করে তার মধ্যে রক্তের গতিবেগ অন্যান্য অংশে সরবরাহকারী শিরার গতিবেগের ১৫০ গুণ বেশি। কাজেই রসদভাণ্ডার না থাকলেও এরা খাদ্যাভাবে কষ্ট পায় না। রসদ-ভাণ্ডার থাকলে কিন্তু এই কোষগুলো তাদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলত। প্রাণশক্তি ও কর্মক্ষমতা কমে যেত। মেল ট্রেন না হয়ে মালগাড়ী হয়ে যেত। এছাড়া তোমাকে আগেই বলেছি জাগ্রত অবস্থাতেও মস্তিষ্কের সব থেকে সক্রিয় অংশগুলো মাঝে মাঝে বিশ্রাম পায়। এক অংশ যখন উত্তেজিত তখন অন্যান্য অংশে নিস্তেজনা নেমে আসে।

কিন্তু তবুও এরাই একটানা খাটুনিতে সব থেকে আগে জখম হয়। বিশ্রাম এদের চাই-ই চাই। কেন্দ্রীয় স্নায়ুসংস্থা, বিশেষ করে মস্তিষ্ক বল্কলের কোষগুলোর ঘুমের প্রয়োজন সব থেকে বেশি।

এখন শোনো এই নিদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে দিক্‌পালদের অভিমত। অবশ্য তা হলে তোমার আরামশয্যা থেকে উঠে বসতে হবে। রীতিমত মনঃসংযোগ করতে হবে। আমি এখন যা বলতে যাচ্ছি তা বেশ খটমট।

শারীরবিদ্যার ছাত্রদের কাছে সাধারণত ঘুম সম্বন্ধে তিনটি বিভিন্ন তত্ত্ব প্রচলিত। রক্ত-সঞ্চালনতত্ত্ব, রাসায়নিক তত্ত্ব, আর নিদ্রাকেন্দ্রিক তত্ত্ব। এ-সবগুলো মোটামুটি তোমার জানা আছে। তবে আসরে ফ্রয়েড পাভলভকে আমদানী করতে হলে পূর্বসূরীদের সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলা দরকার।

ইটালীর এ্যাংগেলো মস্‌সো রক্ত-সঞ্চালন তত্ত্বের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা। মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চালনের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে ঘুম আসে—এই এঁর অভিমত। জার্মান বৈজ্ঞানিক

আর্নেস্ট ওয়েবারের মত অবশ্য আলাদা। তাঁর মতে অন্ত্রে রক্ত সঞ্চালনের আধিক্য ঘুম নিয়ে আসে, মস্তিষ্কে রক্ত-প্রবাহ কমে যাওয়ার জন্য নয়। এমনিও কণ্ঠের রক্ত-নালীতে চাপ দিলে মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে। আবার এও দেখা গেছে যে মস্তিষ্কে টিউমার হলে সেখানকার রক্তসঞ্চালন বাড়ে—এ অবস্থাতেও ঘুম বেশি হয়। এ কিন্তু স্বাভাবিক ঘুম নয়। অস্বাভাবিক একটা অবস্থা,—বলা যেতে পারে মূর্ছা। তবে হ্যাঁ, ঘুমের মধ্যে রক্তচাপ কমে যায়, আর মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চালনও হ্রাস পায়। তবে ঘুমের ফলে এ-অবস্থা ঘটে। এ-অবস্থার জন্য ঘুম আসে—একথা ঠিক নয়।

রাসায়নিক তত্ত্বের মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে জাগ্রত অবস্থায় বিপাক ক্রিয়া সঞ্জাত অনেক বিষাক্ত দ্রব্য জমা হয় মস্তিষ্কে, যাদের বলা হয় হিপনোট্‌ক্সিন। তার ফলে ঘুম আসে। লেগেন্দ্রে ও পিয়েরোঁ—ফরাসী দুই শারীরবৃত্তবিদ এই তত্ত্ব নিয়ে অনেক কাজ করেছেন।

কয়েকদিন জাগিয়ে রাখা কুকুরের রক্ত থেকে সেরাম ইনজেকশন দিলে সুস্থ কুকুরকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখা যায়। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে এ তত্ত্বও খুব টেকসই নয়। প্রথমত, কুকুরকে জাগিয়ে রাখার জন্য তাকে দিয়ে কঠিন মেহনত করানো হয়েছে। ফলে তার রক্তে অস্বাভাবিক বিপাক ক্রিয়ার দরুণ ট্‌ক্সিন জমা আশ্চর্য নয়। স্বাভাবিক ঘুম কঠিন শ্রমজাত অবস্থা থেকে সব সময়ে আসে, এমন নয়। আবার ঘুম যদি ট্‌ক্সিনের ফলে হবে, তবে হঠাৎ হবে কেন? ধীরে ধীরে ট্‌ক্সিন জমে, সুতরাং ঘুমও ধীরে আসবে। তেমনি ঘুম থেকে জেগে ওঠাটাও হবে একটা ক্রমান্বয়িক প্রক্রিয়া। দুজন সোভিয়েত বিজ্ঞানী [আনোখিন ও আলেক্‌সেইভা] যুক্ত-যমজের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে টক্সিন-তত্ত্বের অযৌক্তিকতা দেখিয়ে দিয়েছেন। যুক্ত-যমজদের মস্তিষ্ক দুটো, কিন্তু রক্ত-সঞ্চালনটা এজমালি। অর্থাৎ একই রক্ত দুজনের ধমনীতে প্রবাহিত হয়। একজনের রক্তে কোনো রাসায়নিক দ্রব্য ঢুকিয়ে দিলে আর একজনের রক্তে সেটা পাওয়া যায়। একজনকে বসন্তের টিকা দেওয়া হলে, অন্যটি তার ফল ভোগ করে। এদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র যে আলাদা সেটা তাদের অঙ্গসংস্থান থেকেই বোঝা যায়। মাথা দুটো ; মেরুদণ্ডও দুটো। একজনের হাতে পিনের খোঁচা দিলে, অন্যজন হাত সরিয়ে নেবে না। চেষ্টা করে এদের ঘুমের সময়ের এদিক ওদিক করে দেখা গেছে যে কিছুদিন পরে ঘুম আসার সময়, জাগার সময়, ঘুমের মাত্রা—সবই এদের দুজনের আলাদা রকম হচ্ছে। একজন যখন অঘোরে ঘুমুচ্ছে, অন্যজন তখন দিব্যি তাকিয়ে রয়েছে। এই

তথ্য রাসায়নিক তত্ত্বকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। যদি রক্তে হিপনোটক্সিন জমার জন্যে ঘুম আসত তবে এই একরক্তবাহী যমজদের ঘুমের তারতম্য হতে পারতো না। অবশ্য একথা ঠিক যে অতি-পরিশ্রমে দেহের অন্যান্য স্থানের মত স্নায়ুসংস্থাতেও টক্সিনের মত জিনিস জমতে পারে। এবং এর ফলে সহজে নিদ্রাকর্ষণও হতে পারে। কিন্তু এই তত্ত্ব দিয়ে ঘুমের রীতিপ্রকৃতি বা ঘুমের সময়ে মস্তিষ্ককোষের ক্রিয়াকলাপের সঠিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

এবার "নিদ্রা-কেন্দ্র" তত্ত্বের কথা শোনো। শ্বাস-প্রশ্বাসের কেন্দ্র, রক্তসঞ্চালনের কেন্দ্র মস্তিষ্কে আছে আমরা জানি। ঘুম একটা অতি-প্রয়োজনীয় জৈবিক প্রক্রিয়া। সুতরাং তার জন্যে একটা আলাদা কেন্দ্র থাকবে না কেন? একদল শারীরবৃত্তবিদ এইভাবে তর্ক তুলে বলেন, ঘুমের জন্যও একটা আলাদা কেন্দ্র আছে এবং তার অবস্থান মস্তিষ্ক বল্কলের তলদেশে—বল্কল-নিম্ন অঞ্চলে। অস্ট্রিয়ার গবেষক ইকোনোমো কয়েকটি এন্সেফালাইটিস রোগীর শবব্যবচ্ছেদ করে মস্তিষ্কের তলদেশে খানিকটা জায়গা রোগগ্রস্ত হয়েছে দেখতে পান। এই সব রোগীর প্রধান রোগলক্ষণ হল একটানা ঘুম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এরা ঘুমুতে থাকে। অনেক চেষ্টা করেও এদের জাগিয়ে রাখা যায় না। তিনি সহজেই ধারণা করেন মস্তিষ্কের নিম্নদেশে অবস্থিত 'নিদ্রা-কেন্দ্র' ঐ রোগের ফলে প্রভাবিত হওয়ায় ঘুমের উদ্রেক। স্বইট্জারল্যাণ্ডের হেস্ জীবন্ত কুকুরের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে ইলেক্ট্রোড চালিয়ে তড়িৎ তরঙ্গ প্রয়োগ করে একটি আকর্ষণীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। দেখা গেছে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ যখন একটি বিশেষ স্থানে,—মস্তিষ্কের নিম্নদেশে (হাইপোথ্যালামাস্) প্রবাহিত হয় তখনই কুকুর ঘুমিয়ে পড়ে। অন্য অংশের উত্তেজনায় ঘুম আসে না। এই স্থানটি 'নিদ্রাকেন্দ্র' বলে পরিচিত।

পাভলভ কিন্তু এই ব্যাখ্যাতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। পাভলভ-তত্ত্ব পেশ করার সময় আমরা তাঁর মতামত নিয়ে আলোচনা করব এবং এই 'বল্কল-নিম্ন নিদ্রা কেন্দ্রে'র কথা আবার তুলব। এখন এইটুকু জেনে রাখো, 'নিদ্রা কেন্দ্র' বলে কোনো বিশেষ কেন্দ্র মস্তিষ্কে নেই। তবে ঘুম মস্তিষ্ক-বল্কল থেকে যেমন নেমে আসতে পারে, তেমনি উঠে আসতে পারে নিম্নমস্তিষ্কের কোষগুলোর নিস্তেজনা থেকে। নিস্তেজনা কথাটি দিয়ে আমি ইনহিবিশন (inhibition) বোঝাতে চেয়েছি। এই 'ইন্হিবিশন্' নিয়ে সবিস্তার লিখব আগামীবারে। পাভলভের তত্ত্ব বুঝতে হলে এই 'ইন্হিবিশন্'কে ভাল করে বুঝতে হবে। যে সব তাত্ত্বিকদের

উল্লেখ করলাম তাঁদের সবাই 'ঘুম কি' এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে, ঘুম কিভাবে আসে—এই সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত। তত্ত্বগুলি তাই একপেশে হয়ে পড়েছে। ঘুমের গৌরচন্দ্রিকাতেই বোধ হয় তোমার ঘুম এসে গেছে। মস্তিষ্ক বল্কল, সূক্ষ্মজালতন্ত্র ও অন্যান্য জটিল নীরস বিষয়ের অবতারণা এখন করতে গেলে তোমার খুবই খারাপ লাগবে, তাই ভাবছি এবার কিছু খেয়াল কল্পনার কথা বলব। রসিয়ে বলার ক্ষমতা সকলের থাকে না। তবে আশা রাখি, তোমার রসিক মনের বদান্যতায় আমার নীরস বক্তব্যও সরস হয়ে উঠবে।

ঘুম সম্বন্ধে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব সত্যিই চিত্তাকর্ষক। আর ফ্রয়েডের কোন তত্ত্বই বা নয়? আদিম প্রথম রিপুর রসসিঞ্চিত ফ্রয়েড-তত্ত্বের পাঠকসংখ্যা তাই অগণিত। ঘুমুতে যাওয়ার আগে আমরা সব গাত্রাবরণ খুলে ফেলি। খুলে ফেলি চশমা, বাঁধান দাঁত, আর ঐ ধরনের যা দিয়ে দৈহিক ত্রুটি ঢেকে রাখি। এইভাবে দেহকে নিরাভরণ, নিরাবরণ করি। এ ছাড়া মনের আবরণও নামিয়ে রাখি ঘুমোবার আগে। "In addition to this, when they go to sleep they perform a perfectly analogous dismantling of their minds —they lay aside most of their mental acquisitions ; thus both physically and mentally approaching remarkably close to the situation in which they began life". দেহের দিক থেকে ঘুম এক ধরনের পিছু-হটা। ভুমিষ্ঠপূর্ব ভ্রূণাবস্থায় ফিরে যাওয়া। ঘুমোনোর সময় হাঁটুদুটো গুটিয়ে থুতনির কাছ বরাবর আন কি? তুমি না আনলেও—অনেকে আনে। জরায়ুর ভেতরে যে নিশ্চিত নিরাপত্তা, নিদ্রিত মানুষের অঙ্গভঙ্গীতে তারই আভাস ফুটে ওঠে। ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় এই অবস্থাকে বলা হয় regression। শুধু দেহ নয়, মনের দিক থেকেও ঘটে রিগ্রেশন—সেই আদিম অলীক বিশ্বাসের যুগে ফিরে যাওয়া ; বাইরের জগৎ থেকে চিত্তকে পুরোপুরি নিবৃত্ত করে এনে আত্মকেন্দ্রিক হওয়া। ঘুমন্ত অবস্থায় আমরা নাকি নার্সিসাসের মত আত্মরতির আনন্দে বিভোর হয়ে থাকি। ফ্রয়েডের মতে এই নার্সিসিজ্‌ম বা স্বকামপর্ব প্রতিটি মানুষকেই অতিক্রম করতে হয়। অতি-প্রাথমিক যৌনস্তর এই স্বকামপর্বকে পেরিয়ে শৈশবের সমকাম (homo-sexual) স্তরকে উতরিয়ে আমরা ভিন্নকামী (hetero-sexual) অবস্থায় পৌছুই। প্রতি রাত্রে ঘুমের মধ্যে আমরা এই

স্বকামপর্ব শৈশবে ফিরে যাই। 'অহং'কে প্রশ্রয় দিই নিদ্রিতাবস্থায়। পারিবারিক ও সামাজিক দায় থেকে মুক্তি পেতে চাই আমরা সবাই, আত্মপ্রেমে মশগুল হয়ে থাকতে চাওয়া আমাদের অবচেতন মনের কামনা,—তাই প্রতিরাত্রে পিছু হটে কয়েক ঘণ্টার জন্যে 'নার্সিসিজ্‌ম পর্ব' উপভোগ করি। অনেকে, বিশেষ করে তোমার মত আধুনিকারা, এমনিতেই অহংবাদী। তোমরা ফ্রয়েডের মতে এই নার্সিসিজ্‌ম-পর্ব কাটাতে পারো নি। থেকে থেকে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ছোট আয়না বের করে মুখ দেখ কি তুমি?—নিজের প্রশংসা শুনে উল্লাস হয় কি তোমার?—নিশ্চয়ই তুমি 'নার্সিসাস্‌ কমপ্লেক্সে' ভুগছ—ফ্রয়েড বলবেন। কি করে জানলেন ফ্রয়েড! "It is of course the study of dreams; which has taught us what we know of the mental characteristics of sleep."—এই হল ফ্রয়েডের উত্তর। স্বপ্নে উত্তম পুরুষই নায়ক। স্বপ্নবৃত্তান্ত ফ্রয়েডীয়ান বিশ্লেষণের ফলে শেষ পর্যন্ত যৌনধর্মী। ঘুম মাত্রেই রিগ্রেশন; স্বকাম পর্বে ফিরে যাওয়া।

এবার আর খুব নীরস লাগছে না বোধ হয়!

ফ্রয়েডের মতে ঘুমের মাধ্যমে আমরা অলীক বিশ্বাসের যুগে ফিরে যেতে চাই। 'অলীক বিশ্বাসে'র যুগ বলছি এই জন্য যে ফ্রয়েড বর্ণিত এই আদিম যুগের অস্তিত্ব—আধুনিক কোনো নৃতাত্ত্বিক লোকতাত্ত্বিক স্বীকার করেন না। ফ্রয়েডও জানতেন যে রবার্টসন স্মিথের অনুমান বিজ্ঞানগ্রাহ্য নয়। কী এই অনুমান? কোন যুগের কথা ফ্রয়েড বলছেন? অনেক, অনেকদিন আগে প্রাগৈতিহাসিক মানুষ তখন নির্মম অত্যাচারী দলপতির কঠোর শাসনে দিন কাটাতো। গোষ্ঠী গড়ে ওঠে নি, টোটেম (totem) চালু হয় নি, ট্যাবুর (taboo) বালাই নেই। দলের সমস্ত মেয়েদের একমাত্র ভোগস্বত্বাধিকারী দলপতি বা পিতা। ছেলেদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা দল থেকে বিতাড়িত হত; পাছে পিতার ভোগদখলে বাধা সৃষ্টি করে। মানবমন এসময় পশুমনের মতই অসংগঠিত। মানে, সজ্ঞান তখনো নির্জ্ঞান থেকে আলাদা হয়ে যায় নি। ফ্রয়েডীয় ইগো-সুপারইগোর আভাস নেই। মনের মধ্যে কর্তব্য-অকর্তব্য, উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায় নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। আদর্শ বলে কোনো কথাই তৈরী হয় নি। প্রবৃত্তি আর অন্ধ আবেগকে বাধা দেবার বা অবদমনের কোন অন্তর্মানসিক বিধিব্যবস্থাই নেই। প্রবৃত্তি আর

আবেগকে বশীভূত করতে পারে একমাত্র দলপতির শাসন। মন অখণ্ড, অবিভক্ত—জড়-জগতের সঙ্গে একাত্ম। মানসিক দ্বন্দ্বসংঘর্ষ অজানা। যা কিছু দ্বন্দ্ব বাইরের। সংঘর্ষ লড়াই নিজেদের মধ্যে অথবা পশুর সঙ্গে। অন্তর্দ্বন্দ্বহীন এই যুগকে ফ্রয়েড অলীক বিশ্বাসের যুগ বলেছেন। এর পরই পিতৃনিধন পর্ব। অপরাধমনস্কতা ও টোটেম-ট্যাবুর আবির্ভাব। মানব মনের উন্মেষ। সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলেই ফেলি; না হলে 'অলীক বিশ্বাসের' যুগ সম্পর্কে তোমার ধারণাটা ঝাপসা থেকে যাবে। ভারী মজার গল্প! ঐ সব খেদিয়ে দেওয়া ছেলের দল একদিন দল বেঁধে ফিরে এল। দলপতি পিতাকে হত্যা করে অত্যাচারের প্রতিশোধ নিল। শুধু তাই নয়! তার মাংস দিয়ে করল বিরাট ভোজের ব্যবস্থা। ফলে, প্রথম পাপবোধের সঞ্চার ঘটলো মানবমনে। ইদ আর ইগোর মধ্যে প্রথম পাঁচিল, এই আদিম পাপবোধ। এই পাপবোধই জন্ম দিল সেন্সর সুপার ইগোর। ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য ইত্যাদির বিচার শুরু হোলো মানুষের মনে। 'অবদমন' এখন থেকে হয়ে উঠল প্রচণ্ড শক্তিশালী মননক্রিয়া। তুমি ভাবছ, আমি বানিয়ে বলছি? স্বয়ং ফ্রয়েডের কোটেশন তুলে দিচ্ছি। তাহলে বিশ্বাস হবে নিশ্চয়ই! They hated the father who stood so powerfully in the way of their sexual demands........After they had satisfied their hate by his removal and had carried out their wish for identification (by devouring him).......a sense of guilt a was formed (Freud ; Basic Writings New York, 1938 Pp 916 917)

'ধান ভানতে শিবের গীত' নয়। ফ্রয়েডীয় মতে ঘুমের ইতিবৃত্ত বোঝাতে গিয়ে উপকথা, পুরাতত্ত্ব, আসবেই। কেননা ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব পুরাতত্ত্ব আশ্রিত। যেমন কিছু পরে আসবে পাভলভীয় শারীরবৃত্ত।

প্রসঙ্গত বলা উচিত, ফ্রয়েড মনে করতেন মানবসভ্যতার বিকাশ মানে আদিম সহজাত প্রবৃত্তির অবদমন। লোকগাথা, উপকথা—এর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস, একথা ফ্রয়েড মানতেন। তবে এ সবকিছুরই ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ফ্রয়েড শুধু প্রথম রিপুর সূত্র খুঁজেছেন। অন্য কোনো দিক তাঁর নজরে পড়েনি। প্রমেথিউসের গল্পের ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা শুনেছ কি? আগুনের লেলিহান শিখা ফ্রয়েডের মতে লিঙ্গের প্রতীক। আদিম সহজাত

প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ প্রথমে চেয়েছিল, ..."to gratify an infantile pleasure in respect of it and put it out with a stream of urine........the flames shooting upwards, like tongues, were originally felt to have a phallic sense. Putting out the fire by urinating therefore represented a sexual act with a man, an enjoyment of masculine potency in homo-sexual rivalry".

এই সমকামী ঈর্ষাপ্রবৃত্তি অবদমন করে প্রমেথিউস অগ্নিকে পোষ মানালেন। প্রাকৃতিক শক্তিকে বশীভূত করে সভ্যতার গোড়াপত্তন করলেন। "*By* curbing the fire of his own sexual passion he was able to tame fire as a force of nature. This great cultural victory was thus a reward for refraining from gratification of an instinct". কিন্তু এই অবদমনের জন্য তাঁকে বিশেষ মূল্য দিতে হল। পাহাড়ের সঙ্গে লোহার শিকলে বাঁধা প্রমেথিউসের দেহ থেকে তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে মাংস ছিঁড়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করলো শকুনি-গৃধিনীর দল। 'ইদের' প্রতিহিংসা কি ভীষণ! কাম রিপুর অবদমনের ফলে সভ্যতা; সভ্যতার ফলে ব্যক্তিমানসের দুর্দশা—এই হচ্ছে ফ্রয়েডীয় প্রতিপাদন।

'অলীক বিশ্বাসের যুগে' ফিরে যেতে চাই আমরা ঘুমের মাধ্যমে,—এই কথার তাৎপর্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ—এখন বোধহয় সেটা বুঝতে পারছ। ঘুমের মধ্যে আমরা বাইরের জগত থেকে সরে এসে ফেলে আসা সেই স্বর্ণযুগে ফিরে যেতে চাই। অবদমনপূর্ব এই স্বর্ণযুগে সুপার ইগোর অনুশাসন নেই, ইদ-ইগোর দ্বন্দ্ব নেই, অপরাধবোধের জ্বালা নেই। ঘুমের মধ্যে খণ্ডিত সত্তার সঙ্গে পুনর্মিলিত হই। এখন সমস্ত প্রবৃত্তির অবাধ স্বাধীনতা। অবদমিত কামনা বাসনা নোঙর-ছিঁড়ে নৌকার মত যথেচ্ছ ভেসে চলেছে। সেন্সরের কড়া পাহারা আর নেই, তাই তারা নির্জ্ঞান থেকে সংজ্ঞানে আসবার প্রয়াস পাচ্ছে। কিন্তু এতে ঘুমের বিঘ্ন ঘটতে পারে। তাই মানসিক জগতে গড়ে উঠেছে এক সুন্দর অথচ সুদৃঢ় প্রতিরোধ ব্যবস্থা। ব্যবস্থাটা কী জান? স্বপ্ন দেখা! এই ব্যবস্থার দৌলতে আদিম বাসনা কামনার পরিতৃপ্তি ঘটে, আবার ঘুমও ভাঙ্গে না। অচেতন মনের অলীক অভিলাষ পূরণের জন্য, অন্য কথায়, স্বপ্ন দেখার জন্যই যেন আমরা ঘুমুই।

—এই হল সংক্ষেপে ঘুম সম্পর্কে ফ্রয়েড-লিখিত সমাচার। 'স্বপ্নবৃত্তান্ত কথা অমৃত সমান।' তবে এখন মুলতুবি থাকবে স্বপ্ন-আলোচনা। ঘুমের কথা এখনও শেষ হয় নি।

[৩]

ঘুম সম্বন্ধে পাভলভের ব্যাখ্যা বিশেষভাবেই লিখব। তোমরা তো আমাকে পাভলভের প্রতি পক্ষপাতিত্ব-দোষে দোষী করে রেখেছই। আমি সেজন্য লজ্জিত নই।

রিফ্লেক্স, মানে পরাবর্ত থেকে শুরু করব। অনেকবার এ নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে, কিন্তু আমার মনে হয়েছে আমি তোমাকে ঠিকমত বোঝাতে পারি নি, কিম্বা তুমি ঠিকমত বুঝতে পারো নি। ও দুইই এক। আলোচনার সময় হাই তুলেছ, ঘড়ি দেখেছ, খোঁপা ঠিক আছে কি না পরখ করেছ। এবার মন দিয়ে পড়, খুব দুর্বোধ্য লাগবে না।

স্নায়ুতন্ত্রের প্রাথমিক ক্রিয়া হল এই রিফ্লেক্স। বাইরের উদ্দীপক স্নায়ুতন্ত্রে যে সাড়া জাগায় তারই নাম রিফ্লেক্স। পাভলভের অনেক আগেই রিফ্লেক্স কথাটা চালু ছিল। রিফ্লেক্স হচ্ছে সহজাত আদিম অতিসরল জৈবক্রিয়া, যাকে simple instinctive activity বলা হয়। তোমার চোখের সামনে যদি হঠাৎ হাজার ওয়াটের আলো জ্বলে ওঠে, তোমার চোখের পাতা আপনা হতে বন্ধ হয়ে যাবে। কুকুরের মুখে যদি খাদ্য দেওয়া হয়, তার লালা ঝরতে থাকবে। অ্যাসিড মুখে পড়লেও লালা বেরুবে। এ সবগুলোই রিফ্লেক্স ক্রিয়ার নিদর্শন। পাভলভের মতে রিফ্লেক্স হচ্ছে "The mechanism of definite connection by means of the nervous system between certain phenomena of the external world and the corresponding definite reactions of the organism". বহির্বাস্তবের ঘটনাবিশেষের সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সংযোজন ব্যবস্থার ফলে জীবদেহের নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়াকে রিফ্লেক্স বলা হয়। 'নির্দিষ্ট' কথাটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। কোনো বিশেষ উদ্দীপক যতবারই প্রয়োগ করা হোক না কেন, নির্দিষ্ট স্নায়ু-সংযোজনের ফলে এক বিশেষ নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে।

কী ভাবে এই শারীরক্রিয়া সংঘটিত হয়? বাইরের উদ্দীপক প্রথমে স্নায়ু-বিশেষকে উত্তেজিত করে স্নায়ুপ্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়। তারপর এই উত্তেজনা কেন্দ্রাভিগামী (centripetal) নার্ভ মাধ্যমে স্নায়ুতন্ত্রে গিয়ে পৌঁছয়। সেখান থেকে কেন্দ্রাভিগ (centrifugal) নার্ভ বেয়ে উত্তেজনা কোন একটি পেশী, গণ্ড বা দেহযন্ত্রে গিয়ে সাড়া জাগায়। এই প্রতিক্রিয়া স্থায়ী ও সুনির্দিষ্ট। একই জাতীয় প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে একটি বিশেষ উদ্দীপক প্রতিবারই একই ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটায়।

পাভলভীয় পরিভাষায় এই রিফ্লেক্সের নাম আনকণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স বা শর্তহীন পরাবর্ত। এই ক্রিয়ার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন নেই। এই ক্রিয়ার কেন্দ্রস্থল নিম্নমস্তিষ্ক।

এবার কণ্ডিশন্ড রিফ্লেক্সের আলোচনায় আসা যাক। কুকুরকে খাবার দিলে তার লালা পড়বে—এটা জানা আছে। প্রতিবারে খাবার দেবার ঠিক আগে একটা আলো জ্বালা হচ্ছে। কয়েকবার আলো জ্বালা আর খাবার দেওয়া এক সঙ্গে ঘটল। পরে দেখা যাবে শুধু আলো জ্বালালেই কুকুরটির লালা ঝরতে থাকবে ও সে আলোর দিকে যাবার চেষ্টা করবে। এর আগে কিন্তু আলো জ্বালতে কুকুরটির উপর কোন প্রতিক্রিয়াই হচ্ছিল না। আর অন্য কুকুরের উপরও এ-আলোর কোনো প্রভাব পড়বে না। এই আলোটিকে বলা হয় শর্তাধীন উদ্দীপক (কণ্ডিশন্ড্ ষ্টিমুলাস), আর কুকুরের উপর তার প্রতিক্রিয়াকে বলা হয় শর্তাধীন পরাবর্ত। কণ্ডিশন্ড্ রিফ্লেক্স নিয়ে জীব জন্মায় না। বাইরের পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে গিয়ে আয়ত্ত করে। আলোর রশ্মি উচ্চ-মস্তিষ্কের দর্শনকেন্দ্রে যে উদ্দীপনা জাগায়, সেই উদ্দীপনার সঙ্গে সহজাত জৈবক্রিয়ার দরুন (খাদ্য মুখে পড়লে লালা নিঃসরণ) নিম্নমস্তিষ্কের উদ্দীপনার যোগাযোগ ঘটার ফলে পরবর্তীকালে শুধু আলোই খাদ্য রিফ্লেক্স জাগিয়ে তোলে। এইভাবে মানবশিশু জন্মের পর থেকেই বহির্বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে নতুন গুণ আয়ত্তে এনে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে শেখে। কণ্ডিশন্ড্ রিফ্লেক্স তৈরী হয় শুধু উচ্চমস্তিষ্কে। আনকণ্ডিশন্ড্ রিফ্লেক্স প্রজাতিগত বৈশিষ্ট্য আর কণ্ডিশন্ড্ রিফ্লেক্স ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। মনে রেখো, জটিলতার মধ্যে না গিয়ে সহজভাবে প্রাথমিক জ্ঞান পরিবেশন করে তোমার কৌতূহল জাগাতে চেষ্টা করছি। তুমি বিশদ ও বিস্তারিত ভাবে ব্যাপারটাকে জানতে আগ্রহী হও, এই আমার উদ্দেশ্য।

তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ, ঘুমের কথা বলতে গিয়ে আদিকাণ্ড থেকে শুরু করলাম কেন? ঘুম, পাভলভের মতে সর্বাত্মক নিস্তেজনা বা ইনহিবিশন। এই 'ইনহিবিশন' বুঝতে হলে কণ্ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান থাকা দরকার। পাভলভ ছিলেন হাতে-কলমে কাজ করা বৈজ্ঞানিক। নিজস্ব কোনো ধারণার মধ্যে তথ্যগুলোকে ঢুকিয়ে দিয়ে মনগড়া কোন তত্ত্ব খাড়া করার চেষ্টা করেন নি কোনো দিন। এই রিফ্লেক্স নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলেই নিস্তেজনা ও পরে ঘুম সম্পর্কিত ধারণাগুলো তাঁর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর নিজের কথাতেই বলি—"শর্তাধীন পরাবর্ত সম্পর্কিত গবেষণাকালে আমাদের প্রায়ই নিদ্রাবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। এই পরিস্থিতি যেহেতু আমাদের পরীক্ষাকার্যকে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া এবং স্বাভাবিক পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া বহুলাংশে জটিল করিয়া তুলিতেছিল, সেইহেতু স্বভাবতই আমরা সে বিষয়ে (ঘুমের) বিশেষ মনোযোগ দিতে বাধ্য হই। ...জন্তুটিকে একটি বিচ্ছিন্ন কক্ষে আবদ্ধ করিয়া পরীক্ষামঞ্চে রাখিয়া দিলে, সে ধীরে ধীরে তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়ে ও পরে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়। ...পূর্বে, সাধারণভাবে কুকুরকে মঞ্চে রাখিবার সঙ্গে সঙ্গেই পরীক্ষা শুরু হইত—কুকুরটিকে বিশেষ শর্তাধীন উদ্দীপকের ক্রিয়াধীন করা হইত এবং শর্তহীন উদ্দীপকরূপে দেওয়া হইত খাদ্য। এই অবস্থাগুলি ঘুমন্ত অবস্থা সৃষ্টি করিত না। কিন্তু এখন কতকগুলি আনুষঙ্গিক অবস্থার কারণে কুকুরটিকে পূর্বের তুলনায় দীর্ঘতর সময়ের জন্য পরীক্ষা আরম্ভ হইবার অপেক্ষায় মঞ্চে রাখিয়া দেওয়া হইত। নিরবচ্ছিন্নভাবে ক্রিয়াশীল এই একঘেয়ে পরিবেশই ক্রমশ ঘুমন্ত অবস্থা সৃষ্টির হেতু। ·যেহেতু নিদ্রাবস্থা সৃষ্টি সম্পর্কিত বিশদ তথ্যাদি আমাদের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তাই আমরা এই প্রশ্নটি লইয়া পরম অধ্যাবসায়ের সহিত পরীক্ষা করিবার সিদ্ধান্ত করি।" (পাভলভ)

এর আগেও পাভলভ লক্ষ্য করেছিলেন যে কয়েকবার আলো দেখিয়ে (শর্তাধীন উদ্দীপক) যদি খাদ্য (শর্তহীন উদ্দীপক) দেওয়া না হয়, লালাঝরা থেমে যায়। আরও দেখেছিলেন যে শর্তাধীন পরাবর্ত চলাকালীন (আলোর উদ্দীপনায় লালা-নিঃসরণ) যদি সহসা নতুন কোনো লোক ঘরে আসে বা খুব জোরে কেউ দরজা বন্ধ করে, তা হলেও লালা-নিঃসরণ থেমে যায়; কুকুর মুখ তুলে লোকটিকে দেখে বা শব্দটির দিকে তাকায়। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে নিস্তেজনা ও ঘুম সম্পর্কিত গবেষণার সূত্রপাত।

সেচেনফ্ অবশ্য আগেই অনুমান করেছিলেন মস্তিষ্ককোষের দুই বিপরীত-ধর্মী গুণের অস্তিত্ব। আলো বা ঘণ্টা বা খাদ্য স্নায়ুকোষকে উত্তেজিত করছে, লালা পড়ছে। লালা পড়া থেমে যাওয়া মানে উত্তেজনার নিরসন নয়। একে শুধু নঙর্থক ক্রিয়া মনে করলে ভুল করবে। আর একটি প্রক্রিয়া—উত্তেজনার সম্পূর্ণ বিপরীত যার ধর্ম—শুরু হয়েছে। এরই নাম নিস্তেজনা—ইনহিবিশন। "Our whole life" says Pavlov "is a continuous interaction of these two processes........these processes are inseparable, they are always present not only in the nerve cell but in each nerve fibre".

উত্তেজনা স্নায়ুকেন্দ্র ও অধীনস্থ যন্ত্রপাতিকে ক্রিয়াশীল রাখে আর নিস্তেজনা প্রয়োজনমত এই ক্রিয়াশীলতা কমিয়ে বা থামিয়ে দেয়।

নিস্তেজনাধর্ম না থাকলে নিরবচ্ছিন্ন ও সুসমন্বিতভাবে কাজ করে যাওয়া সম্ভব হোতো না স্নায়ুকোষের পক্ষে। কোটি কোটি বছরের বিবর্তন অভিযোজনের ফলে স্নায়ুকোষে এই দুই বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়েছে। উত্তেজনা ও নিস্তেজনা স্নায়ুতন্ত্রের স্বভাবধর্ম।

ঘুমের শারীরবৃত্ত বুঝতে হলে নিস্তেজনা সম্পর্কিত আরো কিছু আলোচনা দরকার। কৌতূহলী মনকে আলোচনায় শেষ পর্যন্ত নিবিষ্ট রাখো। যতই বিরস হোক না কেন—লাইনগুলো বাদ দিয়ে যেও না। তা হলে যা জানতে চেয়েছো সেই সম্মোহন রহস্য চিররহস্যময়ই থেকে যাবে।

প্রধানত নিস্তেজনাকে দুভাগে ভাগ করেছেন পাভলভ—শর্তহীন বা বহিরাগত; শর্তাধীন বা অন্তর্জাত।

আগেই বলেছি, পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় সহসা যদি প্রাণীর পরিবেশে আকস্মিক কোন পরিবর্তন ঘটে, শর্তাধীন রিফ্লেক্স সাময়িকভাবে থেমে যায়। কুকুর খাচ্ছে, তার লালা ঝরছে, সাইরেন বাজলো। কুকুর চমকে উঠবে। তার লালা নিঃসরণ থেমে গেছে, সে শব্দের উৎস সন্ধান অনুসরণ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। মস্তিষ্কের অন্যস্থান উত্তেজিত হয়ে উঠেছে আর একটি শর্তহীন পরাবর্তের প্রভাবে। অনুসন্ধান বা ইন্‌ভেষ্টিগেশন রিফ্লেক্সের জন্য এই উত্তেজনা। এটি শর্তহীন বা আনকণ্ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স এবং কাজে কাজেই প্রজাতির জন্মগত ও স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। মস্তিষ্কের স্বভাবধর্মানুযায়ী একস্থানের উত্তেজনার দরুণ

অন্যস্থানে ঘটেছে নিস্তেজনার উদ্ভব। একে বলা হয় নেগেটিভ্ ইনডাকশন বা নঙর্থক আবেশন। এই নিস্তেজনা শর্তহীন বা বহিরাগত শ্রেণীতে পড়ে।

শর্তাধীন বা অন্তর্জাত নিস্তেজনার উদাহরণও আগে দিয়েছি। এই নিস্তেজনা উত্তেজনাকেন্দ্রেই সরাসরি উদ্ভূত হয়। শর্তাধীন উদ্দীপককে যদি নিয়মিত শর্তহীন উদ্দীপক দিয়ে সক্রিয় রাখা না হয় অথবা শর্তহীনের মাত্রা যদি কমিয়ে দেওয়া হয় তবেই এই শর্তাধীন নিস্তেজনার উন্মেষ ঘটবে। আলো দেখিয়ে যাচ্ছি অথচ খাবার দিচ্ছি না; কয়েকবার এমনি হলে লালার পরিমাণ কমতে কমতে একেবারে শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকবে। যে আলোক উদ্দীপক উত্তেজনা আনছিল, সেই এখন নিস্তেজনা আনছে। শর্তহীন উদ্দীপক প্রয়োগ না করে শর্তাধীন উদ্দীপক প্রয়োগ করে চললে নিস্তেজনা দীর্ঘস্থায়ী হবে।

নিস্তেজনা মানে উত্তেজনার অভাব বা অনুপস্থিতি মাত্র নয়। প্রাণীর কাছে শর্তহীন উদ্দীপকটি অর্থহীন নিষ্ক্রিয় ভাবলে ভুল হবে। এ-নিয়ে দস্তুরমত পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে।

কুকুরটির আর একটি খাদ্য-রিফ্লেক্স তৈরী করা হল ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে। এই ঘণ্টাধ্বনি রিফ্লেক্সে ৫০ ফোটা লালা ঝরছে। এখন এর সঙ্গে আলোর উদ্দীপকটি যোগ কর। ঘণ্টা বাজিয়ে আলো দেখাও; রিফ্লেক্সের ক্রিয়ার মাত্রা অনেকখানি কমে গেছে দেখতে পাবে। ৫০ এর জায়গায় মাত্র ২০ ফোঁটা লালা পড়ছে। নিস্তেজনা একটি সক্রিয় ধর্ম। নঙর্থক ভূমিকার জন্য একে নঙর্থক উদ্দীপক বলা চলে।

"মস্তিষ্কের সদর্থক (উত্তেজনাধর্মী) ও নঙর্থক (নিস্তেজনাধর্মী) এই দুই ধরনের স্নায়ুপ্রক্রিয়ার অস্তিত্ব বিশ্বপ্রকৃতির সব কিছুতেই যে মৌলিক দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য বিদ্যমান তারই নিদর্শন।" আসলে একই প্রক্রিয়ার দুই ব্যঞ্জনা—এই নিস্তেজনা আর উত্তেজনা। দুয়ে মিলে সামগ্রিক স্নায়ুপ্রক্রিয়ার আসল রূপ।

নিস্তেজনা ছাড়া বাইরের জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে সমন্বয় সম্ভব হোতো না। অযথা শক্তির অপব্যয় ঘটতো। ঘণ্টা বাজানোর সঙ্গে কণ্ডিশন্ড্ করা হয়েছে, অথচ খাবার দেওয়া হচ্ছে না। নিস্তেজনাপ্রক্রিয়া না থাকলে অকারণে লালা পড়তেই থাকতো। কোনো এক বিশেষ অবস্থায় একটা অভ্যাস তৈরী হলে, সে অভ্যাস আর ছাড়া যেত না। কি বিশ্রী অবস্থা ভাব দেখি! জীবনধারণ, প্রজাতিসংরক্ষণ ও আত্মরক্ষামূলক শর্তহীন পরাবর্তকে কেন্দ্র করে একবার যেসব

শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে উঠতো তারা একেবারে পরশুরামের কুঠারের মতই চিরস্থায়ী হয়ে সত্তার সঙ্গে লেগে থাকতো। খুবই মুস্কিল হোতো নাকি ?

এখন তুমি সেই বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে দূরের পাহাড়টির দিকে তাকিয়ে আছ। হাতে একখানা বই—কোনানডয়েল। ঘরের রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীত বেজে চলেছে। বাগান থেকে নাকে আসছে সত্যফোটা যুঁইফুলের গন্ধ। চড়াই পাখীর কিচির মিচির, কাকের কা-কা ছাড়াও অনেক রকমের শব্দ আশেপাশে। ঠাকুর পেঁয়াজ ভাজছে—কটু গন্ধ থেকে বুঝলে। পাহাড়টার মাথার উপর দিয়ে একটা এরোপ্লেন উড়ে যাচ্ছে। পিওনকে ঢুকতে দেখলে গেটের মধ্যে। তুমি সচকিত হয়ে উঠে চটিতে পা গলিয়ে, দ্রুত পদসঞ্চারে সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে চললে পিওনের দিকে। একখানা বিশেষ চিঠি তুমি আশা করছ। (মনোবিদের চিঠি নয়, বলাই বাহুল্য !) পিওনটি এখানে তোমার কাছে সব থেকে জোরালো উদ্দীপক। কোনানডয়েল, রবীন্দ্রসঙ্গীত, ফুলের গন্ধ, দো-পেঁয়াজির আস্বাদ সম্ভাবনা—ছোটবড় মাঝারি নানা রকমের উত্তেজনা আবর্ত তুলে চলেছিল তোমার মস্তিষ্ককোষে। অবশ্য রবীন্দ্রসঙ্গীতের দরুণ উত্তেজনা-আবর্তটি সব থেকে জোরালো উত্তেজনা-আবর্ত। ঠিক কি রকমের জান ? শান্ত পুকুরে টুপ করে একটা ঢিল ফেলে দেখেছ কখনো ? কেন্দ্রাভিগ আবর্তের সৃষ্টি হয়। মস্তিষ্কের উত্তেজনা-আবর্ত অনেকটা ঐরকম, যে ইন্দ্রিয় মারফত উদ্দীপক মস্তিষ্কে পৌছয় সেই ইন্দ্রিয় সন্নিবেশকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট ঢেউ-এর মত ছড়িয়ে পড়তে থাকে উত্তেজনা, অন্য জায়গার থেকে ওঠা ঢেউ-এর সঙ্গে এদের বাধে সংঘষ। এইভাবে ঢেউ-এর ভাঙ্গাগড়া খেলা চলে।

একস্থানের উত্তেজনা পাশের কেন্দ্রে নিস্তেজনা নিয়ে আসে। তুমি যতক্ষণ বসেছিলে, ঐ রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া আর কোনো উদ্দীপকই বেশী জোরালো সাড়া জাগায় নি। কাজেই তারা শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করছিল। পিওনের প্রবেশ তোমার কাছে একটা বিশেষ ঘটনা। তোমার মস্তিষ্ককে বিশেষভাবে উত্তেজিত করল। অন্য উত্তেজনাগুলো সাময়িকভাবে অন্তর্হিত হল। সে সব জায়গায় নিস্তেজনা নেমে এল—শর্তহীন বা বহিরাগত উত্তেজনার ফলে। পুরোপুরি বিজ্ঞান-সম্মত না হলেও উদাহরণটা ভালই। তোমাকে নিয়ে কিছু বলা হল ; কাজেই তোমার মনে থাকবে।

ভাবা যাক, ঐ খাকী পোষাক পরা পিওনের ব্যাগে রোজ তোমার নামে

থাকে একখানি সুদৃশ্য খামে ভরা রহস্যময় লিপি। সাগরপার থেকে একটি লোক রোজ নানা ছন্দে নানা সুরে লিখে জানাচ্ছে—'ভালবাসি, ভালবাসি'। কথাটি পুরণো হলেও মাদকতা তার অসীম। বক্তব্য অতি স্পষ্ট—তবু তোমার কাছে তাতেই অপার রহস্য। কোন পুরুষ যেন কোনদিন কোন নারীকে ঐ দুটি কথা বলেনি! অন্তত অত সুন্দরভাবে বলেনি! দেশী বিদেশী কবিতার কোটেশন যেন আর কোন প্রেমিক তার প্রেমিকাকে পাঠায় নি! সাড়ে নটা নাগাদ পিওনের ঈপ্সিত মূর্তি পথের বাঁকে দেখা যায়। তখনই তোমার বুকের রক্ত নেচে ওঠে। বিশ্বসংসারের আর সবকিছু মুছে যায়। লালা-নিঃসরণ মাপবার একটা বন্দোবস্ত করেছিলেন পাভলভ। খাদ্য সন্দর্শনে কুকুরের উত্তেজনার পরিমাপটা তাই আমরা সংখ্যাসূচিত করতে পারি। তোমার উত্তেজনা মাপবার যন্ত্র এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। তবুও অনুমান করতে পারি মস্তিষ্কের বিশেষ কেন্দ্র থেকে উত্তেজনা-প্রবাহ ছড়িয়ে পড়ছে। প্রেম-হর্মোন বলে যদি কিছু থাকে তবে তার নিঃসরিত রস হচ্ছে প্রেম-হর্ষরস। নেগেটিভ ইন্ডাকশনের দরুণ অন্য সব কেন্দ্রে নিস্তেজনা নেমে এসেছে। তিন মাস ধরে ঐ চিঠি পেয়ে আসছ। প্রেম এখানে আনকণ্ডিশন্ড্ উদ্দীপক, প্রেমপত্রবাহক পিওন কণ্ডিশন্ড্ উদ্দীপক, আর তোমার হর্ষ-রস নিঃসরণ এখানে কণ্ডিশন্ড্ রিফ্লেক্স। কিছু মনে কোরো না; এবার অকরুণ দৃশ্যের অবতারণা করছি। যে কোন কারণে পত্র আসা বন্ধ হল। লিপিকার নীরব। একদিন, দুদিন,······পনেরো দিন ধরে তুমি গেটের কাছে পাকড়াও করে অনেক জেরা করলে। তবুও সুদৃশ্য খামে ভরা রহস্যময় চিঠি সে দিতে পারল না। পিওন-সন্দর্শনে হর্ষরস নিঃসরণের মাত্রা কমে আসতে লাগল। সে-আবেগ, সে চাঞ্চল্য, সে ছুটে যাওয়া আর নেই। আরো কিছুদিন পরে দেখা যাবে, পথের বাঁকে পিওনের আবির্ভাবের সময় তুমি বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে থাকলেও দৃষ্টি তোমার কোনান-ডয়েলের পাতায় নিবদ্ধ। তোমার দেহে-মনে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। অর্থাৎ হর্ষরস শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। পিওনের দিকে নজর পড়লেও তুমি তাকে দেখতেই পাচ্ছ না। কণ্ডিশন্ড্ রিফ্লেক্স আপন নিয়মে ভেঙ্গে গেছে। ঐ মুহূর্তে অন্তর্জাত বা কণ্ডিশন্ড্ নিস্তেজনার সঞ্চার হয়েছে তোমার মস্তিষ্কে।

এতক্ষণ ধরে যে-নিস্তেজনা নিয়ে অনেক কথা বললাম, সেই নিস্তেজনা প্রাণীর অভিযোজনের পক্ষে অত্যন্ত দরকারী। পরিবেশের বিভিন্ন সংকেতের সঠিক বিশ্লেষণ নিস্তেজনা ছাড়া চলেই না। এ ছাড়া আর এক ধরনের নিস্তেজনার উল্লেখ করেছেন

পাভলভ।" ঘুমের প্রসঙ্গে এই নিস্তেজনা-ক্রিয়াই বিশেষ ভাবে আলোচ্য। পাভলভের আবিষ্কারগুলোর মধ্যে এটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, নিঃসন্দেহ। সব মস্তিষ্ক কোষেরই সহনশক্তি সসীম। উচ্চমস্তিষ্কের কোষগুলো অতিশয় কোমল, অল্পতেই সাড়া দেয়। আবার বেশীক্ষণ এই সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা তার থাকে না। দীর্ঘস্থায়ী উত্তেজনা বা স্বল্পস্থায়ী অতি-উত্তেজনা কোষগুলোর পক্ষে ক্ষতিকর। মস্তিষ্কের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে প্রকৃতি সব সময়েই সজাগ, লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের ফলশ্রুতি। কোনো স্থানের উত্তেজনা যখন নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখনই উত্তেজনার প্রান্তদেশ থেকে নিস্তেজনার আবর্ত সারা মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিশেষ ধরনের নিস্তেজনার নাম প্রতিরক্ষামূলক নিস্তেজনা, বা প্রোটেক্টিভ ইনহিবিশন। এই প্রতিরক্ষামূলক নিস্তেজনা কোষের ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ করে, শ্রান্তি দূর করে তাদের সতেজ সক্রিয় করে তোলে। প্রতিরক্ষামূলক নিস্তেজনা যেন মস্তিষ্কের অভিভাবক। পরীক্ষার আগে যখন বেশি রাত জেগে পড়তে, তোমার বাবা এসে আলো নিভিয়ে বই কেড়ে নিতেন,—তোমার কাছেই শোনা। তোমার স্বাস্থ্যরক্ষার প্রচেষ্টা। এই অভিভাবকটিও চেষ্টা করে মস্তিষ্ককোষগুলোকে সব রকম ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে।

পাভলভের মতে ঘুম আত্মরক্ষামূলক নিস্তেজনারই এক বিশেষ রূপ। নিস্তেজনা বিশেষ কয়েকটি নার্ভকোষের পক্ষে যেমন দরকারী, ঘুমও তেমনি দরকারী গোটা স্নায়ুতন্ত্রের পক্ষে: অতি-উত্তেজনা ও তার দরুণ ক্ষয়ক্ষতি থেকে মস্তিষ্ককোষকে রক্ষা করবার এক জৈবিক প্রক্রিয়া। নিস্তেজনা কয়েকটি কোষের বা স্থানীয় প্রতিরক্ষার উপায় আর ঘুম গোটা স্নায়ুতন্ত্রের। অন্তর্জাত নিস্তেজনা নেমে আসার সময় শুধু যে লালাঝরা থেমে যায় তা নয়; পরীক্ষাধীন কুকুর ঝিমুচ্ছে বা ঘুমিয়ে পড়েছে—প্রায়শই এরকম দেখা যায়। তেমনি আবার বহিরাগত নিস্তেজনার পরীক্ষাকালে দেখা গেছে ঘুম আর নিস্তেজনা একসঙ্গে আসছে। দীর্ঘস্থায়ী একঘেয়ে মৃদু উদ্দীপক যে ঘুম নিয়ে আসতে পারে, এ অভিজ্ঞতা সকলেরই আছে। উদ্দীপক যদি সমমাত্রিক বা ছন্দোময় হয় তবে ঘুম আরও তাড়াতাড়ি আসে। শিশুদের দোল দিয়ে, পিঠ চাপড়ে, গান গেয়ে ঘুম পাড়ানো হয়। এ-বিদ্যায় তুমি তো ওস্তাদ। তোমার বৌদিদের কাছে তাই তো তোমার এত দাম। ভ্রূকুঞ্চিত হল নিশ্চয়ই। আহা—তোমার অন্য মূল্য এর দ্বারা অস্বীকার করা হচ্ছে না! পাত্রভেদে মূল্যভেদ। আসল কথাটা হচ্ছে এই

মস্তিষ্কের কয়েকটি কোষ কিছুক্ষণ ধরে মৃদুভাবে উত্তেজিত হতে থাকলে সেই কোষগুলোতে নিস্তেজনা-তরঙ্গ ওঠে। সেই তরঙ্গ ধীরে ধীরে বা কোন সময়ে অতিক্রত সমস্ত মস্তিষ্ককোষে,—নিম্নমস্তিষ্ক সমেত গোটা স্নায়ুসংস্থায় ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজনার ঢেউ-এর মত নিস্তেজনার ঢেউও বাধা না পেয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এইভাবে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি।

স্বাভাবিক ঘুম কেমন করে আসে? সারাদিনের কাজ কর্মের মধ্যে মস্তিষ্কের কতকগুলো কোষ বিশেষভাবে উত্তেজিত হয়। এই উত্তেজনার মাত্রা যখন একটা বিশেষ পর্যায়ে ওঠে, যখন কোষগুলোর সহ্যের সীমানা ছাড়িয়ে যেতে চায় উত্তেজনা, তখন প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা ঘুম বা সর্বাত্মক নিস্তেজনা নেমে আসে। বিচ্ছিন্ন কোষগুলো থেকে ছোট ছোট নিস্তেজনার ঢেউ সমস্ত মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বেশি পরিশ্রান্ত হলে বসে বসেও ঘুমিয়ে পড়ে মানুষ। কিন্তু ঘুমের জন্য সাধারণত কিছু নির্দিষ্ট শর্ত দরকার। এগুলো সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। অভ্যাসের ফলে শর্তগুলি তৈরী হয়। মে মাসের দুপুরে পিচগলানো গরমে কোলকাতার রাস্তায় রিক্সওয়ালা বা ঝাঁকামুটে যে ভাবে ঘুমুতে পারে, তুমি সে ভাবে পারো না। নরম বিছানা, আধা অন্ধকার ঘর, ফ্যানের হাওয়া— এ না হলে তোমার ঘুম আসবে না। তোমার থেকেও উচ্চবিত্তের দরকার হবে এয়ারকণ্ডিশন্ড্ ঘরের। আবার বিশেষ অবস্থায়, শ্রান্তির মাত্রা চরমে উঠলে, তুমিও যে ঝাঁকা মাথায় দিয়ে গলির ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়তে পারবে না, এমন নয়।

নিস্তেজনা ও উত্তেজনায় মস্তিষ্ককোষের জৈবরাসায়নিক যে সব পরিবর্তন ঘটে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তোমারই ঘুম এসে যাবে। কেন না তোমার রসায়নের জ্ঞান যৎকিঞ্চিৎ; কাজেই দুর্বোধ্য ঠেকবে আমার বক্তব্য। তুমি বেশী করে চেষ্টা করবে বুঝতে, অর্থাৎ মস্তিষ্ককোষের ঘটবে চেষ্টাকৃত উত্তেজনা। অথবা বুঝতে না পারার দরুণ আমার চিঠির লাইনগুলো খাদ্যবিহীন ঘণ্টাধ্বনির মত তোমার কাছে অর্থহীন উত্তেজনা হয়ে দাঁড়াবে। যাই করো, ফলে প্রথমে কোষকেন্দ্রিক নিস্তেজনা, পরে সর্বাত্মক নিস্তেজনা বা ঘুম। তবে এইটুকু জেনে রাখো যে বিপাকক্রিয়া মানে metabolism জাত কতকগুলো রাসায়নিক পদার্থ মস্তিষ্ককোষগুলোকে নিস্তেজিত করে তোলে। ঘুম তখনই আসে যখন নিস্তেজনা চরমে পৌছয় এবং সারা মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়ে। পাভলভের কথাতেই বলি—"Inhibition is partial, fragmentary, narrowly limited

strictly localised sleep, confined within definite boundaries under the influence of the opposing process—that of excitation: sleep on the contrary is an inhibition which has spread over a great section of the cerebrum, over the entire hemisphere, and even into the lower lying midbrain···either the inhibition spreads and sleep sets in or the inhibition is limited and sleep disappears" ঘুম মানে বিশ্রাম—শুধু স্নায়ুসংস্থার নয়, সমগ্র জীবদেহের বিশ্রাম: আর বিশ্রাম মানে ক্ষয়-ক্ষতির পূরণ, বিপাকক্রিয়াজাত রস (যা নিস্তেজনার ঢেউ তুলেছিল) ঘুমের মধ্যে বিশ্রামের দরুণ নিঃশেষিত হয়ে যায়। সকালে ঘুম ভাঙার পর নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে তুমি নতুন প্রভাতকে অভ্যর্থনা জানাও।

এবার আর কয়েকটি দরকারী কথা বলে ঘুমের পর্ব শেষ করব। আগেই বলেছি দীর্ঘস্থায়ী একঘেয়ে মৃদু উদ্দীপক ঘুম নিয়ে আসে। ট্রেনে উঠে ইঞ্জিনের শব্দে অনেকেই ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু সবাই নয়। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চলমান দৃশ্য দেখে আনন্দ পেতে চায় ছোটরা। তাদের কাছে এঞ্জিনের শব্দ বা গাড়ীর দোলা ঘুম আনে না। নতুন চলমান দৃশ্য দেখার ঔৎসুক্য তাদের মস্তিষ্ককে বেশি রকম উত্তেজিত করে। কাজেই ঘুম আসে না। তদন্তকারী (Investigation) রিফ্লেক্স ছোটদের মধ্যে জোরালো। জোরালো একমের উত্তেজনা ঘুমের পরিপন্থী। বেশি আনন্দিত হলে ঘুম আসতে চায় না—ঘুরে ফিরে সেই আনন্দপ্রদ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমাদের মস্তিষ্ক আলোড়িত হতে থাকে। তেমনি আবার দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা বা ভয় ঘুমের প্রতিবন্ধক। এগুলো জোরালো হলেও বেশি জোরালো নয়, মাঝারি রকমের উদ্দীপক। অতি জোরালো উদ্দীপক—সে ভয়ের হলেও কিন্তু ঘুম নিয়ে আসবে। অতি উত্তেজনার ফলে প্রান্তঃসীমা ছাড়িয়ে যাবে বিনিময় নিস্তেজনা। এও স্নায়ুতন্ত্রের প্রতিরক্ষাত্মক প্রতিক্রিয়া। তোমার কুকুরটিকে (নামটা ভুলে গেছি) হঠাৎ চিৎ করে ফেলে খানিকক্ষণ জোর করে চেপে রেখে দাও। যেন নড়তে চড়তে না পারে। দেখবে সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

আর একটা মজার কথা। যখন আমরা পুরোপুরি জেগে আছি মনে করছি তখনও কিন্তু অনেকসময় অনেকগুলো কোষ বেশি উত্তেজিত ফলে সন্নিবিষ্ট

কতকগুলো কোষ নিস্তেজিত হয়ে থাকে। আর কতকগুলো কোষ থাকে স্বাভাবিক অবস্থায়। অর্থাৎ পুরোপুরি জেগে নেই আমরা। কতকগুলো কোষ তখনও নিস্তেজিত। আংশিকভাবে তারা ঘুমুচ্ছে। তেমনি ঘুমের সময়েও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কতকগুলো কোষ এদিক ওদিক জেগে থাকে। পুরোপুরি ঘুমোই আমরা কমই। সারা মস্তিষ্কব্যাপী গভীর নিস্তেজনার ঘুম হয় না, এমন নয়। তবে দু' একটা কেন্দ্র জেগে থাকাটাই স্বাভাবিক। এই তথ্যগুলো মনে রেখো, তবেই স্বপ্নরহস্য বুঝতে পারবে।

দৈনন্দিন জীবনের কতকগুলো অতি-পরিচিত ঘটনার ব্যাখ্যা করব এবার। তোমার শৈশবে ফিরে যাও। দুপুর বেলায় তোমার মা কোলের বাচ্চাটার পাশে শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। সকাল থেকে রান্নাঘরে কেটেছে ছ'ঘণ্টা। খুবই শ্রান্ত। তোমার বয়স পাঁচ কি ছয়। পাশের বাড়ীর সমবয়সী বন্ধুদের নিয়ে ঘরের মধ্যেই তোমরা লুকোচুরি খেলছ। দুপদাপ শব্দ। তুমি চোর হয়েই—'আব্বা' বলে চেঁচিয়ে উঠছ। বন্ধুদের সঙ্গে এই নিয়ে ঝগড়া বেধেছে। মার ঘুম ভাঙ্‌ছে না। কিন্তু বাচ্চাটা সামান্য নড়ে উঠতে বা মৃদু শব্দ করতেই তোমার মা জেগে উঠছেন। অনেকদিন এরকম ঘটেছে। তুমি খেয়াল করনি।

কারখানায় সশব্দে যন্ত্রপাতি চলছে। বয়লার এঞ্জিনের পাশে গামছা বিছিয়ে দিব্যি ঘুমিয়ে নিচ্ছে টিণ্ডেল। বয়লারের বাষ্পচাপ সামান্য এদিক ওদিক হওয়াতে যে শব্দের তারতম্য ঘটছে—তাতেই কিন্তু ওর ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছে। পিকনিকে যেতে হবে ভোর পাঁচটায়। চারটেয় ঘুম ভাঙা চাইই। ঘড়িতে এলার্ম না দিয়েও মনে মনে এই কথা ভেবে শুলে ঠিক ঘুম ভেঙে যায়। কিভাবে এসব সম্ভব হয়? যেন, একজন শান্ত্রীকে পাহারায় রেখে গোটা শিবির ঘুমিয়ে আছে। সামান্যতম বিপদের সঙ্কেত পেলেই সে ঘুমন্ত সৈনিকদের জাগিয়ে তুলছে। পাভলভের মতে কণ্ডিশনিং-এর দরুণ এই sentry post তৈরী হয়েছে। আশেপাশের কোষগুলোর অতি-নিস্তেজনার ফলে এই বিশেষ জায়গাটি অতিমাত্রায় উত্তেজনাপ্রবণ হয়ে বাইরের উদ্দীপকের সঙ্গে সংযোগ রাখতে অভ্যস্ত হয়েছে। এই নিয়ে একটি ল্যাবরেটরী এক্সপেরিমেণ্টের উল্লেখ এখানে করব।

সেকেণ্ডে ২৫৬ স্পন্দনের একটি বাঁশির শব্দের সঙ্গে কুকুরের খাদ্য রিফ্লেক্স তৈরী করা হল। খাদ্য না দিয়ে কাছাকাছি স্পন্দনের আর একটি শব্দ (স্পন্দন ২১২) শোনানো হল কয়েকবার। প্রথমদিকে এই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে লালা ঝরতে থাকবে।

তারপর এই শব্দে লালা ঝরবে না। ২৫৬ স্পন্দনের খাদ্য রিফ্লেক্সটি—(বারে বারে খাদ্য দেওয়া ও শব্দ করার ফলে) আরও শক্তিশালী করে তোলা হল। কিছু পরে কাছাকাছি অন্য কোনো শব্দেই লালা ঝরবে না। এইবার যদি ২১২ স্পন্দনের শব্দটি বেশিক্ষণ ধরে শোনানো যায়, কুকুরটি নিস্তেজনার জন্য ঘুমিয়ে পড়বে। এই ঘুমের মধ্যে যতবার ঐ স্পন্দনের বাঁশিটি বাজানো হবে, ততবারই সে জেগে উঠবে ও তার খাদ্য রিফ্লেক্স সক্রিয় হবে। ২৫৬ স্পন্দনের বাঁশির শব্দ ঐ কুকুরের কাছে এখন বিশেষ অর্থব্যঞ্জক। বাঁশির শব্দে sentry post তৈরী হয়েছে মস্তিষ্কে। কৃষ্ণের মুরলীধ্বনির সঙ্গে শ্রীরাধিকারও এমনি conditioning ঘটেছিল। তাই তিনি ঘুম থেকে উঠে ছুটে যেতেন যমুনাতীরে। জাগ্রত অবস্থার রিফ্লেক্সটি ঘুমের মধ্যেও বজায় থাকত।

জীবজগতে এই 'sentry-post' ব্যবস্থার তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অক্টোপাস যখন ঘুমোয়, সাতটা পা গুটিয়ে নেয় কিন্তু অষ্টমটি সোজা হয়ে সম্ভাব্য বিপদের সংকেত ধরবার জন্য জেগে থাকে। যূথবদ্ধ পশুরা যখন ঘুমোয়, এক আধটা জেগে থেকে শান্ত্রীর কাজ করে যায়, বিপদের গন্ধ পেলেই সবাইকে জাগিয়ে তোলে।

এই সব দেখেশুনে পাভলভ মন্তব্য করেছেন—"the waking state of the animal always includes partial sleep and precisely in the subtlest relations of the animal with the outside world and in the sleeping state there are always waking, active points in the cerebral hemispheres, which are, as it were sentries on duty".

*　　　*　　　*

ঘুমের শারীরবৃত্তিক আর দু'একটি বিশেষত্বের কথা উল্লেখ না করে স্বপ্ন-বৃত্তান্তে যেতে পারছি না। ঘুম, স্বপ্ন আর সম্মোহন ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। একের সঙ্গে অপরের জটিল চলমান সম্পর্ক বিদ্যমান। স্বাভাবিকভাবে তোমার চোখে ঘুম নেমে এসেছে, কিংবা ধীরে ধীরে জেগে উঠছ, এর মধ্যে দ্রুত বিলীয়মান অনেকগুলো শারীরবৃত্তিক অবস্থা পেরিয়ে এসেছ—তা জানো কি? রাত্রে পড়বার সময় তন্দ্রার ভাব বা ঝিমুনির জন্য ছোটবেলায় মেজদির কাছে চিমটি খেতে,—

মনে আছে নিশ্চয়ই! ঘুম পেলেই যেমন ঝিমুনি আসে, তেমনি ঘুম ভাঙার আগেও আসে একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব। শরীরে খাদ্য দরকার হলে খিদে পায়, জল দরকার হলে তৃষ্ণা পায়, তেমনি ঘুমের প্রয়োজন হলে আসে তন্দ্রা বা ঝিমুনি। বইয়ের দিকে তাকিয়ে আছ কিন্তু লাইনগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে, মানে ঠিকমত বোঝা যাচ্ছে না, মাথাটা কেমন ভারী হয়ে উঠেছে। তোমার ঘুম পাচ্ছে। শরীরের পেশীগুলো শিথিল হয়ে আসছে, হাই তুলছ, আড়ামোড়া ভাঙছ, মেজদির চিমটির ভয়ে ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা চলছে। মেজদির কিন্তু অন্যায়। তিনি জানতেন না তোমাকে জোর করে জাগিয়ে রেখে কোন লাভ নেই। পড়ার একবর্ণও মাথায় ঢুকবে না। মাঝখান থেকে শরীর খারাপ লাগবে, মেজাজ বিগড়ে যাবে।

এখন দেখা যাক ঘুম আসবার ঠিক আগে দেহ-মনের কি অবস্থা ঘটে। রূপরসগন্ধভরা ধরণীর সঙ্গে ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়সংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। শব্দ-দৃশ্য-গন্ধ-স্পর্শ, মনে হয় যেন, সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার থেকে মোটা তুলোর প্যাডের মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কে ক্ষীণ সাড়া জাগাচ্ছে। চেয়ারে বসে ঝিমুনো তোমার অভ্যাস আছে। কারুর কথা কানে যাচ্ছে না, মাথাটা নীচু হয়ে বুকে ঠেকছে, চোখ দুটো আধবোঁজা। হঠাৎ ফেরিওয়ালার বিচিত্র চীৎকার কানে যেতেই পরিবেশ সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠছ, আবার পর মুহূর্তেই ঝিমুনি। পুরো ঘুম না এলেও এ অবস্থায় পরিবেশের সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ রাখা অসম্ভব। যখন বাচ্চাদের পড়ার তদারক করবে আমার এই কথাগুলো মনে রেখো। তাদের জোর করে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করো না।

ঘুম থেকে জেগে ওঠাও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, একটা ধীর ও ক্রমান্বয়িক প্রক্রিয়া। বাইরের সঙ্গে পূর্ণ সংযোগ স্থাপিত হতে একটু সময় লাগে। বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। চোখে এসে আলো পড়ছে, ঘুম ভেঙ্গে আসছে, আবার ঘুমিয়ে পড়ছে।

বাচ্চা না হলেও এ-অবস্থা তোমার রোজই ভোরবেলায় হয়ে থাকে। কোন কোন সময় লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়ই, অনেকে ঘুম থেকে উঠে অল্পক্ষণের জন্য অদ্ভুত ব্যবহার করে। অসংলগ্ন কথা বলে, রেগে যায়, স্থানকাল সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে পারে না। অযৌক্তিক ব্যবহারের কারণ পরিবেশ সম্পর্কে ক্ষণিকের আংশিক বা বিকৃত অবধাবন। ঘুমিয়ে পড়লে ইন্দ্রিয়গুলো বাইরের উদ্দীপনায়

সাড়া দেয় না। আবার বাইরের উদ্দীপনার মস্তিষ্কে পৌঁছবার পথগুলো অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারগুলো রুদ্ধ করলে তাড়াতাড়ি ঘুম আসে। এ-নিয়ে দু'একটা উদাহরণের উল্লেখ বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গ্যালকিন কয়েকটি কুকুরের শ্রবণ, দর্শন ও ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহী নার্ভগুলোকে কেটে দেখেছিলেন কুকুরগুলো দিনের মধ্যে ২৩ ঘণ্টার বেশী ঘুমিয়ে কাটাচ্ছে। নেভ্‌স্কী জন্তুজানোয়ারের চোখ বেঁধে, কানে প্লাগ দিয়ে ঐ একই ফল পেয়েছিলেন। জার্মান ডাক্তার ষ্ট্রাম্‌পেলের বালক রোগীটির কথা চিকিৎসকমাত্রেই জানেন। এর এক চোখ ছিল দৃষ্টিশক্তিহীন ও একটি কান শ্রবণশক্তিহীণ: আবার সারা দেহের ত্বকের অনুভূতিশক্তি গিয়েছিল নষ্ট হয়ে। সুস্থ চোখ ও কান বন্ধ করে দিলেই ও ঘুমিয়ে পড়তো। পাভলভের লেখায় এমনি একজন রোগীর খবর পাওয়া যায়। মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাতের ফলে এরও একটি কান ও একটি চোখ ছাড়া আর সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই অক্ষত চোখ কান বন্ধ করা মাত্রই সে ঘুমিয়ে পড়ত। সেচেনফ লিখে গেছেন যে ইন্দ্রিয়-উপলব্ধির অবলুপ্তি ঘটলে গভীর ঘুম আসবেই।

এই সব উদাহরণের শারীরবৃত্তিক তাৎপর্য কি? একথা মনে করা কি যুক্তিযুক্ত হবে যে ঘুম কেবলমাত্র মস্তিষ্কের উত্তেজনা নিরোধের উপর নির্ভর করে? এইসব ক্ষেত্রে ঘুমকে পাভলভ অক্রিয় ঘুম বা passive sleep বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে মস্তিষ্কের বাইরের উদ্দীপনা কম আসার ফলে উত্তেজনা-প্রক্রিয়া দুর্বল হয়ে পড়ে। কাজেই নিস্তেজনা প্রতিস্থাপিত হয়ে সহজেই সারা মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়ে। তবে তোমাকে আগেই লিখেছি, ঘুম মূলত একটি আভ্যাসিক ব্যাপার। যে কোন অবস্থায় যে-কোন ভাবে মানুষ ঘুমিয়ে পড়তে পারে। সৈনিকরা গোলাগুলির শব্দ উপেক্ষা করে চলতে চলতে ঘুমোয়। অশ্বারোহীরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে যেতে যেতে ঘুমোয়। উত্তর মেরুর অভিযাত্রী নানসেন ও তাঁর সহযাত্রীরা অনেক সময় লম্বা 'স্কি দৌড়ের' মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তেন।

মস্তিষ্কের অবসাদ থেকেই সবক্ষেত্রে ঘুম আসে, এমন নয়। পাভলভ মনে করেন যে, ঘুম একরকম শর্তাধীন পরাবর্ত (conditioned reflex)। পর্যাবৃত্ত নিয়মানুবর্তিতা অর্থাৎ একই সময়ে একই পরিবেশে, নিয়মিত শোবার ব্যবস্থা সহজেই ঘুম নিয়ে আসে। ঘুমুতে যাওয়া ও ঘুম থেকে ওঠার ব্যাপারে যারা নির্দিষ্ট নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলে, তাদের কোনদিন ঘুমের ব্যাঘাত হয় না।

মস্তিষ্কোষের ক্লান্তি ও অবসাদ ছাড়াও ঘুম আসতে পারে আগেই বলেছি।

মনে আছে? আমার ঘুমপাড়ানিয়া খাটে শোবার আগে তুমি কত ওজর আপত্তি তুলতে। বিকেল পাঁচটায় কি ঘুম আসতে পারে? সারা দুপুর ঘুমিয়েছি, কি করে ঘুম হবে? কিন্তু তোমার ঘুম হত। আমার অভিভাবনে তুমি ঘুমিয়ে পড়তে। ঘুম আসার আগে তোমার দেহ-মনে যে পরিবর্তনগুলো ঘটে, আমি সেইগুলো আবৃত্তি করে তোমাকে অভিভাবিত করতাম। "তোমার ঘুম আসছে। —হাত পা ভারী হয়ে গেছে। সারাদেহ অসাড় অবশ আড়ষ্ট হয়ে গেছে। চোখের পাতা ভারী হয়ে ঘুমে জড়িয়ে আসছে। তুমি ঘুমিয়ে পড়ছ।" তুমি ঘুমিয়ে পড়তে। এর নাম সাজেষ্টেড স্লিপ বা অভিভাবিত ঘুম। Everything that coincides many times with the development of sleep, itself begins to aid in its onset—এই হচ্ছে পাভলভিয়ানদের বক্তব্য। পাভলভের গবেষণাগারের কুকুরগুলোর কথা আগেই উল্লেখ করেছি। একই ঘরে, একই ষ্ট্যাণ্ডে পরীক্ষাকালে তারা ঘুমিয়ে পড়ত। কয়েক দিন পরে ঘরে ঢুকে দাঁড় করানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাদের ঘুম আসছে দেখা যেত। খুব ছটফটে তেজী কুকুরও চৌকাঠ পেরিয়ে ষ্ট্যাণ্ডের দিকে আসতেই ঝিমুতে থাকত। পরিবেশ অনুকূল অর্থাৎ শর্তাধীন হবার ফলে তাদের ঘুম আসত। এই প্রসঙ্গে একটা মজার কথা বলি শোন। তোমাকে ঘুমের ওষুধ বলে যে পিলগুলি দিতাম, সেগুলো ঘুমের ওষুধের মত দেখতে ছিল বটে, কিন্তু আসলে সেগুলো ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেটের বড়ি। তুমি বলতে—কিছুতেই ঘুম আসছে না দেখে একটা পিল খেতেই হল। তাতে তুমি গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়তে। অভিভাবন ঘুমের আর একটা নিদর্শন। পাভলভের ল্যাবরেটরীতে ক্লোরাল হাইড্রাস [ঘুমের ওষুধ] গরম জলে মিশিয়ে কুকুরদের মলাশয়ে প্রবিষ্ট করে ঘুম পাড়াবার ব্যবস্থা ছিল। কয়েকদিন এভাবে ঘুম পাড়িয়ে পরে শুধু গরমজল ইনজেকৃশন করেও দেখা গেল কুকুরগুলো আগের মতই ঘুমিয়ে পড়ছে। আরও পরে ইনজেকৃশনের প্রস্তুতিপর্বেই কুকুরগুলো ঝিমুতে শুরু করত ও কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ত। ইনজেকশনের প্রস্তুতি এখানে কণ্ডিশন্‌ড্ ষ্টিমুলাস, ক্লোরাল হাইড্রাস বা ঘুমের ওষুধ আনকণ্ডিশনড্ ষ্টিমুলাস, আর ঘুম কণ্ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স। তোমার বেলায় আমার সাজেশ্‌ন—যে ক্যালসিয়ামের বড়িগুলো ঘুমের ওষুধ—কাজ করেছে সন্দেহ নেই; কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমের ওষুধের মত দেখতে পিল গেলবার প্রক্রিয়া কণ্ডিশন্‌ড্-ষ্টিমুলাসের কাজও করেছে নিশ্চয়ই। একজন সোভিয়েত ডাক্তার

ঘুমের উদ্দীপকের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক দিন খুব জোরে ঘণ্টা বাজিয়ে দেখিয়েছেন যে পরে শুধু তীব্র ঘণ্টাধ্বনিই ঘুম আনতে সক্ষম।

ঘুমের শারীরবৃত্তের সঙ্গেই সম্পর্কিত আর একটি বিষয়ের অবতারণা করা এখুনি দরকার। বিষয়টির গুরুত্ব সবিশেষ। উত্তেজনা থেকে নিস্তেজনায় রূপান্তর সর্বত্র এক সময়ে ঘটে না। মস্তিষ্ককোষে নিস্তেজনা প্রবাহ নেমে আসে ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে। নিস্তেজনামাত্রার কমবেশি অনুযায়ী কয়েকটি অন্তর্বর্তী অবস্থার উদ্ভব হয়। ঘুম থেকে জেগে ওঠার ব্যাপারেও এই অন্তর্বর্তী অবস্থা লক্ষ্য করা গেছে। বলতে পারো, ঘুমের চার দশা। কণ্ডিশন্‌ড্‌ ষ্টিমুলাস বা শর্তাধীন উদ্দীপক এই চার দশায় চার রকম রিফ্লেক্স বা পরাবর্ত সৃষ্টি করে। ষ্টিমুলাসের শক্তির মাত্রাবৃদ্ধিতে রিফ্লেক্সের মাত্রা বাড়বে; এই হচ্ছে সুস্থ জাগ্রত মস্তিষ্কের প্রকৃত ধর্ম; প্রকৃতিজগতের সাধারণ নিয়ম। একেই বলে 'ল অফ ফোর্স রিলেশন্'স্। উদ্দীপক যদি পাঁচ মাত্রার হয় মস্তিষ্ককোষের উত্তেজনাও পাঁচমাত্রা হবে। উত্তেজনার ফলে রিফ্লেক্সও হবে পাঁচমাত্রার। উদ্দীপক দশমাত্রার হলে উত্তেজনা ও রিফ্লেক্সও হবে যথাক্রমে দশমাত্রার: পনেরো মাত্রায় পনেরো মাত্রা ইত্যাদি। গোলমাল লাগছে—তাই না? আচ্ছা, একটা ল্যাবরেটরি এক্সপেরিমেণ্টের উদাহরণ টেনে ব্যাপারটাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। কুকুরের লালানিঃসরণের এক্সপেরিমেণ্টই ভালো। ধরা যাক সেকেণ্ডে ১০০ স্পন্দন (oscillation) কোন শব্দের সঙ্গে [এক্ষেত্রে সাধারণত metronome ব্যবহার করা হয়] কুকুরের লালানিঃসরণ কণ্ডিশন্‌ড্‌ করা হয়েছে। ধরা যাক দশফোঁটা লালা ঝরছে প্রতিবার। তাহলে, সেকেণ্ডে ২০০ স্পন্দনওয়ালা শব্দে ২০ ফোঁটা লালা ঝরবে। ৩০০ স্পন্দনে ৩০ ফোঁটা। এই হচ্ছে জাগ্রত অবস্থার সুস্থ মস্তিষ্কের প্রক্রিয়া। উদ্দীপকের শক্তিমাত্রা বাড়লেই রিফ্লেক্সমাত্রাও বাড়বে। জাগরণ ও ঘুমের অন্তর্বর্তীকালে এই ফলাফলের গাণিতিক হার বজায় থাকে না। প্রথমে আসবে 'সমকক্ষ' দশা—ফেজ্‌ অব ইকোয়ালিটি (phase of equality)। উদ্দীপকের মাত্রা বাড়াও আর কমাও, লালার পরিমাণ একই থাকবে। ১০০ স্পন্দনওয়ালা শব্দে যত ফোঁটা লালা, ৫০০ স্পন্দনওয়ালাতেও তত ফোঁটা। নিস্তেজনার ছোঁয়া লেগেছে মস্তিষ্ককোষে। নিস্তেজনার পরিমাণ আরও বাড়লে দেখা যাবে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির আবির্ভাব হয়েছে। কম মাত্রার উদ্দীপক বেশি মাত্রার উদ্দীপকের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ১০০ স্পন্দন শব্দে লালা ঝরছে ৩০

ফোঁটা, আর ৩০০ স্পন্দন শব্দে ১০ ফোঁটা। আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী এই অবস্থাকে পাভলভ paradoxical phase বলে বর্ণনা করেছেন। এরপর আসবে অতি-স্ববিরোধী বা ultra paradoxical phase। এখন আরও অদ্ভূত মস্তিষ্কের আচরণ। উদ্দীপক আদৌ উত্তেজনা আনছে না। শব্দে সাড়া দিচ্ছে না লালাগ্রন্থি। কণ্ডিশন্‌ড্ স্টিমুলাস স্বকীয় তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছে। এই সময় আর এক মজার ব্যাপার দেখা যাবে। নঙর্থক উদ্দীপক সদর্থক প্রতিক্রিয়া জাগাচ্ছে। অর্থাৎ যে উদ্দীপকে এর আগে লালা ঝরা বন্ধ হয়ে যেত সেই উদ্দীপকে এখন লালা ঝরছে। মস্তিষ্কধর্মেরও ওলটপালট ঘটছে। এই তিন অন্তর্বর্তী দশার পর আসবে চতুর্থ দশা। আরও বেশি নিস্তেজনার ফলে ছোট বড় মাঝারি সব রকমের উদ্দীপকেই ক্ষীণভাবে সাড়া দেবে মস্তিষ্ক, শক্তি-সম্পর্কের সামঞ্জস্য বজায় রেখে। অর্থাৎ ১০০ স্পন্দনে যদি একফোঁটা লালা ঝরে—পাঁচশ স্পন্দনে পাচফোঁটা ঝরবে। সুস্থ জাগ্রত মস্তিষ্কের ধর্মই বজায় রয়েছে, শুধু মস্তিষ্কের সাড়া দেবার ক্ষমতা কমে গেছে। এরপর নিস্তেজনার ব্যাপ্তি ও গভীরতা বৃদ্ধি: গাঢ় ঘুম। সব শর্তাধীন পরাবর্তই নিষ্ক্রিয়। কোন রকম সাড়াই নেই। লালানিঃসরণ আর হবে না।

সম্মোহনের স্বরূপ বুঝতে হলে অন্তর্বর্তী এই 'চার দশার' কথা মনে রাখতে হবে। স্ববিরোধী বা প্যারাডক্সিক্যাল ফেজকে পাভলভ বলেছেন, "phase of suggestion"। সাজেশ্‌ন বা অভিভাবনের প্রভাব নিজের জীবনে আমরা সকলেই কম বেশি অনুভব করেছি। সম্মোহিত অবস্থায় অভিভাবনের কথা আমি বলছি না। জাগ্রত অবস্থার কথা বলছি। তুমি যখন জেগে আছ (মনে আছে তো,—আমি আগের চিঠিতে লিখেছিলাম) তখনও সব সময় পুরোপুরি জেগে নেই। মস্তিষ্কের কিছু অংশ হয়ত তখন আধা ঘুমন্ত [পাভলভের ভাষায়—প্যারাডক্সিক্যাল] অবস্থায় রয়েছে। এই অবস্থায় মুখের কথার মত দুর্বল উদ্দীপক [সাজেশন মানেই মুখের কথা] মস্তিষ্কের ঐ আধাঘুমন্ত অংশে খুব জোরালো উত্তেজনার সৃষ্টি করবে।

ছোটবেলা থেকে এপর্যন্ত যতটা শিখেছ বা জেনেছ, হিসেব করে দেখলে বুঝবে, তার মধ্যে বেশিটাই অভিভাবন প্রসাদাৎ। যখন মেজদি বলেছেন পৃথিবীটা গোল, অবিশ্বাস্য লাগেনি। প্রমাণ বা যুক্তি খোঁজনি—নির্বিচারে মেনে নিয়েছ। এটা না হয় বৈজ্ঞানিক সত্য। এমন অনেক কিছু আমরা নির্বিচারে

গ্রহণ করি যার বাস্তব ভিত্তি নেই। গোটা মস্তিষ্কের যুক্তি-তর্ক, সামগ্রিক বিচারপদ্ধতি আমরা সব সময়ে মেনে চলি না। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে বলা উচিত, মস্তিষ্ক সব সময়ে সামগ্রিকভাবে কাজ করে না। খণ্ডিত আধা-ঘুমন্ত অংশ সমগ্র থেকে আলাদা হয়ে অভিভাবনের জোরে আমাদের কাজকর্ম, আচার-ব্যবহারকে অনেক সময়ই নিয়ন্ত্রিত করে। "The basic mechanism of suggestibility is connected with the dissociation of the normal i. e. the unified work of the entire cortex : suggestion plays a particularly important part in our education" [Platanov]। শুধু এডুকেশন নয়, আমাদের ধ্যানধারণা, প্রাইড্-প্রেজুডিস, রাজনৈতিক মতবাদ, দলানুগত্য ইত্যাদির মধ্যে যুক্তিহীন অভিভাবনের প্রভাব কতখানি কাজ করে, তা তুমি ধারণা করতে পারবে না। তোমার নিজের ব্যাপারে ত' মানতেই চাইবে না যে তোমার বিশ্বাস-অবিশ্বাস, পছন্দ-অপছন্দ, ভালোমন্দ বিচারের মধ্যে অভিজ্ঞতার প্রভাব আছে। ভাববে বুঝি তোমার বুদ্ধির প্রতি কটাক্ষ করছি। তোমার অজান্তে তুমি প্রভাবিত হয়েছ ও হচ্ছ। অবশ্য প্রভাব সব সময়ে চিরস্থায়ী হয় না। ভুল বিশ্বাস অনেক সময় বাস্তবের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ায় বাধা সৃষ্টি করে, তার জন্যে প্রয়োজন হয় ধ্যানধারণাগুলোকে নতুন করে যাচাই করার। ফলে পুরোনোকে পরিবর্জন করে নতুন ধারণা নতুন বিশ্বাস আমরা গ্রহণ করি। মনস্তাত্বিকরা জাগ্রত অবস্থাতেও অভিভাবনের প্রভাবকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ডুবয় বলেছেন—"Suggestibility exerts a particular influence on all our deeds, colours our sensations, serves as a source of constant illusions which is very difficult to protect oneself even with the greatest possible effort of the mind"।

এখন দেখা যাক কিভাবে দৈনন্দিন জীবনে আমরা অভিভাবিত হই।

তিরিশের জার্মানী। জার্মান জাতি হাজার সমস্যায় পীড়িত। নাৎসী নায়করা আভ্যন্তরীণ সমস্যার জন্য দায়ী করলেন ইহুদীদের। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে এই যুক্তিহীন সাজেশন মেনে নিলেন না। তাঁদের মধ্যে একজন দৈবক্রমে হিটলারের এক বক্তৃতাসভায় উপস্থিত। শ্রোতাদের ঔৎসুক্য যখন চরমে উঠেছে, তখন নাটকীয়ভাবে হিটলারের আবির্ভাব

ঘটল বক্তৃতামঞ্চে। তাঁর বিশিষ্ট ভঙ্গীতে হিটলার জাতীয় সমস্যা নিয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন। নানাভাবে একই কথা বার বার বলতে থাকলেন। একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি 'chronic monotonous rhythmic stimuli'-এর কাজ করল। মস্তিষ্কের অংশবিশেষে নিস্তেজনা নেমে এল। বিশেষ করে সেই অংশগুলো যেগুলো ব্যক্তিগত নিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট,—এখন প্যারা-ডক্সিক্যাল ফেজের প্রভাবাধীন। মস্তিষ্কের অন্য অংশ থেকে বিচ্যুত বা dissociated জ্ঞানবুদ্ধি, যুক্তিবিচার অন্তত সাময়িকভাবে অন্তর্হিত। এই সময়ে সাজেশন এল—জাতীয় নিরাপত্তার প্রতিবন্ধক ইহুদী তাড়াও। দৈবক্রমে এসে পড়ে জ্ঞানবৃদ্ধ অধ্যাপক ইহুদীবিদ্বেষের যুক্তিহীন সাজেশন মস্তিষ্কে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। শুধু জার্মানীতে নয়, এ ধরনের অভিভাবন বিশেষ অবস্থায় সব দেশেই ঘটেছে। '৪৬-এর দাঙ্গার সময় আমার এক বুদ্ধিমান উকিলবন্ধু এক সন্ধ্যায় আমার ভবানীপুরের বাসায় এসে উত্তেজিতভাবে বলতে লাগলেন, পার্কসার্কাসে ওরা যুবতী নারীর বক্ষদেশ ও শিশুর মাংস বেচছে। তিনি কিছুক্ষণ আগে এক বিশেষ রাজনৈতিক দলের পাণ্ডার কাছ থেকে এই অদ্ভুত সাজেশনটি নিয়ে এসেছেন। তাঁকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে গিয়ে লাভত' কিছুই হল না, উপরন্তু ঘটল বন্ধুবিচ্ছেদ। দাঙ্গার বিশেষ পরিস্থিতিতে ভয়ে দুর্ভাবনায় নিরাপত্তার চিন্তায় তাঁর মস্তিষ্কে আংশিক নিস্তেজনা ঘটেছিল। প্যারাডক্সিক্যাল দশায় ঐ পাণ্ডাটির কথা তাঁর মনে জোরালো অভিভাবনের কাজ করল। বিচারশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন আমার বুদ্ধিমান উকিলবন্ধু।

এই উগ্র উত্তেজনার পরিস্থিতির বিপরীত অবস্থাতেও অভিভাবন-প্রবণতা বাড়তে পারে। সিনেমা নাটকের একটা দৃশ্য কল্পনা করা যাক। শান্ত সন্ধ্যা। নির্জন নদীর ধারে মুখোমুখি বসে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। নদীর টানে ডিঙ্গী ভাসিয়ে ভাটিয়ালী ধরেছে মাঝি। আকাশে পাণ্ডুর চাঁদ। ঈষৎ বিষণ্ণ রোমান্টিক পরিবেশ। ছেলেটিকে সকলেই জানে প্রফেশনাল প্রেমিক হিসেবে। মেয়েটিও জানে। এর আগে ওর প্রেমনিবেদনে মেয়েটি সাড়া দ্যায় নি। যুক্তি বুদ্ধি অনুসারে কাজ করেছে। আজকের এই বিশেষ পরিবেশে ছেলেটির আবির্ভাব অবাঞ্ছিত। কিন্তু এই পরিবেশে ছেলেটির প্রেম-নিবেদনে মেয়েটি বাধা দিতে পারছে না। বাস্তবে এরকমটি ঘটবে না, এমন নয়। 'তোমাকে না পেলে মর্ফিয়া কিম্বা পটাসিয়াম সায়ানাইড'—এই ধরনের মামুলি ন্যাকামিও মেয়েটি খুব সম্ভব বিশ্বাস

করবে। মেয়েটির মস্তিষ্কের প্যারাডক্সিক্যাল দশার সুযোগ নিতে পারবে ছেলেটি। নাটক দেখতে গিয়ে আমরা এমন সব নাটকীয় ঘটনা নির্বিচারে মেনে নিয়ে থাকি, —যা অন্য সময় শুনলে হাসির উদ্রেক করবে। কারণ ঐ একই, নিস্তেজনা-প্রক্রিয়া বা প্যারাডক্সিক্যাল ফেজ। দৃশ্যপট, আলোক সম্পাত ইত্যাদি এই অবস্থা আনতে সাহায্য করে। অবশ্য অভিনয়ের আবেগধর্মিতার গুরুত্বও অনেকখানি কাজ করে।))

অতি-স্ববিরোধী অবস্থা বা আলট্রা-প্যারাডক্সিক্যাল ফেজের সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলে আজকের চিঠি শেষ করব। সঙ্গে সঙ্গে শেষ হবে সম্মোহন প্রসঙ্গের আদিকাণ্ড,—নিদ্রাপর্ব। তোমাদের পাশের বাড়ীর সেই ছেলেটিকে মনে আছে? ডাকনাম ভণ্ডুল—দুধ খেতে গেলেই যার বমি আসত; বিশেষ করে যদি তার মা সামনে থাকতেন বা খেতে বলতেন। তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে না যদি বলি যে, ওই ছেলে দুপুরে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আলমারী খুলে দুধ চুরি করে খেত! ওর মা মনে করতেন ঠাকুরের কাণ্ড। ব্যাপারটা কি হয়েছিল শুনবে? দিনে রাতে, জাগ্রত, ঘুমন্ত, সব সময় ছেলেকে দুধ খাওয়ার কথা বলতেন স্নেহময়ী জননী। দুধ না খেলে পুষ্টি হবে কি করে? বার বার ঐ একই কথা শুনতে শুনতে ছেলেটির মস্তিষ্কে দুধপান সম্পর্কে অতি-স্ববিরোধী অবস্থার বা ultra-paradoxical phase-এর সৃষ্টি হয়েছিল। দুধ খাওয়ার নির্দেশের পজিটিভ ষ্টিমুলাস্ নেগেটিভ রিফ্লেক্স নিয়ে আসত। শুধু লালা নয়, পাকাশয়ের জারক রসেরও ঘাটতি পড়ত। কাজেই দেখা দিত অনিচ্ছার ফলে বমনোদ্রেক। মা শেষ পর্যন্ত রেগে মেগে বলতেন—থাক, তোর খেতে হবে না, সবটা ভাইকে দেব। এই বলে দিবানিদ্রার আয়োজন করতেন। 'খেতে হবে না'—এই উদ্দীপক তখন খাবার প্রেরণা নিয়ে আসত। দুধ চুরি করত ভণ্ডুল। মা যশোদাও বোধহয় শ্রীমান ভণ্ডুলের মায়ের মতন অতি-স্নেহময়ী ছিলেন। গোপালের ননীচুরির মূলেও হয়ত ছিল এই ultra paradoxical phase।

উপসংহারে মনোবিদের উপদেশ,—(বলতে পারো সাজেশন)—(ভালবেসো, কিন্তু ভালোবাসার কথা বেশি বলো না প্রেমিককে। বেশি শুনতেও চেও না প্রেমের গুঞ্জন। অতি-স্ববিরোধী অবস্থার উদ্ভব হতে পারে।) কয়েক সপ্তাহ লণ্ডনের চিঠি আসা যে বন্ধ আছে—সে একরকম ভালোই হয়েছে।

এবার স্বপ্ন। ঘুমের পরেই স্বপ্ন। সবাই ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখবে অথবা যে স্বপ্ন দেখে তাকে যে রোজই দেখতে হবে, এরকম না ভাবলেও, ঘুম আর স্বপ্ন আদিম মানুষের মনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। দুটি শব্দের ক্রিয়াপদ সংস্কৃত ও রুশ ভাষায় নাকি একই। এ-থেকে এই ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক যে ঘুম আর স্বপ্নকে আগের দিনে এক করে দেখা হত। তোমাকে আগেই লিখেছি মান্ধাতার আমল থেকে মানুষ স্বপ্ন-ব্যাখ্যা খুঁজতে চেষ্টা করছে। এই স্বপ্ন-ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে যেমন অনেক অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কার গড়ে উঠেছে; তেমনি আবার অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার স্বপ্ন-ব্যাখ্যাকে প্রভাবিত করেছে। গাছপালা পাহাড়-পর্বত নদী-সমুদ্র স্বপ্নের মধ্যে জীবন্ত হয়ে ওঠে, পশু পাখীর সঙ্গে কথা কই, সাতসমুদ্র তেরনদী পার হয়ে দৈত্যপুরীতে গিয়ে সোনারকাঠি ছুঁইয়ে রাজকন্যার ঘুম ভাঙাই। রূপকথার মত ঘুমের মধ্যে পাহাড় ওড়ে, সাগর স্বেচ্ছায় তার গর্ভের মণিমাণিক্যের ভাণ্ডার খুলে দেয়, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী মানুষের ভাষায় রাজপুত্রের ভাবী বিপদের ইঙ্গিত জানিয়ে তাকে সাবধান করে দিয়ে থাকে। সব বস্তুতে প্রাণ আছে—এই সর্বপ্রাণবাদতত্ত্বের প্রভাবে এ ধরনের স্বপ্ন দেখি, আর এইসব স্বপ্ন সর্বপ্রাণবাদতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। আত্মা, পরমাত্মা, পরলোকের ধারণা স্বপ্ন থেকেই এসেছে বলে অনেকে মনে করেন। স্বপ্ন রহস্যে ভরা, আবার স্বপ্ন ভবিষ্যতের পথনির্দেশক—এই দুই ধরনের ধারণাই প্রাক্-বিজ্ঞানযুগে চালু ছিল। স্বপ্ন ঈশ্বরের অনুজ্ঞাবাহক ও অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী: এই ধারণা শুধু ব্যক্তিজীবন নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনকেও প্রভাবিত করেছে। স্বপ্নে 'ম্যায় ভুখা হুঁ'—শুনে লক্ষ্মণসেনের যুদ্ধায়োজন সুবিদিত ঐতিহাসিক ঘটনা। শোনা যায়, জাহাঙ্গীর নাকি স্বপ্নে মৃত পিতার আদেশমত এক বন্দী সভাসদকে মুক্তি দিয়েছিলেন। অজস্র কিংবদন্তী বাদ দিলেও এ-রকম ঐতিহাসিক ঘটনার দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

প্রাচীনকালে হিন্দুদের মধ্যে স্বপ্ন সম্বন্ধে প্রধানত দুরকমের মতবাদ প্রচলিত ছিল। এক মতবাদ অনুসারে জাগতিক অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ আত্মা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে নিজস্ব এক জগৎ গড়ে তোলে—ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা লেনদেনের জগৎ। আর এক মত অনুসারে, ঘুমন্ত দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করে আত্মাবিহঙ্গ নতুন অভিজ্ঞতার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে—স্বপ্ন সেই অভিজ্ঞতার ফল। সবদেশেই এই ধরনের মতবাদ

প্রচলিত আছে এই আদিম মানুষের দূরকল্পনা। এ ছাড়া প্রত্যেটি দেশের নিজস্ব সংস্কার-বিশ্বাস ও জীবনযাত্রার ধারার সঙ্গে যুক্ত আছে অনেক স্বপ্ন-ব্যাখ্যা। প্রসূতি যদি সাপের স্বপ্ন ছাখে, বিশ্বাস করা হয় সে পুত্রসন্তান লাভ করবে। পূর্ণকুম্ভ যেমন যাত্রাকালে শুভ, স্বপ্নেও তেমনি শুভ ইংগিতবহ—অর্থপ্রাপ্তির ইংগিত। রক্তগোলাপ নেহরুর বটনহোলে স্থান পাবার অনেক আগে থেকে রক্তক্ষরা প্রেমের প্রতীক হিসাবে পরিগণিত: স্বপ্নে কিন্তু অশুভ ইংগিতের প্রতীক। এ-সব আমাদের দেশের স্বপ্ন-সংস্কার বলা যেতে পারে।

এ-রকম আরও অনেক স্বপ্ন-সম্বন্ধীয় সংস্কারের উল্লেখ করা যেতে পারে। হাতী বা ঘোড়ার পিঠে চড়ার স্বপ্ন যদি দেখ (সে চিড়িয়াখানার হাতী বা দার্জিলিং-এর ঘোড়া হলেও) গ্রাম্যবিশ্বাস অনুযায়ী অর্থপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত; তেমনি অর্থলাভের সম্ভাবনা পাহাড়ে ওঠার স্বপ্ন দেখায়। স্বপ্নে নরমাংস গ্রহণের অর্থ জান? ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করলে কি হবে? তোমার ঠাকুমা এ-স্বপ্ন দেখলে বর্তে যেতেন। এর অর্থ তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ফলপ্রসূ হবে, লণ্ডনের ডাকে মোটা চিঠি আসবে। আবার ভাঙা দাঁতের স্বপ্ন দেখলে ঠাকুমা গুমরে থাকতেন কয়েকদিন, অর্থক্ষয় সুনিশ্চিত জেনে। আর যদি কোন রাতে মহিষারূঢ় হয়ে দক্ষিণ দিকে যাত্রার স্বপ্ন দেখতেন—তাহলে বাড়ীতে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ধুম পড়ে যেত। 'অবধারিত' মৃত্যুকে বাধা দেবার চেষ্টার কোনো ত্রুটি থাকতো না। এ-সব হল ছকে বাঁধা স্বপ্ন। এর বাইরে, মানে, হিং টিং ছট জাতীয় স্বপ্ন দেখলে জ্যোতিষ পুরোহিতের বরাত খুলে যেত। হবুচন্দ্রের স্বপ্ন ছিল রাজকীয়, স্বপ্নার্থ-নির্ণয়েও ছিল তাই রাজকীয় ধুমধাম। অতটা না হলেও, নিশ্চয়ই সরগরম হয়ে উঠতো তোমাদের পূজোর দালান। প্রাচীন পুঁথি থেকে উদ্ভট শ্লোক আউড়ে, ঘন ঘন শিখা আন্দোলিত করে জটিল স্বপ্নের দুরূহ অর্থ-নির্ণয়ে লেগে পড়তেন তর্কচঞ্চু, স্মৃতিরত্নের দল। নস্যকণিকায় ও তাম্রকূটধূম্রে পূজোর ঘরের বাতাস ভরে যেত। বিশ্বাস হচ্ছে না? ঠোঁট বেঁকিয়ে ভুরু নাচিয়ে হাসবার আগে তোমার মাকে না হয় জিজ্ঞাসা করে দেখ।

প্রাচীন গ্রীসে অনেকদিন আগে থেকেই, ভাববাদী বস্তুবাদী দু'দল দার্শনিকই স্বপ্ন নিয়ে ঔৎসুক্য দেখিয়ে আসছেন। স্বভাবতই ভাববাদীদের উৎসাহে আতিশয্য ছিল। সক্রেটিস বলতেন, স্বপ্নের মাধ্যমে ঈশ্বর ভবিষ্যতের নির্দেশ পাঠান, স্বপ্ন দৈববাণীরই সামিল। প্লেটো মনে করতেন, স্বপ্নের মাধ্যমে ঘটে

আত্মার রহস্য উন্মোচন : শাশ্বত সনাতন সত্যের পরম অভিব্যক্তি। আবার সে-যুগের বস্তুবাদী দার্শনিক ডেমোক্রিটাসের মতে স্বপ্ন মস্তিষ্কের স্বয়ংক্রিয় কর্মতৎপরতার অভিব্যক্তি। ঘুমের মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলো নিষ্ক্রিয় থাকার দরুণ মস্তিষ্কের উপলব্ধি-ক্রিয়া বন্ধ থাকে, স্বয়ংক্রিয় কর্মতৎপরতার তাই ঘটে বন্ধনহীন আধিক্য। হিপোক্রেটিসও মনে করতেন স্বপ্ন মস্তিষ্কের ক্রিয়া। এ্যারিস্টটল তো স্বপ্ন নিয়ে একখণ্ড বই-ই লিখে গেছেন। তাঁর মতে স্বপ্ন মস্তিষ্কপ্রসূত এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শুভাশুভ কোনোরকম ইংগিতসূচক নয়। তিনি মনে করতেন—জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়-উপলব্ধি ও অনুভূতির প্রতিধ্বনি নিহিত থাকে স্বপ্নের মধ্যে। অনেক বস্তুবাদী দার্শনিক স্বপ্নতত্ত্ব নিয়ে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য সত্ত্বেও এ বিষয়ে তাঁরা একমত যে স্বপ্নের মধ্যে কোনো অলৌকিকত্ব নেই, অস্বাভাবিকত্ব নেই, স্বপ্ন স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক ঘটনা; এবং স্বপ্ন নিঃসন্দেহে মস্তিষ্কের বিশেষ ধরনের ক্রিয়াকলাপ। এঁদের অভিমত যদিও প্রগতিসূচক, তবুও বিজ্ঞান-অনুমোদিত তথ্যপ্রমাণাদির অভাবে অনেকাংশে অনুমানের পর্যায়ে পড়ে। অবশ্য এঁদের যুগে মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণার কোনো সুযোগ ছিল না, কাজেই তথ্য-প্রমাণের কথা ওঠেই না। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ওঁদের অনুমান বাস্তবঘেঁষা ও সাহসিকতার নিদর্শন। এঁদের কেউ কেউ স্বপ্ন দেখার ব্যাপারে বহির্জাত ও অন্তর্জাত উদ্দীপকের কথা তুলে সত্যের অনেকখানি কাছাকাছি পৌঁছেছেন, কিন্তু পাভলভের আগে পর্যন্ত কোনো বস্তুবাদী বিজ্ঞানীই স্বপ্নের রহস্য ভেদ করে স্বপ্নসৃষ্টির সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি।

স্বপ্ন দেখা নির্ভর করে ঘুমের গভীরতার তারতম্যের উপর। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন মানুষ যে আদৌ স্বপ্ন দেখে না, এমন নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্বপ্ন আমরা ভুলে যাই। দিনের বেলাকার তুচ্ছ কোনো ঘটনা থেকে স্বপ্নবৃত্তান্ত মনে পড়ে যেতে পারে। আবার কতকগুলো স্বপ্ন মনে এমন দাগ কেটে যায় যে, সারাজীবন আমরা মনে রাখি। বাস্তবের সঙ্গে আপাতসঙ্গতিহীন চিন্তা-কল্পনা ও রূপক স্বপ্নের বিশেষত্ব। জাগ্রত অবস্থার কল্পনা ও রূপকের বৈশিষ্ট্য স্বপ্নের মধ্যে থাকে না। যখন জেগে থাকি, তখন পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ সব কিছু উপভোগ করতে পারি। কিন্তু স্বপ্নে শুধু একটি ইন্দ্রিয়ের রূপকল্প জোরালো হয়ে ওঠে, সে ইন্দ্রিয়টি দর্শন-ইন্দ্রিয়; তাই স্বপ্ন প্রধানত দৃশ্যময়।

তা বলে স্বপ্নের মধ্যে আবেগ-অনুভূতি থাকে না, মনে করো না। তুমি ত' এক সময় ভয়ের স্বপ্ন দেখতে, স্বপ্নে আনন্দিত হতে, রেগে যেতে। তোমার মত দুঃস্বপ্ন দেখে ভয়ে ঘেমে ওঠে অনেকেই। স্বপ্নে হর্ষ-বিষাদ-আতঙ্ক আছেই। তা ছাড়া লোভ, ঘৃণা, হিংসা ইত্যাদি রিপুও বেশ জোরালো হয়ে উঠতে পারে। মজা এই, জাগ্রত অবস্থায় যে পরিবেশ, যে ধরনের আবেগ অনুভূতিতে আমরা অভ্যস্ত, স্বপ্নে সেই পরিবেশে সেই ধরনের আবেগ অনুভূতি নাও হতে পারে। ধর, স্বপ্ন দেখলে মনুমেণ্টের তলায় একা বসে আছ। এক সিংহ, মেট্রো সিনেমা থেকে স্বপ্নে বেরিয়ে এসে, তোমার কাছে বসে হাই তুলে বাজার দর নিয়ে আলোচনা শুরু করল। তুমি দিব্যি জমে গেলে। তোমার ফেভারিট কুচো চিংড়ি বাজার থেকে লোপাট হয়ে যাবার জন্য সিংহমশায় সহানুভূতি জানাতে তুমি খুশী হয়ে মশলার কৌটো থেকে মশলা বের করে তাকে খেতে দিলে। অথবা এমন স্বপ্ন দেখতে পারো, ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি বন্ধ, অথচ তোমাকে আউটরাম ঘাটের সেই রেস্তোরাঁতে যেতেই হবে। বন্ধুকে কথা দিয়েছ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি করা যায় ভাবছ। এমন সময় খড়্গ উঁচু করে এক আসামের গণ্ডার এসে তোমাকে তার পিঠে করে লিফ্‌ট্ দিতে চাইল। 'থ্যাঙ্ক' বলে তার পিঠে চড়ে বসলে। শৃঙ্গী-দন্তী থেকে শত হস্ত দূরে থাকার নীতিবাক্য মানবার দরকারই নেই তোমার। 'ভয়' নামক স্বাভাবিক ইমোশনটি আদৌ প্রকাশ পেল না। আবার ঐ অতি-পরিচিত বন্ধুটিকে আউটরাম ঘাটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তুমি হয়ত ভয় পেয়ে ছুটতে আরম্ভ করলে। থামলে এসে একেবারে এসপ্ল্যানেডে। স্বপ্নে এরকম 'এ্যাবসার্ড' নাটকের অভিনয় হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়। কত উদোর পিণ্ডি যে বুধোর ঘাড়ে পড়ে তার আর ইয়ত্তা নেই।

কেউ কেউ স্বপ্নের মধ্যে কথা কয়, হাসে, কাঁদে, রীতিমত অভিনয়ও করে অনেকে। স্বপ্নের মধ্যে জটিল গাণিতিক সমস্যার মীমাংসা করে অনেকে আনন্দে লাফিয়ে উঠেছেন। শোনা যায় অনেক কবি স্বপ্নের মধ্যে কাব্য রচনা করেন। শুনতে পাই, রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গল্প-কবিতার অনুপ্রেরণা নাকি স্বপ্নদত্ত। কোলরিজ ত' গোটা একটা কবিতা লিখে ফেলেছিলেন স্বপ্নের মধ্যে। "কুবলা খাঁ—" তাই না ?

দিবা-স্বপ্নে আমরা সবাই কমবেশি অভ্যস্ত। অলস মধ্যাহ্নে বল্গা ছাড়া মনোরথে চেপে মাঝে মাঝে কল্পনার রাজ্যে উধাও হতে কে না চায় ? তুমি

বলবে 'আমি চাই না'। আমার ভুল হয়েছে। 'মনোরথ' সেকেলে ও অতিব্যবহৃত শব্দ। লেখা উচিত ছিল 'রকেট' কিম্বা পাইলটহীন জেট প্লেন। তাহলেই তোমার কল্পনা-নদীতে বান ডাকতো। জেগে স্বপ্ন দেখতে।···ক্রয়ডন এয়ারপোর্টে নেমেছ। গুঁড়ি গুঁড়ি তুষার পড়ছে। ওকে কেব্‌ল করে যাওনি। শুধু বান্ধবী ইলাকে জানিয়েছিলে তোমার হঠাৎ লণ্ডন যাত্রার মতলব। তুমি জানতে পাশের ফ্ল্যাটেই ও থাকে, কাজেই জানতে পারবেই। এই ভোর রাতে আরামের ঘুম ছেড়ে ও আসবে কি এয়ারপোর্টে? এই তোমার চিন্তা। ও যদি না আসে!—না, নিশ্চয়ই আসবে। ওর প্রেমের পরীক্ষা নেবার জন্য যেন তোমার এই আকস্মিক লণ্ডন-অভিযান। স্যুটকেসের ভারে ঈষৎ হেলে যাত্রীদের সঙ্গে তুমি কাষ্টম্‌স্ অফিসের দিকে চলেছ। তোমার দৃষ্টি রেলিং-এর ওপাশের ছোট জমায়েতটির ওপর। কোথায় ও? চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে, এমনি সময়ে দেখলে লম্বা সুঠাম পরিচিত মূর্তিটি এগিয়ে আসছে, হ্যাট-কোট-ছত্র শোভিত হয়ে। দেখতে না পাওয়ার ভান করে তুমি এগিয়ে চললে। পুরো দুসপ্তাহ চিঠি লেখেনি। তুমি কথা বলবে না—কিছুতেই কথা বলবে না।

ঠিক এরকমটি না হলেও, কাছাকাছি ধরনের দিবা-স্বপ্ন নিশ্চয়ই তুমি দেখে থাক। কাব্য থাক। এবার কাজের কথায় আসা যাক। ঘুমের স্বপ্ন আর দিবা-স্বপ্নের মধ্যে তফাতটা এবার বুঝতে চেষ্টা কর। তুমি বলবে, এ ত' সোজা। দিবা-স্বপ্নে সঙ্গতি আছে, অনুবর্তিতা আছে, খুশীমত তাকে পরিচালনা করা যায়, পরিণতি তোমার ইচ্ছাধীন। না; ঠিক তা নয়। বিচারবুদ্ধি পরিচালিত চিন্তাধারা আর দিবাস্বপ্ন এক নয়! পুরোপুরি জেগে থেকে দিবাস্বপ্ন দেখা চলে না। মস্তিষ্কের কতকগুলো জায়গা নিস্তেজিত থাকে যদি, তবেই দিবা-স্বপ্ন দেখতে পাবে। চিন্তাধারা ও রূপকল্প দিবাস্বপ্নে পুরোপুরি আয়ত্তে থাকে না। অনুপ্রাণিত কবিতার লাইনের মত যেন আপনা থেকে বেরিয়ে আসে; আধুনিক কবিতার মত প্রচ্ছন্ন সূত্রসঙ্গতি থাকলেও, স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে আপাত-অসঙ্গতিটাই নজ'র পড়ে। কল্পনাবিলাসী মানুষ, যাদের মধ্যে প্রথম সাংকেতিক স্তরের প্রাধান্য, তারা ত' অনেক সময় দিবাস্বপ্নে একেবারে ডুবে যায়। নিজেদের হারিয়ে ফেলে। বাস্তব ও কল্পনার সীমারেখা তাদের প্রায় অবলুপ্ত হয়ে যায়।

দিবাস্বপ্নকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিলে কিন্তু ক্রমশ বাস্তববিমুখ হয়ে পড়বে।

পলায়নী-মনোবৃত্তি জেগে উঠবে। স্বপ্ন-দুর্গে কঠোর বাস্তবের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে আকাশ-কুসুম রচনা করে মালা গাঁথা বেশ আরামের। কিন্তু সে মালা গলায় পরতে রক্তমাংসের মানুষ কোনদিন এগিয়ে আসবে না। সব চাওয়া পাওয়ার পরিসমাপ্তি ঘটবে স্বপ্নের মধ্যে। এইভাবে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনেকে নিউরটিক হয়ে পড়ে। খুব সাবধান। দিবা-স্বপ্নের চরম পরিণতি অলীক বিশ্বাস (hallucination)—মানসিক রোগের লক্ষণ।

কথাটি যখন এসেই পড়লো, বিস্তারিতই করি। স্বপ্নে সম্ভব-অসম্ভব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। মৃত বন্ধুকে সিগ্রেট চাইতে দেখলে চমকে ওঠে না। শান্তি কংগ্রেসে হিটলারের মুখে বিশ্বশান্তির বক্তৃতা শুনে অবাক হয় না। হিরোসিমা থেকে হেলসিংকি যেতে স্বপ্নে মিনিট দুয়েক সময় লাগলে খুব বেশি লেগেছে মনে হতেও পারে। কোলকাতার রাস্তায় সার বেঁধে আফ্রিকার সিংহের দল স্লেজগাড়ী চালিয়ে চলেছে মোহনবাগানের মাঠে ছাগল আর ভেড়ার দলের ফুটবল ম্যাচ দেখতে—এ দৃশ্যও স্বপ্নের মধ্যে বিস্ময় জাগায় না। এই আন্-ক্রিটিক্যাল মনোভাব অলীক বিশ্বাসের বিশেষত্ব। তাই অনেক মনস্তাত্ত্বিকের মতে স্বপ্ন আর অলীক বিশ্বাস এক পর্যায়ে পড়ে, অবশ্য শারীরবৃত্তের দিক থেকে।

ভুল দেখা, ভুল শোনা মাত্রেই কিন্তু অলীক বিশ্বাস নয়। উপলব্ধি যখন ভাবাবেগে স্বপ্নের মত রঙিন, উজ্জ্বল ও জীবন্ত হয়ে ওঠে তখনই মাত্র সেটাকে অলীক বিশ্বাস অর্থাৎ hallucination বলা চলে। স্বপ্ন যেমন বাস্তবের প্রতিফলন নয়, অলীক বিশ্বাস তেমনি বাস্তবানুগ নয়। অলীক বিশ্বাসাক্রান্ত মানুষ এমন দৃশ্য দেখতে পায়, যার আদৌ কোন অস্তিত্ব নেই। এমন শব্দ বা কথা শোনে, যা উচ্চারিত হয়নি। এমন গন্ধ তার নাকে যায়—যার আধার বা বাহক কাছেপিঠে নেই। প্রত্যেকটি উপলব্ধি আবার অতিমাত্রায় জোরালো। উপলব্ধির প্রভাবে হর্ষ ভয় ইত্যাদি আবেগ সঞ্চারিত হয় তীব্রভাবে। অথচ উপলব্ধির কোনো প্রকরণ বহির্বাস্তবে নেই। আর সে-কথা হ্যালুসিনেশনের রোগীকে বোঝায় কার সাধ্যি। তার দৃঢ় বিশ্বাস তার স্বর্গত মা-ই তার নাম ধরে ডাকছেন: আমরা বধির তাই শুনতে পাচ্ছি না। তার সামনে দাঁড়িয়ে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বৈকুণ্ঠপতি মৃদু মৃদু হাস্য করছেন: আমরা মূঢ়জন তাই সেই দিব্যরূপ দর্শনে বঞ্চিত। নন্দনকাননের পারিজাতের সৌরভ তার নাকেই শুধু আসছে। অন্যের সে সৌভাগ্য হয়নি বলে

বড় জোর সে দুঃখিত হতে পারে ; কিন্তু তার দেখা বা শোনার কোনো গোলমাল হয়েছে, একথা সে কিছুতেই মানবে না।

কেন এবং কি করে এমন ঘটে জানতে চাও ? চাও আর না চাও, আমাকে বলতেই হবে। অনুভূতি-উপলব্ধি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা না জন্মালে তুমি পাভলভীয় স্বপ্ন-তত্ত্ব বুঝতে পারবে না।

* * * *

দেখা, শোনা ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়োপলব্ধির মূলে আছে উপলব্ধির উৎসের অস্তিত্ব। শব্দতরঙ্গই হোক আর আলোর তরঙ্গই হোক ; পরিবেশের কোনো মূর্ত বস্তু থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে ইন্দ্রিয়পথে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে মস্তিষ্ককোষকে উত্তেজিত করলে তবেই উপলব্ধি ঘটে। উৎস-বস্তুটি সব সময়েই দেশ-নির্দিষ্ট। দেশের (space) এক বিশেষ বিন্দুতে তার অবস্থান নির্ণয় আমরা করতে পারি। এরোপ্লেনের শব্দ শুনে বুঝতে পারা যায় মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়লেও এক নির্দিষ্ট পথ ধরে সেটি উড়ে যাচ্ছে। দর্শনেন্দ্রিয়ের উপলব্ধির বেলায় বস্তুটির অবস্থান আরও বেশি নির্দিষ্ট। চোখ আর উপলব্ধি-উৎসের মধ্যে কোনো আড়ালই থাকে না। তোমার মুখশ্রী অবলোকন মানে তোমার মুখাবয়বকে দৃষ্টিপথের মধ্যে পাওয়া। তোমাকে যখন দেখি, তোমার আয়ত চোখ, তোমার তিলফুল নাসা, তোমার আপেল-গণ্ড, তোমার রক্তিম অধর, সবই উজ্জ্বলভাবে আমার মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হয়। তোমার কণ্ঠস্বর যখন শুনি, স্বরগ্রামের ওঠানামা, রুক্ষতা, মিষ্টতা সবই মস্তিষ্ককোষের উত্তেজনার তারতম্যে আমার কাছে ধরা পড়ে। বেশ স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে। আলোকতরঙ্গ বা শব্দতরঙ্গ উৎস থেকে বেরিয়ে দর্শনেন্দ্রিয়ের বা শ্রবণেন্দ্রিয়ের বাইরের প্রান্ত-উপাঙ্গ ('end organs' বোঝাতে এর থেকে ভাল শব্দ পেলাম না !) দ্বারা বিশ্লেষিত হয়ে অন্তর্বাহী নার্ভ-মারফত মস্তিষ্কে পৌঁছয়। সব ইন্দ্রিয়ের নার্ভগুলোই মস্তিষ্কের এক একটা বিশেষ জায়গায় গিয়ে শেষ হয়। উত্তেজনা স্নায়ুমাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে সংশ্লিষ্ট মস্তিষ্ক-কোষগুলোকে আলোড়িত করে। এখানে মস্তিষ্ককোষ মানে উচ্চ-মস্তিষ্কবল্কলের (cerebral cortex) কোষ। ইন্দ্রিয়ের এ প্রান্তেরও আছে বিশ্লেষণক্ষমতা। শেষ বিশ্লেষণ এই সব কোষেরই কাজ। সূক্ষ্মজালতন্তুর (reticular formation) কথা এখন তুলছি না। একটু সরলীকরণ করছি। বহির্বাস্তবের সব উদ্দীপনাই

দু'দুবার বিশ্লেষিত হয়, একবার ইন্দ্রিয়গুলোর বাইরের গেটে আর একবার ভেতরের গেটে। মস্তিষ্ক-বল্কলের কোমল কোষগুলো যেন কোম্পানীর বড় সাহেব। বড় বড় ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত। যা তা খবর দিয়ে তাঁকে বিরক্ত করা চলবে না। তাই এত কড়াকড়ি। গেটে গেটে পাহারা। মস্তিষ্ক বল্কলের কোষের উত্তেজনা থেকে ঘটে উপলব্ধি। উপলব্ধি থেকে ধারণা বা কল্পনা,—যাকে ইংরাজীতে বলা হয় concept।

ধারণা বা কল্পনার জন্য বস্তুর উপস্থিতি নিষ্প্রয়োজন। তোমাকে না দেখেও তোমার মুখশ্রী কল্পনা করতে পারি। তবে তোমাকে দেখা এক জিনিস আর তোমার মুখশ্রী কল্পনা করা আর এক জিনিস। দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মেটানো। দেখার তৃপ্তি কল্পনাতে নেই। কেননা কল্পনার প্রতিবিম্ব প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মত উজ্জ্বল হতে পারে না। কল্পনাছায়ার মধ্যে তোমার মুখাবয়বের প্রতিটি সূক্ষ্ম [illegible] রূপায়িত হবে না। কল্পনা উপলব্ধির তুলনায় অনেকখানি নিষ্প্রভ, খানিকটা বিমূর্ত। একটা আপেল বা আম কল্পনা করতে গেলে যেমন আপেল বা আমের সাধারণ একটা রূপ মনে আসবে—নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকবে না, তোমার মুখশ্রী কল্পনা করতে গেলে তেমনি সুন্দরী তরুণীর সামান্যীকৃত এক রূপরেখার মধ্যে তোমার মুখের বিশিষ্ট সূক্ষ্মরেখার হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে। কল্পনা বা ধারণায় বহির্বাস্তবের কোনো স্থান নেই। কোনো নির্দিষ্ট অবস্থানবিন্দু নেই কল্পনা-উৎসের। তার মানে দেশ-সাপেক্ষ নয় কল্পনা। সুস্থ মানুষ আম বা আপেলের কল্পনা করলেও, কখনও মনে করে না কল্পনার আমটি বা আপেলটি হাতের কাছে এসে যাবে বা তা থেকে রসনার তৃপ্তি হবে। কল্পনা দেশ-সাপেক্ষ না হলেও খানিকটা কাল-সাপেক্ষ কিন্তু। অনেক দিন আগে দেখা দৃশ্য বা বস্তু-কল্পনা ক্রমশ বেশি বিমূর্ত, বেশি নিষ্প্রভ হয়ে আসে। প্রিয়তমের মুখচ্ছবিও কালের ব্যবধানে অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। সুবিধা এই, খেয়ালখুশীমত অশ্ব-মনোরথের বল্গা ছেড়ে কল্পনা করা চলে। 'মনসা-মথুরায়' সব সময় যাওয়া চলে, মথুরায় যাওয়া চলুক আর না চলুক। উপোষী মানুষ বিরাট ভোজের কল্পনা করতে পারে; পেট ভরুক আর না ভরুক। এই ধারণা বা কল্পনার উৎসটা কোথায়? এইত' তোমার প্রশ্ন। উপলব্ধির উৎস পরিবেশে, আর কল্পনার উৎস মনোদেশে। ইন্দ্রিয়ের বিশ্লেষণী স্নায়ুউত্তেজনা উপলব্ধির জন্মদাতা। উপলব্ধির পরও কিন্তু মস্তিষ্ক-প্রান্তের বিশ্লেষণী কোষে এই উত্তেজনার চিহ্ন বজায় থেকে

যায়। সবটা মুছে যায় না—জের থাকে। অবশ্য প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ঔজ্জ্বল্য ও তীব্রতা তখন আর থাকে না। উপলব্ধি-জনিত উত্তেজিত নার্ভকোষগুলোই কল্পনার উৎস। অনুষঙ্গের প্রভাবে, নানাভাবে ঐ উত্তেজনার পুনরাবির্ভাব ঘটতে পারে। বহির্বাস্তব উপলব্ধির স্তর থেকে এখন কল্পনা বা ধারণার স্তরে পৌঁছেছে। 'পারসেপ্‌শন' 'কনসেপ্ট্‌'-এর জন্ম দিয়েছে।

এই হল কল্পনার শারীরবৃত্ত। এখন অলীক কল্পনা বা হ্যালুসিনেশনের ব্যাখ্যা অনেকটা সহজ হবে। মস্তিষ্কের সেই বিশেষ অবস্থার কথা ভোলনি নিশ্চয়ই—যে অবস্থায় দুর্বল উদ্দীপক প্রবল উত্তেজনা জাগায়। যাকে বলা হয় প্যারাডক্সিক্যাল ফেজ। এই আপাত-বিরোধী অবস্থার আবির্ভাবে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে? কল্পনার উৎস, মৃদু-উত্তেজনার কেন্দ্রগুলো তীব্রভাবে আলোড়িত হবে। কল্পনা আর কল্পনা থাকবে না—সেখানে উপলব্ধির স্পষ্টতা আর তীব্রতা দেখা দেবে। যার মস্তিষ্কে এই রকমটি ঘটবে সে স্বভাবতই মনে করবে—উপলব্ধির 'বিষয়টি' (subject) রয়েছে তার বাইরের পরিবেশে; একটি নির্দিষ্ট অবস্থান-বিন্দুতে। আমরা তাকে বলব কিন্তু অলীক-কল্পনার রোগী! এদের মস্তিষ্কে আরও একটি অসুস্থ প্রক্রিয়া ঘটেছে। উপলব্ধির উত্তেজনা-বিন্দুগুলো স্বাভাবিকভাবে আর নিস্তেজিত হচ্ছে না। উত্তেজনাকে প্রতিহত করার শক্তি হারিয়ে গেছে। অবশ্য সব জায়গায় নয়, মস্তিষ্কের কোনো কোনো অংশে। উত্তেজনা-বিন্দুগুলো অনড় (inert) হয়ে থাকার দরুন মিথ্যা উপলব্ধির সংকেত জাগছে। মস্তিষ্কের স্থানবিশেষে বিকৃত বাস্তব প্রতিফলিত হচ্ছে। ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা কর। না হলে অলীক-কল্পনা রহস্যাবৃতই থেকে যাবে। মস্তিষ্কে এসেছে সামগ্রিক নিস্তেজনার একটা পর্ব (প্যারাডক্সিক্যাল পর্ব), আবার বিশেষ কতকগুলো বিন্দুতে ঘটেছে নিস্তেজনার স্বল্পতা। গোলমেলে লাগছে? একটু ভেবে দেখলে আর লাগবে না। ব্যাপারটা মোটেই অসম্ভব নয়। ঘুমিয়ে যখন স্বপ্ন দেখছ তখন ঠিক এই বৈপরীত্যের ব্যাপারই ঘটছে। সারা মস্তিষ্কে চলেছে নিস্তেজনার শেষ পর্ব, আবার কতকগুলো বিন্দু উত্তেজিত বা অ-নিস্তেজিত। তারা যেন বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে বসেছে। তাদের ক্রিয়াকলাপ থেকেই স্বপ্নের উদ্ভব। এবার বুঝলে ত'!

দু-ক্ষেত্রেই কোষগুলোতে মৃদু উত্তেজনা, কিন্তু 'প্যারাডক্সিক্যাল' পর্বের জন্য প্রতিবিম্ব উপলব্ধির মত উজ্জ্বল আর বর্ণাঢ্য!

অলীক-কল্পনা আর স্বপ্ন অনেকটা একই রকমের মনে হচ্ছে না কি? তফাতটা এই, জাগ্রত অবস্থায় (আপেক্ষিক অর্থে) অলীক কল্পনার উৎপত্তি আর ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের আবির্ভাব। স্বপ্ন দেখছে যে, তার অন্য কোনো অনুভূতি বা উপলব্ধি থাকে না। অলীক কল্পনাবিলাসীর মস্তিষ্কে প্রায়ই বাস্তব-অবাস্তবের, স্বাভাবিকতা-অস্বাভাবিকতার তীব্র বিরোধ চলে, তাই এই সংঘর্ষে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর স্বপ্ন দেখে সুস্থ অসুস্থ সব মানুষ।

একটু আগেই একটা কথা লিখেছি যার উপর কিছু টিকাটিপ্পনী না কাটলে সত্যের অপলাপ করা হবে। সহজ করে বোঝানোর জন্য অনেক সময় আমি জটিলতা পরিহার করেছি; তা বলে বিজ্ঞানকে সহজবোধ্য বা পপুলার করার নামে বিকৃত করার ইচ্ছে আমার নেই। তাই কথাটা তুলতে হল। কল্পনার উৎস পরিবেশে নয়, মনোদেশে—আমার এই উক্তি থেকে ভ্রমাত্মক ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। অলীক-কল্পনা বা স্বপ্নের কারণ মস্তিষ্কের এক বিশেষ অবস্থা হলেও একথা মনে করা ঠিক হবে না যে স্বপ্ন বা অলীক-কল্পনা সব সময় পুরোপুরি অবাস্তব। তা হলেই আমরা ভাববাদীদের খপ্পরে পড়ে যাব। প্রায় সময়েই সংকেত বা উদ্দীপনার অস্তিত্ব কোথাও না কোথাও থাকে; কিন্তু মস্তিষ্কের বিশেষ অবস্থার দরুণ সেটা সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় না, এই মাত্র। এই উদ্দীপনা বহির্জাতও হতে পারে, আবার অন্তর্জাতও হতে পারে। অর্থাৎ বাইরের পরিবেশ থেকেও আসতে পারে, আবার দেহের মধ্যেকার যন্ত্রাংশ থেকেও উঠতে পারে উদ্দীপনার ঢেউ। অলীক-কল্পনা বা হ্যালুসিনেশনের রোগীর সঙ্গে চিকিৎসক মাত্রেই পরিচিত। আর স্বপ্ন নিয়ে সাম্প্রতিককালে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। তা থেকে ভালভাবেই বোঝা গেছে যে স্বপ্নেরই হোক আর অলীক-কল্পনারই হোক—কোন না কোন রকমের উদ্দীপনার উৎস অনেক ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। উৎসটি কোন সময় সহজেই ধরা পড়ে, সময় সময় আবার উৎস খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন। গোলমালটা প্রধানত প্রতিফলনের। বিশেষ অবস্থার জন্য মস্তিষ্কের সামগ্রিক কার্যকলাপ বিঘ্নিত, এই প্রতিফলন বিকৃত ও অতিরঞ্জিত।

অন্তত একটা রোগীর অলীক-কল্পনার উৎসের সন্ধান যদি তোমাকে দিতে পারি, মনে হয় ব্যাপারটা তোমার কাছে পরিষ্কার হবে। বর্ধমান জেলার ছোট এক শহর থেকে এসেছিলেন ভদ্রমহিলা। শ্রবণেন্দ্রিয়ের হ্যালুসিনেশনে

ভুগছেন। বাড়ীর পাশের বাস-স্ট্যাণ্ডে যতক্ষণ বাস যাতায়াত করত তিনি শুনতেন যেন বাসের ড্রাইভার কণ্ডাক্টররা অশ্লীল ভাষায় তাঁকে গালাগালি করছে। রাত্রে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে গালাগালি তাঁর কানে আসতো না। এখানে বাসের শব্দ ছিল অলীক-কল্পনার উৎস। কিছুদিন পরে বাস-স্ট্যাণ্ড ওখান থেকে উঠে গেলে, তিনি আর বাস-চালক কণ্ডাক্টরদের গালাগালি শুনতে পেতেন না। এই স্ট্যাণ্ড ওঠানোর ব্যাপারে তাঁর স্বামীর হাত ছিল, তিনি জানতেন। এর জন্যে বর্ধমান কোর্টে মামলা-মোকদ্দমা চলছে তিনি শুনলেন। তাঁর হ্যালুসিনেশন তখন অন্য রূপ নিল। এক অচেনা পুরুষ কণ্ঠস্বর, প্রধানত দুপুরে, তিনি শুনতে লাগলেন। এবার স্বামীকে শাসাচ্ছে। মামলায় তাদের হার হয়েছে, তাই স্বামীকে খুন করে মাটিতে পুঁতে ফেলা হবে। দুপুরে যেদিন স্বামী বাড়ী থাকতেন, অর্থাৎ ছুটির দিন, ভদ্রমহিলা কণ্ঠস্বর শুনতেন না। স্বামী বাড়ীতে থাকার দরুন তাঁর অমঙ্গল-চিন্তা মনে আসত না—এটুকু বেশ বোঝা গেল। কিন্তু হ্যালুসিনেশনের উৎস এক্ষেত্রে কোথায়? আবার, স্বামীর সঙ্গে ট্রেনে করে যখন কোলকাতায় আসতেন, তখন সারা রাস্তা তিনি ঐ কণ্ঠস্বর শুনতে পেতেন। কোলকাতায় আসার পর কিন্তু কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে যেত। কেন? কোলকাতা নিরাপদ, বিশেষত এখানে স্বামীর বন্ধুবান্ধব অনেক আছে, তাঁর চিকিৎসক আছে—এই সব হয়ত কারণ। বিশদ আলোচনার দরকার নেই। শুনে রাখ, এখানে উৎস ছিল বিকৃত-কণ্ঠের এক ভিখারী গায়ক। রোজ দুপুরে তার সঙ্গীতচর্চা ভদ্রমহিলার মনে ভীতি সঞ্চার করত আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ অলীক কল্পনা জাগত। স্বামীর ভয়ে ছুটির দিনে পারতপক্ষে ভিখারীটি তাদের বাড়ীর পথ মাড়াতো না। ট্রেনের মধ্যেও ঘটতো সঙ্গীত-পারদর্শী অন্য সব ভিক্ষুকের আবির্ভাব। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি শুনতেন বর্ধমান কোর্টের নকীবের কর্কশ কণ্ঠস্বর। স্বামীকে ভয় দেখাচ্ছে। স্বামী ভয় পেতেন না বটে, তিনি কিন্তু ভয়ে উত্তেজিত হয়ে অদ্ভুত ব্যবহার করতেন। এরকম আরো দু'একটা কেস শোনাতে পারি—কিন্তু তাতে স্বপ্ন-ব্যাখ্যায় পৌঁছুতে অনর্থক আমাদের দেরী হয়ে যাবে। তোমার পক্ষে ধৈর্যধারণও কঠিন হবে। তা ছাড়া আমার তথ্যপ্রমাণের বিপরীত তথ্য ও মত তোমার পরিচিত বন্ধুবান্ধব হাজির করবেন। তুমি পড়ে যাবে মুস্কিলে। কাজেই এ বিষয়ে এখানেই ইতি। শুধু এইটুকু জানিয়ে রাখি যে, অলীক-কল্পনার উৎস-সন্ধান সকল সময়ই সহজসাধ্য নয়, কোনো কোনো

সময়ে দুঃসাধ্যও বটে। বিশেষ করে যখন অন্তিরযন্ত্র থেকে উদ্দীপনার উদ্ভব হয়। তাই এ-নিয়ে অনেক অলীক তত্ত্বের প্রচার এত সহজ হয়েছে।

স্বপ্নেরই হোক আর অলীক কল্পনার ক্ষেত্রেই হোক, স্মৃতিতে সংরক্ষিত ধ্যানধারণার সঙ্গে সুদূর সম্পর্কিত অনুষঙ্গ অনেক সময় উদ্দীপকের কাজ করে বলে উৎস-উদ্দীপকের মূল খুঁজে পাওয়া এত কঠিন। স্বপ্ন উৎস প্রসঙ্গে এবার যে আলোচনার অবতারণা হবে, তার ভেতর দিয়ে আমার বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে আশা করি।

স্বপ্নের পর্যালোচনায় আমাদের নির্ভর করতে হয় তোমার মত স্বপ্ন যে দেখছে তার স্মৃতির উপর। স্বপ্ন দেখার পর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্বপ্নটিকে আবার ভুলে যাও; অন্তত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মনে করতে পার না। সকলেরই ঐ অবস্থা। অবশ্যি ঘুমের মধ্যে তোমার ব্যবহার থেকেও আমি স্বপ্নের প্রকৃতি খানিকটা অনুমান করতে পারি। ধর, ঘুমের মধ্যে তোমার মুখে মিষ্টি হাসি ফুটে উঠেছে, রক্তিমাভ হয়ে উঠেছে গালদুটি। ঘুম ভাঙিয়ে জিজ্ঞাসা করলে তুমি বলবে, স্বপ্নে তুমি লণ্ডনে হাজির হয়েছ। কিম্বা লণ্ডনবাসী বন্ধুটি এসে গেছে ভারতের এক শৈলাবাসে। আর সেই সব কথা তার মুখে শুনছ,—যা শুনতে সব মেয়েই ভালবাসে। তুমি হয়ত তোমার ভাইপো বাচ্চুর মত কেঁদে উঠবে না স্বপ্ন দেখে; কিন্তু নাসিকা ও ওষ্ঠের কুঞ্চন দেখলে বোঝা যাবে তুমি স্বপ্নে ব্যথা পেয়েছো। অঙ্কের দিদি হয়ত তোমার মাথার মধ্যে গোবর পোরা মনে করেছেন, অথবা ভূগোলের দিদি তোমাকে ভারবাহী কোন চতুষ্পদ জন্তু বলে অভিহিত করেছেন। স্বপ্নের মধ্যে কয়েক বছর পেছিয়ে কৈশোরের দিনগুলিতে ফিরে গেছ। অথবা ঘরে চোর ঢুকেছে। তোমার শাড়ীগুলোই বেছে বেছে নিয়ে যাচ্ছে। দরজার ওপারেই রামকিষেণ। চেঁচিয়ে তাকে ডাকবার চেষ্টা করছ, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না। বুকের উপর পাষাণ ভার, গা দিয়ে গলগল করে ঘাম ছুটছে। তোমার অস্ফুট গোঙানি আর ছটফটানির শব্দ শুনে মার ঘুম ভেঙেছে। তিনি ধাক্কাধাক্কি করতে তুমি উঠে বসলে। ওঃ স্বপ্ন! বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পুরো এক গেলাস জলই ঢক ঢক করে পান করলে। একে বলে বিকট স্বপ্ন বা নাইটমেয়ার। তোমার ব্যবহারে স্বপ্নের প্রকৃতি ধরা পড়েছে।

কিন্তু সব সময় এভাবে স্বপ্ন নিয়ে গবেষণা সম্ভব নয়। তাই আধুনিক গবেষকেরা স্বপ্ন তৈরী করিয়ে তার উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। একটু

পরেই এ প্রসঙ্গে আসব। তার আগে বলে রাখি ঘুমের গভীরতার সঙ্গে স্বপ্ন দেখা না দেখা নির্ভর করে। আগেই বলেছি বোধ হয়, ঘুম যত গভীর স্বপ্ন তত কম। অগভীর ঘুমের মধ্যেই স্বপ্নের জন্ম। গভীর ঘুম মানে মস্তিষ্কের সর্বস্তরে নিস্তেজনা, গুরু ও লঘু মস্তিষ্কের সর্বাত্মক নিষ্ক্রিয়তা। মননক্রিয়া, পাভলভের মতে, মস্তিষ্কের উপর বহির্জগতের বা আন্তরযন্ত্রের উদ্দীপনার প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই নয়। মস্তিষ্ক পুরোপুরি ঘুমিয়ে থাকলে মননক্রিয়ার অস্তিত্ব সম্ভব নয়। স্বপ্ন নিঃসন্দেহে মননক্রিয়া; কাজেই স্বপ্ন দেখাও সম্ভব নয়। কতকগুলো জায়গা যখন জেগে থাকে, বা অ-নিস্তেজিত অবস্থায় থাকে, তখনই মাত্র মানুষ স্বপ্ন দেখে। এই সোজা কথাটা বারবার আমি বলছি কেন? কারণ আছে। কিছু দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিকের মতে স্বপ্ন আত্মার ক্রিয়াশীলতার পরিচয়। ঘুম যত গভীর, আত্মা তত সক্রিয়। নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আত্মার গতি ও ধর্ম। স্বপ্নকে নির্জ্ঞান মনের প্রক্রিয়া যাঁরা মনে করেন, তাঁরাও সময় সময় এই ধরনের কথা বলে থাকেন।

এইবার আসছি ফ্রয়েডীয় স্বপ্নব্যাখ্যায়।

ফ্রয়েড স্বপ্নের গবাক্ষপথে মনের অন্দরমহলে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেছেন আর পাভলভ লালাগ্রন্থির সংকীর্ণ পথে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের হদিস পেতে চেয়েছেন—এ সংক্ষিপ্ত সমাচার তোমাকে আগেই জানানো হয়েছে। আজকের চিঠিতে ফ্রয়েডিয় স্বপ্নব্যাখ্যা ঈষৎ বিস্তারিতভাবে পেশ করবো। সঙ্গে সঙ্গে ইয়ুং-এর (Jung) প্রসঙ্গও এসে পড়বে। তাঁর 'archetype' বা আদিরূপের কল্পনা শিল্পসাহিত্যকে বেশ প্রভাবিত করেছে। কাজেই আলোচনা খুব নীরস লাগবে না।

মননক্রিয়া চোখে ধরা পড়ে না। সম্মোহিত অবস্থায় মানুষ এমন অনেক কথা, ঘটনা বা ইচ্ছা মনে আনতে পারে, যেগুলো হাজার চেষ্টা করেও সজাগ অবস্থায় মনে আনা যায় না। এ ছাড়া বিস্মৃতির গহ্বর থেকে জাগ্রত অবস্থায় এইসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে আনার পথে একটা বাধা, একটা বিরোধিতা সব সময়ে কাজ করে। এইসব থেকে ১৮৯৫ সালেই ফ্রয়েডের ধারণা হয়েছিল মনের গভীরে একটা গোপন স্তর আছে যার কার্যকলাপ সম্পর্কে আমরা অবহিত নই,

এবং সাধারণ অবস্থায় জিজ্ঞাসাবাদের পদ্ধতিতে মনের সেই গোপন স্তরের খবর পাওয়া যায় না। এই স্তরের নাম দিলেন তিনি—নির্জ্ঞান (The unconscious)। এই 'নির্জ্ঞান মন'-এর গোপনপুরীতে প্রবেশের পথ হিসাবে স্বপ্নকে আশ্রয় করলেন ফ্রয়েড। স্বপ্ন একদিকে মননক্রিয়া, আবার অন্যদিকে ঘুমের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে চেতনার রাজ্যে এর স্থান হতে পারে না। কাজেই, স্বপ্নের সঠিক বিশ্লেষণ নির্জ্ঞান মনের কার্যকলাপের সন্ধান দিতে পারে—এ বিষয়ে ফ্রয়েড একেবারে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছুলেন। তাঁর কথাতেই বলি—"By means of dream interpretation we are able to glance as through an inspection-hole into the interior of this (unconscious) apparatus". স্বপ্নের গুরুত্ব ফ্রয়েডীয়ানদের কাছে কতখানি, এই কথা থেকেই বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই। অবশ্য স্বপ্ন বিশ্লেষণ ছাড়াও নির্জ্ঞানকে জানবার আরও নানারকম পদ্ধতি ফ্রয়েডপন্থীদের আছে, একথা ঠিক। অবাধ-অনুষঙ্গ (free association), পাত্রান্তরণ (transference), নিউরোটিক রোগলক্ষণ ও প্রতিদিনকার ভুল ত্রুটি ইত্যাদির বিশ্লেষণ সাহায্যেও নির্জ্ঞান মনকে জানা যায়। মোট কথা এই যে, সংজ্ঞানের সতর্ক পাহারা এড়িয়ে নানারকম ছদ্মবেশে আঁকাবাঁকা গলিপথে নির্জ্ঞান নিজেকে প্রকাশ করতে সচেষ্ট। ফ্রয়েডের সব পদ্ধতিই সংজ্ঞানকে এড়িয়ে পরোক্ষভাবে নির্জ্ঞান মনের কামনা বাসনা, স্মৃতিধারণা ও আবেগ প্রক্ষোভকে জানবার চেষ্টা। পাভলভ ও ফ্রয়েড দুজনই মননক্রিয়ার স্বরূপ জানতে চেষ্টা করেছেন ফিশ্চুলার (fistula) সাহায্যে। একজন লালাগ্রন্থির ক্ষরণ থেকে উচ্চতর স্নায়ুক্রিয়ার নির্দেশ করেছেন, আর একজন স্বপ্ন-সমীক্ষার সাহায্যে নির্জ্ঞান মনের ক্রিয়াকাণ্ড অনুমান করেছেন। পাভলভ চৈতন্য ও যুক্তিবাদকে আশ্রয় করেছেন, আর ফ্রয়েড চৈতন্য ও যুক্তিবাদকে মনে করেছেন নির্জ্ঞান রহস্যভেদের অন্তরায়।

"The first condition, then, for a scientific interpretation of dreams is self observation in the form of free or involuntary association without critical interference from one's conscious mind !"

ফ্রয়েডের মতে স্বপ্নমাত্রেই ইচ্ছার অভিব্যক্তি। শিশুদের স্বপ্নে এই ইচ্ছা প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্ত হয়, কিন্তু বেশিরভাগ স্বপ্নেই ইচ্ছা পরোক্ষভাবে ব্যক্ত, অথবা

একেবারেই অব্যক্ত। সমীক্ষকের মুন্সীয়ানা বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞতা ছাড়া মূল ইচ্ছার সন্ধান মেলে না।

আমাদের ইচ্ছা বা কামনাবাসনার সবটাই আমাদের জানা নয়। বরঞ্চ বলা চলে, বেশিরভাগই অজানা। ফ্রয়েডের এসব কথা তোমার খুব নতুন লাগছে না জানি। বার বার শুনে বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে গেছে। তোমার অনেক কামনাবাসনা তোমার জানা : সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে লজ্জা পাও না। তাদের প্রশ্রয় দিয়ে তোমার আনন্দ। আবার কিছু ইচ্ছা বা বাসনা মাঝে মাঝে মনে জাগতে পারে, যেগুলো তোমাকে লজ্জিত করে, তোমার নীতিজ্ঞান বা সামাজিক চেতনাকে বিচলিত করে। ছোটবেলায় এসব ইচ্ছা প্রকাশ করতে কেউই লজ্জিত হয় না। বড় হবার সঙ্গে-সঙ্গেই নীতিজ্ঞান ও সামাজিক বুদ্ধি বাড়তে থাকে; উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে একটা সুস্থ ধারণা জন্মায়। তিন বছরের তুমি দিদির সুন্দর বরটিকে লাভ করবার জন্য আবদার করতে বা দাবি জানাতে সংকোচ বোধ কর নি। আজ তেইশ বছরের তুমি, ঐ ধরনের ইচ্ছা মনে জাগলে শিউরে উঠবে নিশ্চয়ই। তোমার বিবেক-বুদ্ধি ঐ ইচ্ছাকে চেপে রাখবে অথবা চিরতরে নির্বাসনে পাঠাবে নির্জ্ঞানপুরে। ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় তোমার বাসনার ঘটবে অবদমন (repression)। এইসব ইচ্ছাগুলো ফ্রয়েডীয় মতে সংজ্ঞান-পূর্ব (preconscious) মানসিক স্তরের ইচ্ছা। অবশ্য পুরোপুরি অবদমিত না করে যদি শুধু চেপে রাখবার চেষ্টা কর, তবে ঐ চেপে রাখা ইচ্ছা মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি মেরে তোমাকে বিব্রত করবেই। আর অবদমনে যদি সফল হও, তবে ইচ্ছাটি আর প্রত্যক্ষভাবে সোজাসুজি সংজ্ঞানের কোঠায় আসতে সাহস পাবে না। স্বর্ণমৃগের ছদ্মবেশে এসে তোমাকে ছলনা করবে। এই দুরকম ছাড়া আর এক ধরনের কামনাবাসনার কথা ফ্রয়েড উল্লেখ করেছেন, যেগুলো গোড়া থেকেই পুরোপুরি নির্জ্ঞানপুরের বাসিন্দা। শৈশবে মাতাপিতার প্রতি কামেচ্ছার অবদমন, অতি-পরিচিত ঈডিপাস্ কম্প্লেক্সের জটিলতা নির্জ্ঞান মনের এইসব গোপন ইচ্ছার জনক। স্বপ্নের মধ্যে এই তিন স্তরের ইচ্ছারই প্রকাশ দেখা যায়। ফ্রয়েডীয় স্বপ্ন-বিশ্লেষণ অবশ্য অবদমিত ইচ্ছাকে কেন্দ্র করেই প্রধানত গড়ে উঠেছে। স্বপ্ন-সুড়ঙ্গপথেই প্রথমে নির্জ্ঞান মনের গোপন কোঠায় ফ্রয়েড অভিযান চালান। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের আদিপর্ব স্বপ্নখণ্ড দিয়ে শুরু। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে 'The Interpretation of Dreams' প্রকাশিত হয়।

অবদমিত প্রবৃত্তি ও ইচ্ছাকে নিজ্ঞানপুরে নির্বাসিত (মনে রাখা দরকার, ফ্রয়েডীয় সহজাত প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা মাত্রেই কামেচ্ছা বা কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা সংক্রান্ত ইচ্ছা) করেও শান্তি নেই ! তারা নানা ফন্দীফিকির খুঁজছে সংজ্ঞান-রাজ্যে ফিরে আসবার জন্য। দিনের আলোতে জাগ্রত অবস্থায় যে সব ইচ্ছা মনের গহনে ঘুমিয়ে থাকে, তারাই স্বপ্নের মধ্য দিয়ে প্রতীকের সাহায্যে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। সহজাত প্রবৃত্তি আর ইগোর মধ্যে চলেছে দিনরাত লড়াই। 'ইগো' আবার কি ? জানতে চাইবে নিশ্চয়ই ! একজন মনস্তাত্ত্বিকের মতে—The ego is a group of tendencies which have been strengthened by social, specially ethical, indoctrination, tendencies which are a part of our accepted social life, necessary in the making of a living and the building up of a reputation. সামাজিক বিধিনিষেধের ও নীতিশাস্ত্রের আওতায় আমাদের মধ্যে যে প্রবণতা গড়ে ওঠে; যে প্রবণতা সমাজবদ্ধ জীবের প্রাণধারণ ও সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জনের পক্ষে অতি-আবশ্যক—তাকেই ঈগো বলা হয়। সহজাত প্রবৃত্তি, বিশেষ করে যৌনতামূলক প্রবৃত্তির অবাধ চরিতার্থতা ঈগোর অভিপ্রেত নয়। অথচ বিপদ এই যে আমরা সবাই সব সময়েই (ফ্রয়েডের মতে) প্রথম রিপুটির তাড়নায় অস্থির। তাই সংজ্ঞান মনের কঠোর অবদমন-চেষ্টা। স্বপ্ন, ফ্রয়েডের মতে, ঈগোর সঙ্গে সংগ্রামরত প্রবৃত্তির আত্মপ্রকাশের একটা বিশিষ্ট কায়দা। নিউরোটিক রোগলক্ষণ ও স্বপ্নকে এক করে দেখেছেন ফ্রয়েড। "The dream is itself a neurotic symptom and moreover, one which possesses for us the incalculable advantage of occuring in all healthy people."

জাগ্রত অবস্থায় অবদমিত কামেচ্ছা সাধারণত সংজ্ঞান মনোরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না। স্বপ্ন-পথে প্রতীকের ছদ্মবেশে কামেচ্ছা সংজ্ঞান রাজ্যে হানা দেয়। দিবা-স্বপ্ন দেখা আর ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখায় অনেক তফাত। দিবা-স্বপ্নে তুমি ত' দিনের মধ্যে অনেকবার ক্রয়ডনে নেমে লণ্ডনের তুষার-ঢাকা পথেঘাটে ঘুরে বেড়িয়েছ। দিবা-স্বপ্নে যে সব ইচ্ছা তোমার মনে জেগেছে তাদের তুমি বুঝতে পেরেছ, তাদের সঙ্গে তুমি পরিচিত। সে-সব অভিলাষের জন্য তোমার মনে বিন্দুমাত্র লজ্জা বা অপরাধের ভাব আসে না। কিন্তু রাতের স্বপ্ন যদি ঠিকমত

ফ্রয়েডীয় পদ্ধতিতে বিশ্লেষিত হয়, তোমার নির্জ্ঞান মনের অভিলাষের খবর পেয়ে তুমি হয়তো আঁতকে উঠবে, নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হবে। তুমি একলা নও, আমরা সবাই। আমাদের নির্জ্ঞান মনের রূপ স্বপ্ন-দর্পণে প্রতিবিম্বিত দেখলে আমরা সকলেই অবাক হতে বাধ্য। নির্জ্ঞান অভিলাষকে চেতনার রাজ্যে অনুপ্রবেশে বাধা দিচ্ছে সামাজিক সত্তা বা ইগো। ইগোকে কোন সময়ে ফ্রয়েড নাম দিয়েছেন সেন্সর। সেন্সর একাধারে সমালোচক ও পাহারাদার। জাগ্রত অবস্থায় এর সতর্ক পাহারা এড়িয়ে অবদমিত কামেচ্ছা চেতনার স্তরে পৌঁছুতে পারে না। পৌঁছুতে হলে নানারকম কলাকৌশল ও ছদ্মবেশের আশ্রয় নিতে হয়। দৈনন্দিন ভুলত্রুটি, ঠাট্টাবিদ্রূপকে আশ্রয় করে মাঝে মাঝে প্রবৃত্তি-গুলো আত্মপ্রকাশের চেষ্টা যে না করে এমন নয়। এ-নিয়েও ফ্রয়েড অনেক কথা বলে গেছেন। তবে সে আলোচনা এখন নয়। স্বপ্নের কথাতেই আসা যাক। ঘুমন্ত অবস্থায় এই কড়া পাহারাওয়ালাটিও খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়ে। আমরা ঘুমুলে নির্জ্ঞান থেকে সংজ্ঞান মনের প্রবেশপথে কঠোর কর্তব্যরত এই সেন্সরটিরও বোধহয় একটু তন্দ্রার আমেজ আসে। কাজেই অবদমিত কামনাবাসনা বেশ কিছুটা সুবিধা পেয়ে যায়। তা বলে সরাসরি হুট করে অমনি চেতনার কোঠায় আসা চলে না। সেন্সর ত' একেবারে ঘুমিয়ে পড়ে নি। খানিকটা ঢিলেঢালা হলেও, পাহারাদার সমালোচকটি নজর রেখে চলেছেন ঠিকই। কাজেই ছদ্মবেশ চাই: symbol বা প্রতীক হল সেই ছদ্মবেশ। চেতনার কোঠায় যে-রূপে স্বপ্ন প্রকাশ পায় তাকে ফ্রয়েড বলেছেন manifest dream content বা স্বপ্নের প্রকাশ-রূপ। সেটা ছদ্মবেশ। তা থেকে অবদমিত ইচ্ছার স্বরূপটি সহজেই চেনা যায় না। স্বরূপ নিহিত থাকে স্বপ্নের প্রচ্ছন্ন মর্মের মধ্যে। ফ্রয়েডের ভাষায় 'latent dream content'-এর মধ্যে। সেন্সরের ভয়েই স্বপ্নের প্রচ্ছন্ন মর্মকথা প্রতীক-আশ্রিত ছদ্মবেশ গ্রহণ করে। নিউরোটিক রোগ-লক্ষণ আর স্বপ্নের প্রকাশ্য রূপ—দুইই একই ধরনের আপোষের চেষ্টা।

সেন্সরের সতর্কদৃষ্টি এড়াতে গিয়ে প্রচ্ছন্ন অভিলাষ শুধু যে প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাই নয়। আত্মগোপনে আরও অনেক ছলাকলার সাহায্যও নিয়ে থাকে। নির্জ্ঞান-বাসনা অবিকৃতভাবে কখনও স্বপ্নের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে না! ইচ্ছা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঘটনার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে। "The indicative mood appears, so to speak, in place of the

optative". ঘটনাগুলো আবার কোন সময় অতিসংক্ষিপ্ত, কখনও বা উল্টোপাল্টা সাজানো। "Condensation, omission, modification, regrouping of material,—these are the modes of the dream-censorship's activity and the means employed in distortion." এক আধটা স্বপ্নবৃত্তান্ত শোনালে ব্যাপারটা তোমার কাছে অনেকটা স্পষ্ট হবে। তার আগে বলে নেওয়া উচিত, বদহজম বা ঐরকম সামান্য শারীরিক বিশৃঙ্খলা থেকে যে বড় রকমের স্বপ্ন সৃষ্টি হতে পারে, এই প্রচলিত ধারণা একেবারে অস্বীকার করতে পারেন নি ফ্রয়েড। তবে তিনি বলেছেন স্বপ্নের প্রকাশ্য রূপের সেটা তাৎক্ষণিক কারণ হতে পারে, কিন্তু তা দিয়ে স্বপ্নকাণ্ডের বা স্বপ্নের অন্তর চরিত্রের ব্যাখ্যা চলে না। মানে স্বপ্নের latent content, গূঢ়মর্মের মধ্যে সব সময়ই পাওয়া যায় অবদমিত কামেচ্ছা বা ঐ ধরনের কামনাবাসনা। অবশ্য যদি তাঁর প্রতীকার্থ ও অন্যান্য তত্ত্বকথা নির্বিচারে মেনে নেওয়া যায়। ফ্রয়েডীয় স্বপ্নব্যাখ্যার সমালোচনা পরে হবে। এখন ফ্রয়েডীয় স্বপ্নব্যাখ্যা দুটো একটা শোনো।

এক অবিবাহিত তরুণী স্বপ্ন দেখলেন তার ছোট এক ভাইপো কফিনে শুয়ে আছে। ছোট ভাইপোটিকে তরুণীটি খুবই ভালবাসতেন। তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না কেন এ স্বপ্ন তিনি দেখলেন। ভাইপোটির মৃত্যু কি তার নির্জ্ঞান মনের কামনা? কেন? এই মেয়েটি এক ডাক্তারের সঙ্গে প্রেমে পড়েছিলেন। ভুল বোঝাবুঝির জন্য তাদের মধ্যে ঝগড়া হয় ও ফলে দেখাসাক্ষাত বন্ধ। কিছুদিন আগে আর এক ভাইপোর (যার মৃত্যুস্বপ্ন দেখেছেন, তারই বড় ভাই) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ডাক্তার প্রেমিকের সঙ্গে সহসা দেখা হয়। এই দেখা তাঁর মনে আনন্দের শিহরণ এনেছিল। ফ্রয়েড এ সব খবর জানতেন। এর থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে স্বপ্নটিতে ডাক্তার-প্রেমিককে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। তরুণীটি আশা করেছেন ছোট ভাইপোটির কফিনের পাশেও প্রেমিককে দেখা যাবে ও তার মনে আনন্দের বান ডাকবে। এই স্বপ্নটির উল্লেখ করে ম্যাকডুগাল যে মন্তব্য করেছেন সেটাও শুনে রাখ। তিনি বলেছেন: হ্যাঁ, ব্যাখ্যা হয়ত সঠিক, কিন্তু ফ্রয়েডীয় ফর্মুলার সঙ্গে মেলে না। স্বপ্নটি একটি ইচ্ছার প্রকাশ, সে ইচ্ছাকে (প্রেমিকের সঙ্গে মিলন) কামেচ্ছাও বলা যেতে পারে। কিন্তু ইচ্ছাটি সম্পূর্ণ সাম্প্রতিক কালের ইচ্ছা—যৌবনের ইচ্ছা। ফ্রয়েডের

মতে শৈশবের অবদমিত ইচ্ছা ও আসক্তিই স্বপ্নের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। দ্বিতীয়ত, ইচ্ছাটিকে অবচেতন মনের ইচ্ছা বলা চলে কি? তরুণীটি প্রেমিকের সঙ্গে মিলনের ইচ্ছাকে চেপে রেখেছিলেন সত্য, কিন্তু অবদমিত করে নির্জ্ঞান রাজ্যে নির্বাসিত করেন নি নিশ্চয়! তা হলে ফ্রয়েডকে অত কথা বলতে পারতেন না। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকডুগাল আবার বলছেন—কিন্তু খাঁটি ফ্রয়েডিয়ান মাথা নেড়ে নিশ্চয়ই বলবেন—"লোকটা বুঝতে পারছে না যে ভাইপোর মৃত্যুকামনা মানে শৈশবের ছোট ভাইয়ের মৃত্যুকামনার সামিল। সে ইচ্ছাটা এখন পুরোপুরি অবচেতনায়।" তরুণীটির ছোট ভাই ছিল না বলছ? কিছু আসে যায় না। তার উর্ধ্বতন কয়েক পুরুষের মধ্যে কারুর না কারুর ছোট ভাই নিশ্চয়ই ছিল এবং শৈশবে তাদের কেউ না কেউ নিশ্চয়ই ছোট ভাইয়ের মৃত্যু কামনা করেছে। আর ঐ ডাক্তার-প্রেমিকটি ত' মেয়েটির শিশু বয়সের প্রেমিক-পিতার প্রতিচ্ছবি। "And her love for him was but a reanimation of her infantile incestuous desire for the father"।

স্বপ্ন নির্জ্ঞান মনের অবদমিত কামেচ্ছার প্রকাশ—এই ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকথা এইভাবেই সপ্রমাণ করা হয়ে থাকে।

ম্যাকডুগাল ফ্রয়েড-শিষ্য ব্রিলের একটি স্বপ্নব্যাখ্যার সমালোচনা প্রসঙ্গেও ঐ রকম মন্তব্য করেছেন। শুনবে সেটা? এটা আরও একটু জটিল।

একটি মেয়ে স্বপ্ন দেখছে—সে নির্জন পাড়াগাঁয়ে বেড়াতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে। বাড়ী যাবার জন্য বিশেষ আগ্রহ। Liconow অথবা Linconar Bay নামে এক জায়গায় যেন মেয়েটির বাড়ী। কিছুতেই সেখানে যেতে পারছে না। যে পথেই যাবার চেষ্টা করছে কিছুদূর গিয়েই দেখছে পথ নেই—উঁচু পাঁচিল (wall)। চারিদিকেই পাঁচিল। পা সিসের মত ভারী হয়ে এল, মাথা ঘুরতে লাগল। চলতে আর পারে না। বুড়ো মানুষের মত অতি কষ্টে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। এমন সময় এক ঝাঁক মোরগছানা,—এটা মনে হল যেন কোনো শহরের রাজপথ—মেয়েটির পিছু পিছু ছুটতে লাগল। ওদের মধ্যে বড়টি এগিয়ে এসে তার সঙ্গে অন্ধকারে যাবার জন্য মেয়েটিকে অনুরোধ জানাল। ব্রিলের নির্দেশে 'মোরগছানা' কথাটিতে বিশেষ মনঃসংযোগ করাতে মেয়েটির মনে হল যেন ঐ রাস্তাটা তার স্কুলে যাবার রাস্তা। মোরগছানাটি

ক্রমশ বড় হতে লাগল। লম্বা সরু মোরগছানার কথা ভাবতে গিয়ে মেয়েটি লজ্জার হাসি হাসল। মনে পড়ে গেল স্কুলজীবনের বিস্মৃতপ্রায় প্রণয়কাহিনী। স্কুলের অন্য বিভাগের লম্বা রোগা একটি ছেলের সঙ্গে স্কুলের শেষে রোজ সে বাড়ী ফিরত। বান্ধবীরা ছেলেটিকে তার প্রেমিক বলে জানত। তাকে আসতে দেখলে বলত—লম্বা মোরগছানাটি এসেছে। স্কুলের পড়া শেষ হলে ছেলেটি তিন তিনবার তাকে বিবাহের প্রস্তাব করেছিল। মেয়েটি হ্যাঁ-না—কোন জবাব ছায় নি। বর্তমানে ছেলেটি অন্য একটি তরুণীর প্রতি আসক্ত; আর মেয়েটির অভিলাষ সে আর একবার বিয়ের কথা তুলুক। আগে সে সরাসরি রাজী হতে পারে নি, তার কারণ ছেলেটি গরীব আর মেয়েটির সমস্ত টাকাকড়ি 'ওয়াল ষ্ট্রীটে' শেয়ার বণ্ড ইত্যাদিতে লগ্নী ছিল। মেয়েটির আয়ত্তের মধ্যেও ঠিক ছিল না টাকাগুলো। ব্রিল এইভাবে স্বপ্নটির ব্যাখ্যা করলেন। লম্বা মোরগছানাটি মেয়েটির আগেকার প্রণয়ী। তার সঙ্গে অন্ধকারে যাবার অনুরোধের অর্থ বিবাহের প্রস্তাব। 'অন্ধকার' এখানে বিবাহের অজানা রহস্যের প্রতীক। 'নির্জন পাড়াগাঁয়ে' পথ হারানোর অর্থ—একক জীবনে বিতৃষ্ণা। বাড়ী বা Linconar Bay-তে ফিরে যেতে চাওয়ার অর্থ বিবাহিত জীবন চাই। Linconar Bay হচ্ছে like—honour—obey এই তিন শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ বা condensation। কিন্তু যাবার উপায় নেই—চারদিকে দেওয়াল—wall। তখনও Wall Street আর্থিক বাধা হিসেবে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

অবাধ-অনুষঙ্গ পদ্ধতিতে ব্রিল স্বপ্নটির ব্যাখ্যা করেছেন। ম্যাকৃডুগাল ব্যাখ্যাটি পুরোপুরি মেনে নিতে রাজী নন। তাঁর বক্তব্য বিশ্লেষণের ব্যাপারে ব্রিল ধ্রুপদী ফ্রয়েডীয় ফর্মুলা মেনে চলেন নি। এখানে ইচ্ছাটি যৌনতামূলক হলেও শৈশবের অবদমিত কোনো ইচ্ছা নয়। ইচ্ছাটি নির্জ্ঞান মনের বাসিন্দাও নয়। কেননা, ব্রিলই বলেছেন—"Which had occupied our dreamer's mind for the past months and which, as she quite frankly admitted, she tried hard to forget".

ফ্রয়েড, ম্যাকৃডুগাল, ইয়ুং, এ্যাডলার প্রায় সমসাময়িক। ফ্রয়েডের সঙ্গে মূলত এঁদের বিরোধ নেই। কেননা এঁরা সবাই সহজাত-প্রবৃত্তিমূলক মনস্তত্ত্বের (যাকে সোজা কথায় বলে ইন্‌ষ্টিংটিউয়াল সাইকলজি) ধারক ও বাহক; এঁদের পার্থক্য মূলে নয়, শাখা-প্রশাখায়। ফ্রয়েডের স্বপ্ন-ব্যাখ্যার বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সমা-

লোচনা যথাসময়ে শুনবে। আমি ফ্রয়েড-অনুরাগী ম্যাকডুগালের 'ক্রিটিসিজ্‌ম' তুলে ধরছি এইটুকু সপ্রমাণ করবার জন্য যে ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্বের মূল ভিত্তি কংক্রিটের মত শক্ত নয়। স্বপ্নে শুধু নির্জ্ঞান মনের অবদমিত কামেচ্ছার প্রকাশ ও পরিতৃপ্তির চেষ্টা চলে,—ফ্রয়েডের এই বুনিয়াদী মূল বক্তব্য অসার প্রতিপন্ন হলে নির্জ্ঞান মনস্তত্ত্বের গোটা প্রাসাদটাই ভেঙ্গে পড়তে পারে। ভাববাদী বস্তুবাদী দুপক্ষের বক্তব্যই আমি তোমার কাছে তুলে ধরছি। তুমি তোমার জ্ঞানবুদ্ধি বিচার করে গ্রহণ করবে এইটুকু আশা করি।

এবার ফ্রয়েডের স্বপ্ন-প্রতীক (Dream-Symbol) নিয়ে দু'চার কথা বলব।

ফ্রয়েডের প্রতীকীবাদ (Symbolism), তোমাকে আগেই লিখেছি, ফ্রয়েডীয় স্বপ্নতত্ত্বের সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ অংশ। "Symbolism is perhaps the most remarkable part of our dreams" (Freud)। স্বপ্ন-প্রতীক দিয়েই স্বপ্ন-বিশ্লেষণ করেন ফ্রয়েডীয় সমীক্ষক। স্বপ্নের প্রকাশ্য-রূপ অনেক সময়েই এলোমেলো, সামঞ্জস্যহীন ও অদ্ভুত; কাজেই ফ্রয়েড বললেন, এ একটা ছদ্মবেশ। অবদমিত কামেচ্ছার ছদ্মরূপ। স্বরূপ প্রচ্ছন্ন আছে latent dream content বা অন্তর্নিহিত সারমর্মের মধ্যে। ফ্রয়েডের চিন্তাপদ্ধতি একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে, বিজ্ঞানসম্মত নয়। তিনি প্রথমে তত্ত্ব তৈরী করেছেন, তারপর তার স্বপক্ষে তথ্য ও যুক্তি খুঁজেছেন। তাঁর ধারণা নির্জ্ঞান-তত্ত্ব অভ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয়। যে-সব তথ্য তার তত্ত্বকে সমর্থন করে না, সেগুলোকে তিনি সরাসরি বাদ দিয়েছেন। এমন বহু স্বপ্ন প্রত্যেকেই দেখে থাকেন, যে-গুলো সোজাসুজি মানুষের প্রবল আবেগ অনুভূতির সঠিক প্রতিচ্ছবি। প্রতীক বা উদ্ভট কল্পনার কোনো অবকাশ সেই সব স্বপ্নের প্রকাশ্য-রূপের মধ্যে একেবারেই নেই। যেমন ধরো তোমার সেই ছবি আঁকার স্বপ্ন। ছবি আঁকার ব্যাপারে তুমি এমনভাবে ডুবে গিছলে যে ঘুমন্ত অবস্থায় তুমি তোমার সেই ছবিটাকেই নানাভাবে স্বপ্ন দেখতে। পরীক্ষার আগে পরীক্ষার স্বপ্ন অনেকেই দেখে থাকে। যুদ্ধের সময় সৈনিকরা স্বপ্নের মধ্যে লড়াই করে। উকিলরা বড় মামলার আগে স্বপ্নের মধ্যে অনেক সময়ে সওয়ালজবাব করে। এ সব স্বপ্নে উদ্ভট কল্পনার বা প্রতীকের কোনো বালাই নেই। উপোষী মানুষ স্বপ্নে ভোজ-সভার স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন যে মস্তিষ্কের পরিবর্তিত বিশেষ অবস্থার প্রক্রিয়া, এ

সরল সত্য কথাটি অস্বীকার করার অর্থ মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানকে অস্বীকার করা। আর ফ্রয়েড বরাবরই তাই করেছেন। প্রতীকীবাদ সমর্থন করে না এমন অজস্র স্বপ্ন আছে। সেগুলোকে ফ্রয়েড এড়িয়ে গেছেন। নির্জ্ঞান মনের অবদমিত কামেচ্ছার প্রকাশ যে-স্বপ্নে নেই, সেগুলো বোধহয় স্বপ্নই নয়! আর উদ্ভট স্বপ্ন-গুলোকে কল্পিত প্রতীকের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে তাঁর স্বপ্নতত্ত্ব তথা সাইকো-এ্যানালিসিস্ তত্ত্বকে এক দিকে প্রমাণ করেছেন, আবার অন্যদিকে এই প্রমাণের মধ্য দিয়ে প্রতীকীবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। গোলমেলে লাগছে কথাগুলো—তাই না? আচ্ছা, বুঝিয়ে বলছি। ফ্রয়েডবাদ প্রথম থেকেই (শুধু এই স্বপ্নব্যাপারে নয়) ফ্যালাসি (fallacy) দোষে দুষ্ট। একজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক কি বলেছেন শোনো।

"Psychoanalysis suffers from an absolute basic error in scientific methodology. The analysts make certain observations from behaviour of neurotic people. They draw a theory from these observations and then mistakenly believe that this theory is proven when they can make other observations of the same type and kind as the first one on which the theory was based. What they really do is merely confirm the observations which lead to the theory; they do not confirm the theory itself...... Psycho-analysis has been plagued from the beginning to the present time with this fallacious and circular type of reasoning. To be proven, a theory must be verified by objective data which are different from the ones, that lead to its postulation in the first place" (The Neurotic, Hurst. J. B.—1956).

ব্যাপারটা কি রকম জানো?

একটা দৃষ্টান্ত দিলেই পরিষ্কার হবে। শিশুদের আঙুল চোষা ফ্রয়েডের মতে একটি নিউরোটিক প্রলক্ষণ। কেন? ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে নিউরোটিক প্রলক্ষণ (neurotic trait) মাত্রেই অবদমিত ইচ্ছার অভিব্যক্তি; এবং ইচ্ছাটি সব

সময়েই গোপন কামেচ্ছা। আঙ্গুল চোষা স্তন্যপানের বিকল্প। যারা অল্প বয়সেই যে-কোনো কারণে মাতৃস্তন থেকে বঞ্চিত, তাদের মধ্যেই এই অভ্যাস বেশি দেখা যায়। স্তন্যপানে শিশু ও মা দুজনেরই নাকি কামেচ্ছা চরিতার্থ হয়। সুতরাং স্তন্যপানের বিকল্প অঙ্গুলি লেহন নিশ্চয়ই অবদমিত বা অচরিতার্থ কামেচ্ছার অভিব্যক্তি। কাজেই নিশ্চয়ই একটা নিউরোটিক ট্রেইট। আঙ্গুল-চোষা এখানে একটি উপাত্ত বা data এবং এর থেকে বিখ্যাত লিবিডো-তত্ত্ব প্রমাণিত হচ্ছে না; ফ্রয়েড তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী অঙ্গুলী লেহনের আরো অনেক দৃষ্টান্ত জড়ো করলে লিবিডোতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা বাড়ে না কিম্বা অঙ্গুলিলেহনের ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যার অনুকূলে মত গড়ে ওঠে না। বিজ্ঞানী পক্ষপাতশূন্য হবেন এবং নিজের সিদ্ধান্ত উপাত্তের উপর উদ্দেশ্যমূলকভাবে আরোপ করবেন না—এই আমরা আশা করব। এ-আশা কিন্তু ফ্রয়েড কোনদিন পূরণ করেন নি। তিনি অন্য পথে চলেছেন।

এবার প্রতীকীবাদে ফিরে আসা যাক। সেখানেও দেখবে একই ব্যাপার। স্বপ্ন-বিশ্লেষণের বেলাতে ফ্রয়েড নিজের মনগড়া প্রতীকের সাহায্য নিয়ে নিজের উদ্ভাবিত স্বপ্নতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। স্বপ্ন-প্রতীকের কোন সম্ভাব্য যুক্তি প্রদর্শন তিনি দরকার মনে করেন নি। ম্যাকডুগাল মোটামুটি প্রতীকী-বাদের সমর্থক হয়েও বলতে বাধ্য হয়েছেন, ফ্রয়েডের স্বপ্ন-প্রতীক এমনভাবে আবিষ্কৃত যে মাত্র তার সাহায্যেই স্বপ্নের ফ্রয়েডানুমোদিত ব্যাখ্যা সম্ভব ও ফ্রয়েডীয় লিবিডোতত্ত্ব সমর্থিত। ফ্রয়েডের বক্তব্য ও যুক্তিতে ম্যাকডুগালও বৃত্ততুল্যতার (circularity) আভাস পেয়ে বলেছেন, "the reader will note that there is a circularity in his argument which justifies tbe utmost exercise of critical caution."

জানি, প্রতীকগুলোর সঙ্গে কিছুটা পরিচয় তোমার আছে। প্রথম যখন ফ্রয়েড পড়েছিলে নতুন কিছু শেখবার নেশায় নির্বিচারে সবকিছু গ্রহণ করেছিলে। এখন একটু বিচার করে দেখলেই এর খামখেয়ালির দিকটা তোমার নজরে পড়বে। সাধারণভাবে স্বপ্নে-দেখা প্রতীকগুলো ফ্রয়েডের মতে, যৌনাঙ্গ বা যৌনকার্যের প্রতীক। দুনিয়ার যা কিছু লম্বা শক্ত জিনিস, যেমন ছাতা, লাঠি, পেন্সিল, কলম—সবই পুরুষাঙ্গের প্রতীক। তীক্ষ্ণ ধারালো জিনিস, যেমন ছুরি, ছোরা, বর্শা, তলোয়ার; আঘাত করবার ক্ষমতা আছে যা কিছুর, যেমন

বন্দুক, পিস্তল,—সবই নির্জ্ঞান-প্ররোচিত পুরুষাঙ্গের ছদ্মবেশ। তুমি যদি স্বপ্নে দেখ (দাঙ্গার সময় অনেকেই যে-স্বপ্ন দেখে থাকেন) একজন গুণ্ডা তোমাকে ছোরা বা রিভলবার নিয়ে তাড়া করেছে—তার বিগলিতার্থ কি হবে বুঝতেই পারছ! এরোপ্লেন, জেপলিন, রকেট এগুলো অভিকর্ষকে তুচ্ছ করে আকাশে উঠতে পারে, সুতরাং এগুলোও ঐ গোত্রে পড়ে। দুনিয়ার সব মাছ ও সরীসৃপ এই আওতায় পড়ে। আর স্বপ্নে সাপের তাৎপর্য ত' ত্রিভুবনবিদিত। আরো মজা শোনো! বাড়ী—পুংলিঙ্গ; কিন্তু সেই বাড়ীতেই যদি তাক, বারান্দা ইত্যাদি থাকে, তবে সেটা স্ত্রীলিঙ্গ। আবার অন্য দিকে, শিশিবোতল, খানাখন্দ, বাক্স পেঁটরা, অলিগলি, গুহা, নৌকা, জাহাজ; ফ্রয়েডের ভাষায়—"all such objects as share with them the property of enclosing a space or are capable of acting as receptacles"—স্ত্রী-যৌনাঙ্গের প্রতীক! আপেল, পীচ, ইত্যাদি বর্তুলাকার ফল, বুঝতেই পারছ—নারীবক্ষের প্রতীক! ল্যাণ্ডস্কেপের দৃশ্য স্বপ্নে স্ত্রী-অঙ্গ নির্দেশক, আবার জটিল যন্ত্রপাতি পুরুষাঙ্গের প্রতীক। প্রতীকগুলো আবার সুবিধামত অদল-বদল করা যেতে পারে। গোড়াতেই বলেছি এসব প্রতীকার্থ সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা নেই। কোন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রতীকে অর্থ আরোপ করা হয়েছে, মনে হয় না। সর্বকামতত্ত্ব, মানে ফ্রয়েডের লিবিডোতত্ত্ব থেকেই প্রতীকের উদ্ভাবন হয়েছে, আবার এই উদ্ভাবিত প্রতীক দিয়েই লিবিডোতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত করা হয়েছে। একেই বলে circularity—ন্যায়শাস্ত্রের বৃত্ততুল্যতা। আদিমযুগের মানুষের মনে যে সব সিম্বল্‌, ইমেজারির উদয় হতে পারে, ফ্রয়েডীয় প্রতীক-কল্পনা তা ছাড়িয়ে বেশি দূর এগোতে পারে নি। স্বপ্ন মানেই অবদমিত ইচ্ছা-অনুভূতির অভিব্যক্তি ও পরিতৃপ্তি এবং মানুষের ইচ্ছা-অনুভূতিমাত্রই কাম-মূলক; এই দুটি ধারণা বা তত্ত্ব ফ্রয়েডকে আজীবন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। স্বপ্ন বা নিউরোটিক রোগলক্ষণের মধ্যে তাই গূঢ় উদ্দেশ্যের ইংগিত খুঁজতে ব্যস্ত ফ্রয়েডিয়ানরা। শুধু স্বপ্ন নয়, জাগ্রত অবস্থায় মানুষের উদ্দেশ্যমূলক সকল কাজ-কর্মের মধ্যেই এঁরা যৌনতৃপ্তির একটা প্রয়াস ও যৌনপ্রতীকের উপস্থিতি লক্ষ্য করে থাকেন। শুনলে অবাক হবে যে ফ্রয়েডের মতে লাঙল দিয়ে জমিচাষ ও বীজবপনের উদ্দেশ্য মূলত খাদ্য-সংগ্রহ নয়, অবদমিত অজাচার-বৃত্তির তৃপ্তি সাধন।

"For, in thrusting his spade into the earth and thus fertilising mother earth, man finds a peculiar pleasure of satisfaction, and this is the satisfaction of the incestuous Oedipus complex, from which springs an unconscious but nevertheless strong desire to penetrate and fertilise his mother" (McDougall)

স্বপ্ন-বিশ্লেষণ ফ্রয়েডীয় চিকিৎসার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তোমার ত' অবাধ অনুষঙ্গ-পদ্ধতি সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান আছে। এই পদ্ধতিতে স্বপ্নের গোপন অর্থটি রোগীর কাছে প্রতিভাত হয়। তার নির্জ্ঞান মনের অভিলাষ সংজ্ঞান স্তরে আসার ফলে রোগী স্বস্তিবোধ করে ও তার রোগ-লক্ষণ দূর হয়ে যায়। এইটেই ফ্রয়েডীয়ানদের দাবী! ফ্রয়েডের অন্য সব দাবীর মত এখানেও আছে সেই শৈশব ও যৌনতার উপর অবাস্তব ঝোঁকের আতিশয্য, মানসিকতার যান্ত্রিক স্তরবিভাগ, (ইগো, সুপারইগো, ইদ্ ইত্যাদি) ও অন্যান্য দূরকল্পনা ও রহস্যময়তা। এ দাবী বিজ্ঞানভিত্তিক কিনা সেটা তোমার বিচার্য। আমার শুধু এইটুকু বক্তব্য যে ফ্রয়েডীয় স্বপ্ন-বিশ্লেষণে সমীক্ষকের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা আছে, যেটা সাধারণত উপাত্ত বিশ্লেষণে বিজ্ঞানীদের থাকে না। এমন কোন যুক্তি তাঁরা দিতে পারেন নি, যা থেকে প্রতীকের অর্থ অকাট্য বলে মনে হতে পারে। প্রতীকের দেশ-কাল নিরপেক্ষতা মেনে নেওয়া কঠিন। এ ছাড়া তুমি যদি ফ্রয়েড বা তাঁর শিষ্য-সামন্তদের স্বপ্ন-বিশ্লেষণের বিবরণ খুঁটিয়ে পড়তে যাও, দেখবে তাঁরা খুশিমত ফতোয়া জারী করছেন। কোন সময় স্বপ্নের শেষের দিকটা গোড়ায় আনছেন, নীচুর দিক উপরে তুলছেন, সোজাকে উল্‌টো করছেন, উল্‌টোকে সোজা করছেন। কোন সময় লম্বা স্বপ্নকে সংক্ষিপ্ত করছেন, আবার কোন সময় সংক্ষিপ্ত স্বপ্নকে টেনে লম্বা করছেন! এই Elaboration, Condensation, Distortion, Displacement-এর কোন আইন নেই। একমাত্র আইন সমীক্ষকের মরজি অথবা সুবিধা। এখানে হার্ষ্ট-এর আর একটা কোটেশন তুলে দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। এই ডাক্তার ভদ্রলোক বেশ কয়েকবছর ফ্রয়েডীয় মতে চিকিৎসা করে মনসমীক্ষা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর কথাগুলো বলেছেন। "After all if the meaning of a dream may be displaced or denied by turning it into its

opposite, if the meaning may be condensed and attached on to other meanings, if down may be up and end the beginning, to mention but a few of the less absurd possibilities for dream distortion, and furthermore, if the presence or absence of these mechanisms is decided by the analyst according to his individual judgement, then it is perfectly obvious that the doctor has enormous leeway to interpret any dream, literally in any way that he deems fit. And he will see fit according to his particular brand of psycho-analytic theory."

ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্বের এই বিচার থেকে এই ধারণা যেন তোমার না জন্মায় যে স্বপ্নে আবেগ-আকাঙ্খার পরিতৃপ্তি বা যৌনঅভিলাষ ব্যক্ত হতে পারে না। কিছু স্বপ্ন আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগ-অনুভূতির পরিপূরক হিসেবে দেখা দিতে যে পারে না, এমন নয়। পাভলভীয় তত্ত্বের আলোচনার সময় এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আরো পরিষ্কার করবার চেষ্টা করব। তবে তার আগে ইয়ুং-প্রসঙ্গ।

তোমার পত্রে ইয়ুং-প্রীতির পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হই নি। 'মডার্ন ম্যান ইন্ সার্চ অব এ সোল' আমারও ভাল লেগেছে, তবে মনে রেখাপাত করে নি।

সাধারণের মধ্যে ফ্রয়েডের নাম যতটা প্রচলিত, ইয়ুং-এর নাম ততটা নয়। তোমার মত মিষ্টিসিজম্-এর ভক্তদের কাছেই ইয়ুং-এর প্রতিপত্তি বেশি। যদিও জুরিখ্-এর এক বিখ্যাত হাসপাতালের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন, তবুও মনোরোগ-বিশারদদের ও মনোবিজ্ঞানীদের চেয়ে রহস্যবাদী ও তত্ত্বপিপাসুদের কাছেই তিনি বেশি পরিচিত। ইয়ুং সম্বন্ধে বলতে গিয়ে গার্ডনার মার্ফি কি লিখেছেন শুনবে? "However speculative his (Freud's) doctrines might be, they preceded from the nineteenth century monistic conception of the mind-body relation, and regarded mental processes in all their aspects as expressions of evolutionary reality residing in the tissues of living organism. For Jung, however, emphasis on the conception of spiritual forces and spiritual destiny become

prominent in the early years, and become more and more prominent as decades went by." গার্ডনার মার্ফির 'A Historical Introduction to Modern Psychology'. তুমি যে কোন লাইব্রেরীতে পাবে। সেই বইতে এ্যাড্‌লার ও ইয়ুং সম্বন্ধে একটি বিশেষ অনুচ্ছেদ আছে। পড়ে দেখ।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে জুরিখে্‌র ডাঃ সি. জে. ইয়ুং (C. J. Jung) ফ্রয়েডের নির্জ্ঞানতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন। কয়েক বছর সহযাত্রী থাকার পর ফ্রয়েডের সঙ্গে ইয়ুং-এর মতের অমিল হতে থাকে, এবং কিছুদিন পরে ইয়ুং নিজস্ব একটি তত্ত্ব প্রচার করতে থাকেন। ফ্রয়েডের 'যৌনসর্বস্বমূলক' লিবিডোতত্ত্বকে ইয়ুং মানতে পারলেন না। তার থেকেই বিরোধ। লিবিডোকে যৌনসর্বস্বতা মুক্ত করে সাধারণ 'লাইফ এনার্জি'রূপে কল্পনা করলেন ইয়ুং। ইয়ুং বললেন, লিবিডো হচ্ছে সাধারণ লাইফ্‌ এনার্জি; যৌনকামনা লিবিডোর এক ধরনের রূপ মাত্র। তুমিত' জানো ফ্রয়েডের মতে লিবিডো হচ্ছে একান্তভাবে যৌন-কামনা। মানুষের সকল প্রয়াসের মূলে এই লিবিডো। ফ্রয়েডীয় রিগ্রেশন (regression)-এর নতুন ব্যাখ্যা দিলেন ইয়ুং ও আরোপ করলেন নতুন উদ্দেশ্য। "The libido returns to the mother image, in order to find there the memory associations, by which further development can take place, as for instance from an emotional system into an intellectual system." ফ্রয়েডের মতে রিগ্রেশন বা পশ্চাদ্‌গমনের ফলে আমরা অসুস্থ হই, নিউরোটিক রোগলক্ষণ প্রকাশ পায়। আর ইয়ুং-এর কাছে "it is (regression) an attempt on the part of the mind to discover a solution for the difficulties in which it finds itself."। কথাটায় বেশ চমক আছে—তাই না? বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার উদ্দেশ্যে মন অসুস্থ হয়। আরো একটু নাটকীয়ভাবে বললে বলা যায়—আমরা বেশি সুস্থ হব বলেই অসুস্থ হই। এ সম্পর্কে এক সমালোচক বেশ সুন্দর একটি মন্তব্য করেছিলেন। Jung has left the everyday world of medicine where the cause of a fractured skull is a blow on the head, for a more or less metaphysical point of view which is difficult to correlate

with medicine. He is suggesting that the patient has become ill in order to become well." ইয়ুং-এর বচনানুষঙ্গ (word-association) এক সময়ে খুব সমাদৃত হয়ে উঠেছিল, এখন আর এর বেশি প্রচলন নেই। তবে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ধারণা যাদের পুরোপুরি গড়ে ওঠে নি, আবার ফ্রয়েডের যৌনসর্বস্ববাদতত্ত্ব মেনে নিতেও আটকায়, তাদের কাছে ইয়ুং-এর সমষ্টি-নির্জ্ঞানতত্ত্ব সমাদর পাবে। কমপ্লেক্স, এক্সস্ট্রোভার্ট (extrovert), ইনট্রোভার্ট (introvert) কথাগুলো তুমি প্রায়ই আউড়ে থাক। নাটক নভেলেও কথাগুলোর ছড়াছড়ি। ইয়ুং-এর সমষ্টিনির্জ্ঞান (collective unconscious) ও আদি-প্রতিমা (archetype) নিয়ে উঁচুদরের বাংলা সাময়িক পত্রে প্রায়ই লেখা বেরুচ্ছে আজকাল। 'ইনটেলেকচুয়ালদের' মুখে মুখে ঘোরে ঐ দুটো শব্দ। কাব্য সাহিত্যে এমন কি ছায়াছবির সমালোচনাতেও ঐ শব্দ দুটো বারবার উচ্চারিত হয়। তাই বোধহয় লিখেছ ঐ দুটো কথার তাৎপর্য জানাতে। কৌশলে আমাকে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছ কিনা কে জানে? আমার মত জড়বাদীর অজ্ঞতা আর সূক্ষ্ম রসগ্রহণের অক্ষমতার লিখিত প্রমাণ হয়ত রেখে দিতে চাও বিজ্ঞজনের কাছে সময়মত পেশ করে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার মতলবে! তুমি ইয়ুং সাহেবের তত্ত্বানুরাগী যে সব প্রখ্যাত লোকদের নাম উদ্ধৃত করেছ, দুর্ভাগ্যক্রমে আমার সঙ্গে তাঁদের আলাপ নেই। আলাপ থাকলেও তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে তোমাকে 'সমষ্টি-নির্জ্ঞানতত্ত্ব' বোঝাবার চেষ্টা আমি করতাম না। এ সম্পর্কে একজন অখ্যাত লেখিকার মতামত আমাকে খুবই আকৃষ্ট করেছে। তোমারই বয়সী একটি মেয়ে। তার বক্তব্য তোমাকে জানাচ্ছি। মনোমত না হলে তুমি ঐসব দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতদের শরণাপন্ন হতে পারো। আমার তাতে কোন আপত্তি নেই।

ইয়ুং মনস্তত্ত্বের সঙ্গে ধর্মতত্ত্বের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন এবং ফলে এক উপাদেয় তত্ত্ব তৈরী হয়েছে, যা মনোবিজ্ঞানের আওতায় পড়ে না। ফ্রয়েডের ব্যক্তিনির্জ্ঞানের আরও গভীরে তিনি সমষ্টিনির্জ্ঞানের স্তর আবিষ্কার করেছেন এবং সোজা ভাষায় আমরা যাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী বলি, তা থেকে আরও বেশি বিচ্যুত হয়েছেন। ফ্রয়েডের লিবিডোতত্ত্ব সরাসরি অগ্রাহ্য করে তিনি নতুন কথা বলতে শুরু করলেন। নির্জ্ঞান চিন্তা আর প্রাচীন চিন্তার (archaic thought) মধ্যে মিল খুঁজে পেলেন তিনি। রিগ্রেশনের (পিছুহটার) ফলে যে

উদ্ভট কল্পনার উদয় হয় তার সঙ্গে আদিম মানুষের কল্পনার বা ফ্যানটাসির সাদৃশ্য দেখে ইয়ুং চমৎকৃত হলেন। পৌরাণিক ইতিবৃত্তের সঙ্গে উন্মাদের অসংলগ্ন চিন্তা-ধারার যোগাযোগ সম্বন্ধে অনেক গবেষণার পর তিনি লিখলেন, "As a matter of fact, patients substitute fantasies for reality, fantasies similar to the actual incorrect mental product of the past, which however were once the view of reality." যোগাযোগ হয়ত আছে, কিন্তু ব্যাখ্যা কি অন্যভাবে করা যায় না! উচ্চমস্তিষ্কের, বিশেষ করে দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের, নিস্তেজনার [যা স্কিজোফ্রেনিক রোগীদের ঘটে] দরুণ নিম্নমস্তিষ্ক ও প্রাথমিক সাংকেতিক স্তরের প্রাধান্য ঘটে। এই প্রাধান্যের ফলে অসংলগ্ন চিন্তা, ভাবাতিশয্য ও অবাধ কল্পনা দেখা দিতে পারে। পাভলভের স্বপ্নতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আরো বিশদভাবে লিখব। ইয়ুং কিন্তু মস্তিষ্কের ধারে কাছে এলেন না। তাই না? উন্মাদের উদ্ভট কল্পনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি কল্পনার আশ্রয় নিলেন। ভাবলেন পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান এই সব উদ্ভট খেয়ালীপনার হদিশ দিতে পারে। বললেন, "Man leaves the mother, the source of the libido, and is driven by the eternal thirst to find her again; and to drink renewal from her ; thus he completes his cycle, and returns again into his mother's womb." বহু দেশের গাথা-উপকথায়—একই ধরনের বৃত্তান্ত আছে। প্রতীকের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে জননীর জঠরে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্জন্মের কাহিনী। ইয়ুং-এর এ-থেকে বিশ্বাস জন্মালো যে সব দেশের মানুষ একইভাবে চিন্তা করতো ও একই প্রতীক উদ্ভাবন করেছে। প্রতিটি মানুষের মনের গভীরে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্মৃতি ছাড়া সমষ্টিগত অভিজ্ঞতার স্মৃতিও বিদ্যমান। এলিয়ট স্মিথ ও অন্যান্য অনেক নৃতত্ত্ববিদ মনে করেন যে এক দেশের গাথা ও উপকথা লোকমুখে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ম্যাকডুগাল বলছেন,—"Jung's doctrine is in opposition to the school of Prof. Eliot Smith, which seeks to account for such similarities in remote parts of the earth's surface by the hypothesis of geographical transmission of culture elements and the wandering of people."

ইয়ুং-এর অভিমত সম্বন্ধে আরো দু'চার কথা শোনো।

তিনি বলছেন, সংজ্ঞানে থাকে সন্ত স্মৃতি, ব্যক্তিনির্জ্ঞানে ব্যক্তির অতীত—যা সে অবদমিত করেছে যা ভুলে গেছে, আর সমষ্টিনির্জ্ঞানে থাকে জাতিগত স্মৃতি—"the inherited world images generally under the form of primordial images or mythical themes." এই 'primordial images' হচ্ছে মানব মনের আদিমতম, গভীরতম সর্বজনীন চিন্তা-ভাবনা। এই আদিরূপ, এই আদিম প্রতিমা ইয়ুং-এর মনস্তত্ত্বে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। প্রতীকের সর্বজনীনত্বের ব্যাখ্যায় আর্কিটাইপ বা আদিরূপের আমদানি। আগে যে প্রত্যাবর্তনের কথা বলেছি, সেই প্রত্যাবর্তন বা পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে আদিরূপের প্রকাশ। পরিবারের আদিরূপ খৃষ্টানদের ত্রিনীতির (Trinity) মধ্যে।

ইয়ুং-এর মতে, 'স্বপ্ন অবদমিত কামনার কাল্পনিক প্রকাশ'—এই ফ্রয়েডীয় ধারণা ভ্রমাত্মক। "According to Freud, the dream is in its essence a symbolic veil for repressed desires, which are in conflict with the ideals of personality. I am obliged to regard the dream from a different point of view. The dream for me is, in the first instance, the subliminal picture of the psychological condition of the individual in his waking state."

ইয়ুঙ্গীয় নির্জ্ঞান-এর গভীরতা ও ব্যাপ্তির তুলনায় ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞান যেন সমুদ্রের কাছে গোষ্পদ। স্বপ্ন-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই নির্জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছেন ইয়ুং। কয়েকটি মাত্র স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে দ্রষ্টার জাতি-নির্ণয়ও নাকি সম্ভব। আদিপ্রতিমার বৈশিষ্ট্য থেকে ব্যক্তির অতীত ও বর্তমান, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মানসিক অবস্থা নির্ণয় করা যায়। ইয়ুং মনে করেন যে, লিবিডো শুধু যৌনশক্তি নয়, আদিম জৈবশক্তি, বার্গশর 'ইলান ভাইটাল' বা সাধারণ প্রাণ-শক্তি আর ইয়ুং-এর লিবিডো অনেকটা সমজাতিক। স্বপ্ন এবং নিউরোসিসের যৌনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ইয়ুং-এর মতে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। শৈশবের অজাচার-ইচ্ছাকে ইয়ুং একেবারেই গুরুত্ব দিতে চান না।

নিউরোসিসের কারণ অতীতে নয়, বর্তমানের মধ্যেই নিহিত বলে মনে করেন

ইয়ুং। লিবিডোর কাজ অভিযোজন বা মানিয়ে নেওয়া। ইংরাজীতে যাকে বলে adaptation. এই মানিয়ে নেওয়ার পথে যখন কোন বাধা আসে, লিবিডো-স্রোত তখন পুঞ্জিত হতে থাকে। জলস্রোতের পথে বাধা এলে যে রকমটি হয়, অনেকটা সেই রকম। লিবিডো প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চয় করে বাধা ঠেলে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে, প্রতিবন্ধক থাকা সত্বেও নিজেকে মানিয়ে নেবার প্রয়াস পায়। কোনমতেই যদি অভিযোজন সম্ভবপর না হয়, তবেই পুঞ্জিত লিবিডো পিছু হঠতে শুরু করে। বর্তমানের সঙ্গে অভিযোজনের চেষ্টা ছেড়ে অতীতে ফিরে গিয়ে আদিম উপায়ে মানিয়ে নিতে প্রয়াস পায়। ব্যক্তির শৈশব নয়, জাতির শৈশব ইয়ুং-এর আলোচ্য বিষয়। পশ্চাদ্‌গামী লিবিডো বা জীবনীশক্তি সেই-শৈশবের দূর কল্পনাকে জাগিয়ে তোলে।

স্বপ্নে নির্জ্ঞানের স্বতঃবৃত্ত অভিযোজন-প্রয়াস দেখতে পাই। ঘুমন্ত অবস্থায় সংজ্ঞানের প্রভাবমুক্ত নির্জ্ঞানের পরিচয় পাই। এই পরিচয়ই তার চিন্তা-ভাবনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছার সঠিক পরিচয়; ব্যক্তিত্বের প্রবণতার প্রকৃত নিদর্শন। জাগ্রত অবস্থায় কোন সমস্যার সমাধানে আমরা সমস্যাটিকে নানাদিক থেকে বিচার বিবেচনা করে দেখবার চেষ্টা করি। এই চেষ্টা স্বাভাবিকভাবেই ঘুমের মধ্যেও চলতে থাকে। অনেক নতুন সূত্রেরও সন্ধান পাই। জাগ্রত অবস্থায় এগুলো নির্জ্ঞান মনে সুপ্ত থাকে। এইদিক দিয়ে ইয়ুং-এর কাছে স্বপ্নের একটা বিশেষ মূল্য আছে। অভিযোজন ক্ষমতাকে সাহায্য করে স্বপ্ন। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে ব্যক্তিমানসের সমস্ত রকমের প্রবণতা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া একান্ত দরকার। স্বপ্নের মাধ্যমেই শুধু এই প্রবণতার সন্ধান মেলে; তাই ইয়ুং-এর কাছে স্বপ্নের গুরুত্ব এত বেশি, নির্জ্ঞান মনের চিত্র এত দামী।

ইয়ুং-এর নির্জ্ঞান শুধু ব্যক্তিনির্জ্ঞান নয়। শৈশবের অবদমিত কামেচ্ছা বা অবাঞ্ছনীয় বিস্মৃত ঘটনার ক্যালেণ্ডার শুধু নয় ইয়ুং-এর নির্জ্ঞান। "Just as the body bears the traces of its phylogenetic development, so also does the human mind. There is nothing surprising in the possibility of the allegories of our dreams being a survival of archaic modes of thought."

আমরা জানি পরাগিত ডিম্বকোষ ক্রমবিকশিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ মানবশিশুতে রূপান্তরিত হওয়ার পথে বিবর্তনের ধারা রক্ষা করে চলে। মানবদেহে

প্রজাতির পূর্বপুরুষের অনেক স্বাক্ষর বিদ্যমান। তেমনি, ইয়ুং-এর মতে ব্যক্তি-মানস ক্রমবিকাশের পথে পূর্বপুরুষের চিন্তাভাবনা ও প্রবণতার স্বাক্ষর বহন করে চলে। প্রাচীন চিন্তার ছাপ, আদিম মানসিকতার চিহ্ন, সভ্য মানুষের মনের অচেতনে বর্তমান। স্বপ্নে রূপকের মাধ্যমে এই আদিম মানসিকতার আত্মপ্রকাশ ঘটে। গূঢ় অর্থপূর্ণ পৌরাণিক কাহিনীকে সমষ্টির স্বপ্ন বলে অভিহিত করেছেন ইয়ুং। এবার স্বপ্নব্যাখ্যায় আসা যাক।

(৫)

ইয়ুং তাঁর স্বপ্নব্যাখ্যাপদ্ধতির নাম দিয়েছেন—Synthetic constructure অর্থাৎ সংশ্লেষণ ও সংগঠনমূলক। তাঁর মতে ফ্রয়েডীয় পদ্ধতি casual and reductive—অর্থাৎ তাৎক্ষণিক কার্য-কারণ সম্পৃক্ত এক খণ্ডিতকরণের পদ্ধতি। নিঃসন্দেহে তাঁর পদ্ধতি (তাঁর মতে) অনেক উচ্চাঙ্গের পদ্ধতি। ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসাবে স্বপ্নকে ব্যাখ্যা করা যখন আর সম্ভব হয় না তখন ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষ হয়ে যায়। আর ঠিক সেই সময়ই, সমষ্টিনির্জ্ঞানের রূপকের আবির্ভাব ঘটে স্বপ্নের মধ্যে। ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা অনেকটা সাবজেক্টিভ; সবকিছুকে ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমিত করার চেষ্টা। আর ইয়ুং-এর পদ্ধতি অবজেক্টিভ; কাজেই বিশ্লেষণমূলক। দু'একটা ব্যাখ্যা শোনো, তাহলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

নির্জ্ঞানস্তরে আদি-প্রতিমাচিন্তার (archetypal thinking) অবস্থিতির প্রমাণ হিসাবে ম্যাকডুগাল যে-দুটি স্বপ্নের উল্লেখ করেছেন, সেই দু'টিই আমাদের আলোচ্য। এ-স্বপ্ন দু'টির ব্যাখ্যা ম্যাকডুগালের অনুরোধে ডাঃ ইয়ুং নিজে দিয়েছেন। ম্যাকডুগাল বলছেন—"During the analysis of my dreams by Dr. Jung, it was natural that I should be interested in any indications of archetypal thinking that might be revealed. I cannot allege that such indications were abundant or convincing to me. The following dream yields perhaps the best instance of thinking that seems to conform to that type." তুমি বলতে পারো, ম্যাকডুগাল ত' ইয়ুং-এর তত্ত্বে পুরোপুরি বিশ্বাসী নন। তাঁর মতামত বা উদ্ধৃতি তুমি মেনে নেবে কেন?

কোন কিছু নির্বিচারে মেনে নিতে তোমাকে আমি বলছি না। ম্যাকডুগাল, ফ্রয়েড, ইয়ুং একই গোষ্ঠীর লোক, ভাববাদী দর্শন-অনুপ্রাণিত ইনট্রিংটুয়াল সাইকলজিষ্ট। ফ্রয়েডের সমালোচনা প্রসঙ্গে তাঁর মতামত তোমাকে জানিয়েছি; কাজেই ইয়ুং-এর সম্বন্ধে তাঁর ধারণা তোমার জানা দরকার। আর লক্ষ্য করে থাকবে যে, ফ্রয়েড ও ইয়ুংকে তিনি শ্রদ্ধা করেন। বিরুদ্ধবাদী তাঁকে বলা চলে না। বস্তুবাদী স্কুলের পণ্ডিতেরা ফ্রয়েড বা ইয়ুং-এর মূল সূত্রকেই অস্বীকার করেন; এবং তাঁদের কথা কিছু কিছু তোমাকে জানিয়েছি। পাভলভ্-পন্থীদের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁদের মতামত আরো বিশদভাবে পেশ করব।

ম্যাকডুগালের স্বপ্নবৃত্তান্ত শোনো এবার। "আধশোয়া অবস্থায় একটি ষাঁড়কে গাড়ীতে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ষাঁড়টিকে গাড়ীর মধ্যে দাঁড় করানো হলে দেখলাম তার শুক্রাশয় দুটি (testicles) ঝুলে পড়ে প্রায় মাটি ছুঁয়েছে। এক লোলচর্ম বৃদ্ধা ষাঁড়টিকে হত্যা করতে চায়। মাটিতে বসে আছে বৃদ্ধা আর তার কোলের ওপর মাথা রেখে তার দিকে তাকিয়ে আছে ষাঁড়টি। বৃদ্ধার হয়ে ষাঁড়টিকে বধ করতে কেউ এগিয়ে আসছে না দেখে, অগত্যা সে নিজেই কাজে লেগে গেল। একটা বড় ছুরি দিয়ে ষাঁড়টিকে পিছন দিকে সে আঘাত করতে লাগল। আমার তিন ছেলে ষাঁড়টির পাশে একটা সরু দেয়ালের গায়ে আটকানো একটি বেঞ্চে বসে [অনেকটা জাহাজের বাঙ্কের মত দেখতে] বিশেষ আগ্রহ নিয়ে দৃশ্যটি দেখছে। ষাঁড়টা ক্ষেপে গিয়ে আমার ছেলেদের জখম করতে পারে ভেবে খুব ভয় পেয়ে গেলাম। চেঁচিয়ে তাদের পালিয়ে যেতে বললাম। ষাঁড়টি শান্তভাবে শুয়েই আছে, আর বুড়ী আঘাতের পর আঘাত করছে। জমাট রক্ত আর টুকরো মাংসে সারাদেহ আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়াতে বৃদ্ধাকে বীভৎস দেখাচ্ছে। আমি উদ্বেগ, ঘৃণা আর ভয় নিয়ে জেগে উঠলাম।"

ম্যাকডুগালের নিজস্ব ব্যাখ্যাই আগে বলি। "সন্তানদের বয়ঃসন্ধিকালে সব পিতামাতাই উদ্বিগ্ন থাকেন। আমার বড় ছেলে পনেরো বছরে পড়েছে। স্বপ্নের মধ্যে তার চেহারাটাই স্পষ্টভাবে দেখেছিলাম। এই উদ্বেগ নির্জ্ঞান মনে চাপা ছিল। ষাঁড় যৌনতার প্রতীক। অতিবৃহৎ শুক্রাশয় এই ইংগিত বহন করছে যে, যৌনভার বহন করা খুবই শক্ত। ষাঁড়টিকে হত্যা করার চেষ্টা মানে ছেলেদের জীবন থেকে যৌনাবেগ রহিত করার ইচ্ছা। অবশ্য এ-ইচ্ছা বা এই পদ্ধতিতে তাদের জীবন নিরাপদ করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে আমার যথেষ্ট

সন্দেহ ছিল। এর ফলে তাদের আরো বেশি ক্ষতি ঘটতে পারে—এই আশঙ্কাও প্রকাশ পাচ্ছে স্বপ্নের মধ্যে। সংযতচরিত্র, রাশভারি প্রবীণা স্ত্রীলোকের প্রতীক ঐ বৃদ্ধা। এঁরা যৌন-নীতি শিক্ষা দিয়ে থাকেন, এঁরা সজাগ প্রহরী ও নৈতিক অভিভাবকের কাজ করেন।"

ইয়ুং-এর ব্যাখ্যা (ম্যাক্ডুগালের মতে) আরো বেশি আনুমানিক ও কৌতূহল উদ্দীপক। তাঁর মতে এই স্বপ্নটি পুরণো এক অতিকথার (myth) বৈশিষ্ট্য-সূচক প্রতিরূপ। ষাঁড় ও বৃদ্ধা এখানে ম্যাক্ডুগালের সমষ্টিনির্জ্ঞানে অনুপ্রবিষ্ট আর্কিটাইপ্যাল ফিগার—আদিপ্রতিমার প্রতীক। ষাঁড়টি সমষ্টিনির্জ্ঞানে সুপ্ত যৌনাসক্তি, অবহেলিত হয়ে পাশবপ্রবৃত্তির রূপ নিয়েছে। স্বপ্নে অনুভূত ভয় ও উদ্বেগ নিজের মনের ঐ অবহেলিত দিকটি সম্পর্কে। ষাঁড় ও বৃদ্ধা ম্যাকডুগালের "এ্যানিমা"র (Anima) প্রতীক। এ্যানিমা ও পার্সোনা (Persona)—এই দু'টি শব্দ ইয়ুং বোধ হয়, 'Animal' ও 'Person'—এই অর্থে ব্যবহার করেছেন। অনেক সম্ভাবনা বা সহজাত শক্তির অংকুর নিয়ে মানুষ জন্মায়। এর সবগুলি বিকশিত হতে পারে না। কতকগুলির অনুশীলনের জন্য অন্য কতকগুলি অবহেলিত হয়। অনুশীলিত গুণগুলির পূর্ণ বিকাশের ফলে মানুষের যে রূপ বা ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়, তাই দিয়েই মানুষের পরিচয়। এই রূপ বা 'ব্যক্তিত্বকে' ইয়ুং মুখোসের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আর যে-সম্ভাবনাগুলি বিকশিত হতে পারে না তারা সমষ্টিনির্জ্ঞানে পাশবশক্তি নিয়ে ঘুমিয়ে থাকে। মুখোসচিহ্নিত ব্যক্তিত্বের বিপরীত এই পাশবশক্তি। 'এ্যানিমা' আর 'পার্সোনা' পরস্পরবিরোধী, সদা-যুধ্যমান। ইয়ুং-এর মতে পুরুষালী গুণসম্পন্ন যার 'পার্সোনা', তার 'এ্যানিমা' তত নারীসুলভ। ম্যাক্ডুগাল বুদ্ধিজীবী, তাঁর 'পার্সোনা' যুক্তিবাদী, কাজেই 'এ্যানিমা' স্বজ্ঞাবাদী (Intuitive)। তাই তাঁর মগ্ন ব্যক্তিত্বের প্রতীক ঐ লোলচর্ম বৃদ্ধা। 'পার্সোনা'র সঙ্গে সমাজচৈতন্যের যে সম্পর্ক, 'এ্যানিমা'-র সঙ্গে সমষ্টিনির্জ্ঞানের সেই সম্পর্ক।

এরপর ম্যাকডুগাল বলেছেন যে, ফ্রয়েডের স্বপ্নব্যাখ্যা শুধুই ব্যাখ্যা। টুকরো টুকরো করে স্বপ্নটাকে ভেঙ্গে—শৈশবের বিভিন্ন অবদমিত কামনার সঙ্গে তার সম্পর্কনির্দেশ। আর ইয়ুং-এর ব্যাখ্যা গঠনমূলক। সমগ্র ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন করে ভবিষ্যতের কর্মপদ্ধতির নির্দেশ পাওয়া যায় নাকি তাঁর ব্যাখ্যায়।

ষাঁড়ের স্বপ্নের তাৎপর্য এই যে, ম্যাক্ডুগালের 'এ্যানিমা' মগ্নচৈতন্যে সুপ্ত

থাকলেও, তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করছে এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ম্যাক্‌ডুগালের নিজের বক্তব্য যথাযথ তুলে দিয়েছি। ফ্রয়েড ও ইয়ুং-এর স্বপ্নবিচার পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য, আমার চোখে যা ধরা পড়েছে, তা নেহাৎ মামুলি। এই 'পার্সোনা' আর 'এ্যানিমা'—জেম্‌সের বহু বিঘোষিত মনের 'সদর' আর 'অন্দরের' কথা মনে করিয়ে দেয় না কি? খুব বেশি পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। আর বৃদ্ধা কেন ষাঁড়টিকে হত্যা করতে চায় তাও স্পষ্ট নয়। সমষ্টিনির্জ্ঞানের এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের এই সংঘাতের কারণ কি? তা ছাড়া ইয়ুং-এর ব্যাখ্যায় ম্যাকডুগালের ছেলে তিনটির কোন উল্লেখ নেই। তোমার কাছেই উত্তর চাই।

আর একটি স্বপ্ন। "তাঁবু ভেঙ্গে ফেলার পর আমি কিছু জিনিসপত্র-কেনার জন্য সেখানকার 'সেলে' (sale) উপস্থিত। সমচতুষ্কোণ একটি ক্যানভাসের তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে দেখছি। তাঁবুর ভেতরকার মেঝে প্রায় তিন ফুট উঁচু। দুদিকে ঝোলানো ক্যানভাসের আলগা টুকরোর একটা পাশ গুটোনো। মেঝের উপর আমার কুকুরটাকে দেখলাম। সে বেরিয়ে আসতে চায় অথচ পারছে না। সে লাফ দিলেই ত' পারে। কেন লাফ দিচ্ছে না? মাঝামাঝি ক্যানভাসের পার্টিশন ছিয়ে তাঁবুটাকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। আমি ঘুরে অন্যধারে গিয়ে আল্‌গা ক্যানভাস সরিয়ে কুকুরটাকে ডাকলাম। কুকুরের বদলে একটা বছর দুয়েকের বাচ্চা বেরিয়ে এল। আমার ছেলেরাও ঐ বয়সে প্রায় ঐ রকমটি দেখতে ছিল। সে আমার কোলে উঠতে চাইল। আমি তাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেতেই দেখি আমার স্ত্রী এক বৃদ্ধ জেনারেলের সাথে বেরিয়ে এলেন।"

এই স্বপ্নটির কোন অর্থ খুঁজে না পেয়ে ম্যাকডুগাল ইয়ুং-এর কাছে এটিকে হাজির করেন ব্যাখ্যার জন্য। ঐ সময় ম্যাক্‌ডুগাল ইংলণ্ডের বাস তুলে দিয়ে আমেরিকা যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। স্বপ্নটির মধ্যে, ইয়ুং-এর মতে, সেই পরিবেশ বিধৃত। তাঁবু ম্যাক্‌ডুগালের ভবঘুরে জীবনযাত্রার প্রতীক। কুকুরটি উদ্দাম স্বাধীনতাপ্রয়াসী সহজাত প্রবৃত্তি। এই সহজাত প্রবৃত্তির চরিতার্থতার পক্ষে ইংলণ্ডের পরিবেশ অনুকূল মনে হচ্ছিল না। ম্যাকডুগাল এই সহজাত প্রবৃত্তিকে চাপা দিয়ে রাখতে চান, কিন্তু পারছেন না। বাচ্চাটি ইয়ুং-এর পরিভাষায় "Kabyr"-এর প্রতীক। যুক্তি আর প্রবৃত্তির মধ্যেকার সংযোগসেতু বোধ

হয় এই Kabyr ; মনের অপরিণত স্বজ্ঞালব্ধ জ্ঞান, যাকে বলা হয় intuitive knowledge.

আল্‌গা ঝোলানো ক্যানভাসের টুকরো (flap) দিয়ে তাঁবুটিকে দুভাগ করা হয়েছে। এর মানে সহজাত প্রবৃত্তি আর স্বজ্ঞার ঘনিষ্ঠতা খুব বেশি। স্বজ্ঞাবৃত্তি সমীক্ষার ফলে নির্জ্ঞান থেকে সংজ্ঞানে আসতে চেষ্টা করছে। বৃদ্ধ জেনারেল ম্যাক্‌ডুগালের মধ্যেকার পিতৃসুলভ বাৎসল্যগুণের প্রতীক। ব্যক্তিত্বের নানাদিক কিভাবে স্বপ্নের মধ্যে প্রতিভাত হয়—এই স্বপ্নটি তারই নিদর্শন।

ম্যাক্‌ডুগাল বলছেন, ইয়ুংপ্রদর্শিত স্বপ্নব্যাখ্যা এখানে সম্পূর্ণ মানুষটিকে তুলে ধরেছে। ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ পরিচয় নিহিত আছে সমষ্টিনির্জ্ঞানে। স্বপ্ন সমষ্টি-নির্জ্ঞানের দরজা খুলে অন্তর্লীন 'এ্যানিমা'কে সংজ্ঞানস্তরে আনতে সাহায্য করছে। ম্যাক্‌ডুগাল ও ইয়ুং ফ্রয়েডের মতই স্বপ্ন-বিশ্লেষণের সাহায্যে মননক্রিয়ার স্বরূপ জানতে বদ্ধপরিকর। মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া মনকে জানার চেষ্টা গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরপাক খাওয়াতে পর্যবসিত হতে বাধ্য। নির্জ্ঞানের ব্যাপ্তি ও গভীরতা ইয়ুং বাড়িয়েছেন, এতে দূরকল্পনা ও অনুমানের পরিধি বেড়েছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু জ্ঞানের মাত্রা বাড়েনি। এক শ্রেণীর শিল্পী সাহিত্যিকের কাছে 'আদি-প্রতিমা'র কল্পনা যতই গভীর তাৎপর্যব্যঞ্জক হোক না কেন, মনোবিজ্ঞানের কাছে এর বিশেষ কোনো দাম নেই। আজকাল গ্যয়টে বা রবীন্দ্রনাথের কাব্যব্যাখ্যায় ইয়ুংকে টেনে আনছেন অনেক সমালোচক। আমি জানি, তুমি তাঁদের দ্বারাই অভিভাবিত হয়েছো। শিল্পী-সাহিত্যিকের কল্পনা-উপমা-প্রতীকের মধ্যে মনোবিজ্ঞানের সূত্র বা সত্য খুঁজতে গেলে ঠকতে হবে।

*　　　　*　　　　*　　　　*

রহস্যবাদ চিরকাল মানুষকে প্রভাবিত করতে থাকবে ;—তোমার এই ধারণার সঙ্গে আমি কিন্তু পুরোপুরি একমত নই। বিজ্ঞান সবকিছুর ব্যাখ্যা কোনদিন দিতে পারবে না, একথা ঠিক। কেন না জ্ঞানের আলো যতই বাড়বে অন্ধকারে ঢাকা নতুন অজানার রাজ্য ততই বিজ্ঞানকে নতুন চ্যালেঞ্জ জানাবে। আলো-অন্ধকার, জানা-অজানা, জ্ঞান-অজ্ঞানতা—এই দুই বিপরীতে ঘেরা থাকবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। কিন্তু এমন দিন আসছে—যখন তোমার আমার মত সাধারণ মানুষও অজ্ঞানতা-অন্ধকারের সামনে দাঁড়িয়ে মোহাচ্ছন্ন হবে না, বিভ্রান্ত হবে না, অন্ধকারের

চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করবে। অতীন্দ্রিয় বা প্রকৃতিবহির্ভূত কোনো শক্তির আরাধনা করবে না, বিজ্ঞানলোকের সীমারেখার বাইরে রহস্যলোকের কল্পনা করবে না। তারজন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানচেতনার সম্প্রসারণ ও সামাজিক বিন্যাসের পরিবর্তন।

অনুমান বিজ্ঞানী মাত্রেই করেন। সেই অনুমান অনেক সময় হয়ত' সত্য বলে প্রমাণিত হয়। অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এভাবে ঘটেছে মানতেই হবে। কিন্তু তা বলে অনুমানমাত্রকেই বৈজ্ঞানিক সত্যের মর্যাদা দিতে রাজি নই। ইয়ুং-এর অনুমানকেও না। ইয়ুং সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু তোমার মত দুর্বলতা নেই। তুমি লিখেছ, ইয়ুং-এর মতে ঘুমের মধ্যে মানুষ নিজেকে অতিক্রম করে, স্বপ্ন মানুষের সমষ্টিনির্জ্ঞানের ঐশী প্রকৃতির অভিব্যক্তি, মানুষের মহত্ত্বের প্রতীক। আর ফ্রয়েডের মতে ঘুমের মধ্যে মানবসত্তা সংকুচিত হয়ে যায়, স্বপ্নের মাধ্যমে আমরা শৈশবাসক্তি ও জৈব প্রবৃত্তির সন্ধান পাই; স্বপ্ন মানুষের নীচতা হীনতার অভিব্যক্তি। নিঃসন্দেহে ইয়ুং-এর অনুমান মানবজাতির পক্ষে গৌরবজনক আর ফ্রয়েডের অনুমান লজ্জাজনক। কিন্তু বিজ্ঞান তোমার-আমার গৌরব অগৌরবের তোয়াক্কা করে না। একজন মানুষকে দেবশিশুর সঙ্গে তুলনা করে খুশি, আর একজনের মানুষকে ছাগশিশু কল্পনা করে তৃপ্তি। এরিক ফ্রম আবার দুকুল রক্ষা করতে চান। তিনি বলেছেন, স্বপ্ন যুক্তিহীন প্রবৃত্তি আর বুদ্ধিদীপ্ত উচ্চমননবৃত্তি—এই দুয়েরই পরিচায়ক। ভালো মন্দের সমন্বয়ে স্বপ্নজগৎ গঠিত। "Dreams show both the best and the worst in ourselves"। আর একজন আধুনিক আমেরিকান চিকিৎসকের মতে "For most psychiatrists Jung is too mystical. For others Freud is too narrow, restricting dream motives to the expression of infantile sexual drives at the whole range of human emotions" আমার মতে, এঁরা দুজনেই মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপকে প্রাধান্য না দিয়ে নিজেদের অনুমানভিত্তিক তত্ত্বকে প্রাধান্য দিয়েছেন; বৈজ্ঞানিক দর্শনের আশ্রয় ছেড়ে অন্তর্দর্শনের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েছেন, কাজেই একজন প্যারাসাইকলজি, অন্যজনে মেটাসাইকলজিকে সমৃদ্ধ করেছেন। মনস্তত্ত্বকে অতিকথায় দাঁড় করাতে চেয়েছেন, মনোবিজ্ঞানকে অবহেলা করেছেন। ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যাত্মবিদ্যার সমারোহ যতই তোমাকে আকৃষ্ট করুক না কেন, এই বিদ্যাকে এখনও বিজ্ঞান-সমর্থিত বিদ্যা বলে মানবার উপায় নেই।

ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্বে যৌন-প্রতীকের আধিক্য তোমার বয়সী মেয়েদের শালীনতাবোধকে আহত করে বলে তুমি বোধহয় ইয়ুংকে আশ্রয় করতে চেয়েছ। 'পিউরিট্যান্' প্রীতি আর বিজ্ঞানধর্মিতা কিন্তু এক নয়। এই প্রসঙ্গে উড়ন্তচাকী ও গুস্তাভ ইয়ুংকে নিয়ে বছর দশ বারো আগে সংবাদপত্রে যে আলোড়ন উঠেছিল, তার খবর তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি! এথেকে ইয়ুং-এর জীবনদর্শন বুঝতে পারবে। জানো নিশ্চয়ই যে উড়ন্তচাকীর গালভরা একটা নাম আছে—Unidentified Flying Objects, সংক্ষেপে U. F. O.। এইU. F. O. নিয়ে ইয়োরোপ-আমেরিকায় শোরগোল চলছে। ১৯৫৪ সালে ইয়ুং এ সম্পর্কে একটি সুইস্ পত্রিকার প্রতিনিধির কাছে বলেছিলেন যে কিছু একটা দেখা যায়, কিন্তু ঠিক বস্তুটি কি সেটা সঠিক বোঝা যায় না। চার বছর পরে নিউ মেক্সিকোর U. F. O. কেন্দ্র থেকে একটা সংবাদ প্রকাশিত হয় যে ইয়ুং নাকি সুইস পত্রিকার প্রতিনিধির কাছে বলেছিলেন যে তিনি উড়ন্তচাকীর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। দস্তুর মত হৈ চৈ পড়ে যায়। ইয়ুং-এর প্রতিবাদ যথাসময়ে প্রকাশিত হলেও পাঠকদের যেন দৃষ্টি আকর্ষণ করলো না। ইয়ুং-এর কথায়—"I issued a statement to the United Press and gave a true version of my opinion, but this time the wire went dead. Nobody, so far as I know, took any notice of it." এ থেকে ইয়ুং এই শিক্ষা লাভ করলেন যে সাধারণ মানুষ উড়ন্তচাকীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে চায়, অবিশ্বাসকে প্রশ্রয় দিতে চায় না। "This creates the impression that there is a tendency all over the world to believe in saucers and to want them to be real." কারণ কি? উড়ন্তচাকীর অস্তিত্ব মানুষ মেনে নিতে চায় কেন? কারণ এ বিশ্বাস মানব-প্রজাতির সমষ্টিগত বিশ্বাস। স্মরণাতীতকাল থেকে এই বিশ্বাস তারা ধারণ করে আসছে। প্রাচীনকালের স্বপ্ন-প্রতীক এই উড়ন্তচাকী। স্বপ্ন ইয়ুং-এর মতে সমষ্টি-নির্জ্ঞান-এর বহিঃপ্রকাশ। প্রাচীন যুগের প্রজাতিগত চিন্তাভাবনা আধুনিক মানুষের নির্জ্ঞান মনের গোপনে অবস্থান করছে। লোকগাথায়, পৌরাণিক কথায়, এই চিন্তাভাবনা সাধারণের কাছে প্রকাশ পাচ্ছে।

এই চিন্তাভাবনা, এই স্বপ্ন প্রতীক, এই সমষ্টিগত বিশ্বাস কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যের আভাস কিনা এ নিয়ে ইয়ুং বিশেষ মাথা ঘামাতে চান নি। তিনি

স্বপ্নে ও সমষ্টিগত বিশ্বাসের মধ্যে খণ্ডিত অসম্পূর্ণ ব্যক্তিমানুষের পূর্ণতার ও অখণ্ড আশা-আকাঙ্ক্ষা-অভিলাষের প্রতিফলন দেখেছেন। ধর্মীয় বিশ্বাসের পুনরুজ্জীবন মানবমুক্তির পথ মনে করেছেন ইয়ুং।

উড়ন্তচাকীর প্রসঙ্গে ফ্রয়েড আর ইয়ুং-এর দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যটা বুঝিয়ে বলছি শোনো। উড়ন্তচাকী একটা প্রতীক। ফ্রয়েডের কাছে যৌনাঙ্গের প্রতীক, ইয়ুং-এর কাছে ধর্মাঙ্গের। ফ্রয়েড শুধু একটিমাত্র 'আর্কিটাইপ' (আদি প্রতিমা)—অজাচার-ইচ্ছাকে, কামপ্রবৃত্তিকে অতি গুরুত্ব দিয়েছেন। অন্যপক্ষে ইয়ুং মনে করেছেন যে গুরুত্বপূর্ণ আর্কিটাইপ (আদি প্রতিমা) মাত্রেই ধর্মাশ্রিত। উদাহরণ দিচ্ছি, শোন:

একটি মেয়ে বাসে করে যাচ্ছিল। এয়ার-রেডের সংকেত-সাইরেন বেজে উঠলো। সকলে নেমে গেল। মেয়েটিও নেমে একটা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করতে চাইলো। দরজা বন্ধ। খোলা গেল না। মেয়েটি দেয়ালে গা মিশিয়ে আকাশের দিকে তাকালো। পরিচিত বম্বারের বদলে সে এক ধরনের উড়ন্তচাকী দেখলো। নীল আকাশের গায়ে বর্তুলাকৃতির ধাতব বিন্দু। তার মনে হলো তাকে যেন কেউ লক্ষ্য করছে। মাসখানেক পরে একরাত্রে মেয়েটি এক শহরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। এমনি সময়ে আকাশে অন্য গ্রহচারী যান্ত্রিক যানের আবির্ভাব ঘটলো। আকার ইস্পাতের তৈরী সিগারের মত। একটা যন্ত্র মেয়েটিকে লক্ষ্য করেই এগিয়ে এল। সাহসের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটি। যন্ত্রটি নীল-সাদায় মেশানো বৃত্তাকার চোখের মত দেখতে। ...তাকাতেই মেয়েটির মুখ আগুনে ঝলসে গেল। হাসপাতালে নিতে হল তাকে।

সত্যি ঘটনা নয়, তোমার মত একটি সুন্দরীর স্বপ্ন। ইয়ুং-এর এক রোগিণীর। এই স্বপ্নটি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ফ্রয়েড ও ইয়ুং-এর দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য পরিষ্কারভাবে বিবৃত করা চলে।

ফ্রয়েডের মতে প্রথম স্বপ্নটি উদ্বেগ-স্বপ্ন। এখানে উড়ন্তচাকীটি মাতৃ-জঠরের প্রতীক। রোগিণী সেই শান্তিময় মাতৃজঠরে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল। দ্বিতীয় স্বপ্নে দৃষ্ট উড়ন্তচাকীর সিগার-আকৃতিই তার যৌন-প্রতীকতার পরিচায়ক। ইয়ুং বলবেন—এহ বাহ্য। ফ্রয়েড স্বপ্নের মর্মরহস্য উদ্ঘাটনে অক্ষম। এই স্বপ্ন আসলে ধর্মভিত্তিক। ইউ. এফ্. ও.—প্রাগৈতিহাসিক যুগের সূর্যচক্র, যাদুচক্র, মিশরীয় দেবতা হোরাসের চোখ। বাইবেলের এলিজা স্বর্গ থেকে পাপ-অনুসন্ধানী

দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে মর্তের দিকে। উড়ন্তচাকী প্লেটো বর্ণিত বিশ্ব-আত্মা-যীশুর বিশীর্ণ তাপপীড়িত দেহের ভাস্বর দীপ্তি। ইয়ুং-এর মতে—"the traditional circular eye of God, which 'all seeing' searches the hearts of men." এই যন্ত্রবিজ্ঞানের যুগে ঈশ্বর ও ঐশ্বরিক সবকিছু যান্ত্রিক-প্রতীকরূপে প্রকাশমান। উড়ন্তচাকীতে গ্রহান্তরের অতিথির আবির্ভাব ঘটছে কি না —এ প্রশ্ন ইয়ুং-এর কাছে অবান্তর। এই স্বপ্ন রোগিণীর মনে গভীর ধর্মভাবের পরিচায়ক। জীবনের পরিপূর্ণতা অন্যলোকে অবস্থিত অলৌকিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। অসংখ্য মানুষ উড়ন্তচাকীর অস্তিত্বে বিশ্বাসী—এর মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যই তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সেই তাৎপর্য কি? ধর্মের তাৎপর্য কি? জীবনের পরিপূর্ণতা, অখণ্ডতা, সম্পূর্ণতা সকল ধর্মের লক্ষ্য। তারই জন্য মানুষের চিরন্তন আকুতি। আমরা স্বর্গের দিকে তাকাই মহাপুরুষের আবির্ভাবের জন্য; বিশেষ করে—যখন জাগতিক জীবনে জটিলতা বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি পায়। সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মধ্বজীদের 'সিভিল ওয়ারের' সংকটজনক পরিস্থিতিতে ইয়োরোপের মানুষ নাকি হলুদ রঙের চাকতি আকাশপথে উড়তে দেখেছিল। এই উড়ন্তচাকী তাদের কাছে সংকটের আসন্ন সমাধানের ইঙ্গিত বলে প্রতিভাত হয়েছিল। আজও বিশ্বব্যাপী বিচ্ছিন্নতা সংঘর্ষ অরাজকতা। মানুষ এর অবসান চায়। তার অভিলাষের প্রতিফলন তার স্বপ্নে, তার বিশ্বাসে। উড়ন্তচাকী ঈশ্বরের দূত, বার্তা, ইশারা, যাই হোক না কেন, তার অস্তিত্বে বিশ্বাস মানুষের কাছে ইতিবাচক, আশ্বাসব্যঞ্জক। মানবজাতির নিরাপত্তার প্রতীক এই জাতীয় ধর্মবিশ্বাস। ইয়ুং তাই মনে করেন।

কেন ইয়ুং-এর প্রতি তোমার পক্ষপাতিত্ব—এবার বুঝতে পারছ কি? উড়ন্তচাকী তোমার কাছে, ভারতীয়ের কাছে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নয়, ভারতীয় ধর্ম বা দর্শনের কোনো কিছুর প্রতীক নয়; তুমি বলবে। তোমার স্বপ্নে উড়ন্ত-চাকীর দর্শন মেলে না একথা হয়ত ঠিক। ষাঁড়ে তাড়া করেছে, তুমি ছুটতে ছুটতে পথ হারিয়ে ফেলেছ—এই স্বপ্নটা এক সময় তুমি খুব দেখতে। কোনো এক ফ্রয়েডিয়ানের যৌনমূলক ব্যাখ্যা শোনবার পর তোমাকে আমি ইয়ুং-এর বই পড়তে দিয়েছিলাম। ফ্রয়েডিয়ানের ব্যাখ্যায় তোমার মনে রাগ ও ঘৃণার উদ্রেক হয়েছিল: ইয়ুঙ্গিয়ানের সম্ভাব্য ব্যাখ্যায় তুমি অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করেছিলে। মনে আছে, ষাঁড়টার চোখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছিল। ঈশ্বরের

অনুসন্ধানী চোখ কিম্বা উড়ন্তচাকীর গোলাকার নীল সাদা আলোর বৃত্তের সঙ্গে অনেকটা মিলে যায় না কি? বৃষভ মহেশ্বরের বাহন। তিনি তৃতীয় নয়ন দিয়ে মনের অন্তঃস্থল পর্যবেক্ষণ করেন। আর উড়ন্তচাকীও কি তোমার আমার কাছে পুরোপুরি বিজাতীয়? সুদর্শন চক্রের সঙ্গে কোন সাদৃশ্য নেই কি? ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় যুগে যুগে চক্রধারীর আবির্ভাব ভারতীয় হিন্দুমাত্রেই কামনা করে না কি? অন্তরীক্ষ থেকে সুদর্শন চক্র নেমে আসুক, অত্যাচারী শিশুপালের শিরশ্ছেদ ঘটিয়ে পাপের অবসান ঘটাক—এ স্বপ্ন তুমি জাগ্রত অবস্থাতেই দেখে থাক নিশ্চয়ই। ইয়ুঙীয় শাস্ত্রে পাবে আরো কত সব ভালো ভালো কথা। অসম্পূর্ণতা দূর করা, অখণ্ড সত্তার প্রকাশ, সীমার মাঝে অসীমের সন্ধান ইত্যাদি। ইয়ুঙ্গিয়ানদের এই সব ধর্মীয় বাণী ও শুভেচ্ছা ভারতীয় রমণীকে যে আকৃষ্ট করবে এ আর বিচিত্র কি? যতই আধুনিকা হও না কেন, যতই বিজ্ঞানের চর্চা কর না কেন, যতই জোর গলায় অস্বীকার কর না কেন, তোমার মন এখনও পুরণো সংস্কারের আওতা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি।

আমি অনুমান করতে পারছি তোমার উষ্মার তীব্রতা! আবহাওয়াবিদ না হয়েও ঐ সুন্দর আননের ভাবান্তর দেখে বলতে পারি—বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। এ যুগের সব থেকে বড় গালাগালি বোধহয় তোমাকে দিয়ে বসেছি। 'পুরণো সংস্কার থেকে মুক্ত হওনি'—একথা শুনলে তোমায় বয়সী সব ছেলে-মেয়েরই ক্রোধে জ্বলে ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু কথাটা মিথ্যে নয় মোটেই। আর এতে ক্রুদ্ধ হবার কিছু নেই, লজ্জা পাবারও কারণ নেই। হাজার হাজার বছরের পুরণো সংস্কার, যে সংস্কার লক্ষ লক্ষ নর-নারী প্রতিদিন আচরণের ও রিচুয়াল (ritual)-এর মধ্যমে সযত্নে লালন পালন করছে; তার রেশ শুধু তোমার কেন, অনেক চরম চার্বাকপন্থী, মোক্ষম মার্কসপন্থীর গোপন মনেও স্পন্দমান।

দুর্বলতা যদি মনে করো, আর যদি তা থেকে মুক্ত হতে চাও, তবে দুর্বলতাকে অস্বীকার কোরো না। শুধু বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক বা প্রায়োগিক দিকের নয়, পুরোপুরি বিজ্ঞানানুগ সামাজিক পরিবেশ তৈরী না হওয়া পর্যন্ত পুরণো ধর্মীয় বিশ্বাস জনসাধারণের একাংশের মনে জেগে থাকবে, আর সেগুলো অংশত তোমার মত অসাধারণকেও প্রচ্ছন্নভাবে হলেও প্রভাবিত করবেই। আর আমার মত self-appointed সমাজসেবীরা তোমার মত তরুণ-তরুণীদের এই প্রভাব থেকে মুক্ত করবার জন্য এমনি ভাবেই জ্ঞানবিতরণ করতে থাকবে।

ফ্রয়েড ইয়ুংকে নস্যাৎ করার কোনো অভিপ্রায় আমার নেই। তাঁর করতে চাইলেই বা পারবো কেন? সে শক্তি আমার কোথায়? তাঁরা সমাজ-ইতিহাসের এক অধ্যায়ের সঙ্গে বিশেষভাবে সংযুক্ত হয়েছিলেন। সেই অধ্যায়ের শেষে ভাববাদের প্রাধান্যান্তে তাঁরা হয়ত মনোবিজ্ঞানের ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করবেন না; কিন্তু মনোবিদ্যার ইতিহাসে তাঁরা নিশ্চয়ই অনেকদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তবে অতীন্দ্রিয় জগতের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ কোনদিন বিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসা উদ্রেক করবে কি না—এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অনেক তথাকথিত অলৌকিক ঘটনা বিজ্ঞানের আলোতে রহস্যময়তা হারিয়ে লৌকিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রামাণ্য সত্যে পরিণত হবে। আবার অনেক অলৌকিক ঘটনা, অবাস্তব অতিকথা, উন্নততর সমাজে অবিশ্বাস্য অপাঙ্‌ক্তেয় ও পরিত্যাজ্য বলে পরিগণিত হবে। মনোবিজ্ঞানের শৈশব এখনও অনতিক্রান্ত, এখনও অনেক কিছু অনায়ত্ত; তা বলে আজকের দুর্বোধ্য কোনো ঘটনাকে আমরা অতীন্দ্রিয় শক্তির বিকাশ ভেবে নার্কোটিক সেবনে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করবো না। বৈজ্ঞানিক সত্য, পরীক্ষিত সত্য, প্রায়োগিক সত্যকে আমরা প্রচার করবো আর বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কারের আলোতে দুর্বোধ্য ঘটনা সুবোধ্য ও অন্ধকারাবৃত মনোকন্দরকে রহস্যতামসোত্তীর্ণ করবার চেষ্টা করবো।

(৬)

এইবার তোমার দুরূহতম প্রশ্ন দুটির উত্তর দেবার চেষ্টা করা যাক। প্রথম: কোটি কোটি মানুষ যে বিশ্বাস নিয়ে কুম্ভমেলায় মিলিত হয়, সাগরস্নানের জন্য আগ্রহী হয়, সেই বিশ্বাসকে আমরা কোন দৃষ্টিতে দেখব? অনেকদিন ধরে অনেক মানুষের একত্রে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনকে আদিপ্রতিমার প্রতিফলন কল্পনা করে রহস্যমুগ্ধ দৃষ্টিতে অবলোকন করব? না সংস্কার ও অভ্যাসের অন্ধ ক্রীতদাসদের এই অর্থহীন আচরণকে, এই মূঢ়তা অজ্ঞতাকে অবজ্ঞার চোখে দেখব? দ্বিতীয়: আমাদের কোন সমষ্টিগত আচরণ বা স্বপ্ন 'মহামানব'-এর আগমনীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন?

আমার উত্তর তোমাকে তৃপ্তি দেবে কি না জানি না। তবু উত্তর একটা আমাকে দিতেই হবে। আবহমান কাল থেকে অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কোটি কোটি মানুষ যদি কোনো আচরণ পালন করে, তা হলেই সেই আচরণ

সত্য বা সুস্থ আচরণ হয়ে ওঠে না। তোমার আদিপ্রতিমার প্রতিফলনের কল্পনায় 'নষ্টালজিয়া' আসতে পারে, আমার আসবে না। অজ্ঞতা-মূঢ়তাকে কোন মতেই প্রশ্রয় দেবনা। তা বলে এই আচরণকে, এই সমষ্টিগত ধর্মীয় 'কমপালশন'কে অবহেলা বা সিনিকের দৃষ্টিতে দেখবারও অধিকার আমার নেই। ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'রিচুয়াল' যখন 'কমপালশনে' দাঁড়ায়, তার মস্তিষ্ককোষের দুর্বলতা, তার নিরাপত্তার অভাব, তার উদ্বেগ উৎকণ্ঠার পরিমাণ নিয়ে আমরা বিস্তারিত অনুশীলন করি: সমবেদনায় আকুল হই। তার 'কমপালসিভ' আচরণের মনস্তাত্ত্বিক অর্থ আবিষ্কার করার চেষ্টা করি। তাকে এই আচরণের নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে প্রয়াস পাই। তাকে সম্বর্ধনা জানাই না, আবার মূঢ় অপদার্থ বলে ভর্ৎসনাও করি না। সমষ্টির ক্ষেত্রেও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যতক্ষণ সমষ্টিআচরণ উন্মাদনার বা অসামাজিকত্বের পর্যায়ে না পড়ে, গণ-হিষ্টিরিয়ার উপসর্গ প্রকাশ না পায়; ততক্ষণ এ আচরণের বিরুদ্ধাচরণ করবার কোনো প্রয়োজন অনুভূত হয় না। কিন্তু তা বলে এই আচরণবিধি দ্বারা সমষ্টিকল্যাণ সাধিত হচ্ছে, বা ক্যাথারসিস জাতীয় কিছু সংগঠিত হচ্ছে মনে করে—এই আচরণকে সমর্থনের কোনো কারণও দেখি না।

তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর একটু চিন্তা করলে নিজেই দিতে পারতে। আগামী অক্ষয়তৃতীয়ার শুভ প্রভাতে অথবা বৈশাখী পূর্ণিমার পুণ্যরাতে মহামানবের আবির্ভাব ঘটবে—তুমি এই স্বপ্ন দেখেছ বলে যদি রটনা করতে পারো, দেখবে হাজার হাজার মানুষ অনুরূপ স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে অথবা তোমার রটনায় আকৃষ্ট হয়ে ঐ শুভপ্রভাতে, বা পুণ্যরাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। 'নেতাজীর আবির্ভাব ঘটবে'—এই স্বপ্ন দেখার লোকের সংখ্যা অনেক। আবির্ভাবের রটনায় এখনও অনেক বিশ্বাসীর মনে সাড়া জাগে। অনেক হৃদয়ে আশা জাগে। নেতাজীর আবির্ভাব সম্ভাবনা সাধারণ মানুষের কাছে ঐ মহামানবের আগমন সম্ভাবনা। 'নেতাজী' আজ মাত্র একটি নাম নয়। শুধু রাজনৈতিক নেতা নয়,—লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে নেতাজী অলৌকিক শক্তির প্রতীক। 'নেতাজী' ক্রমশ 'লিজেণ্ডারী মিথ' হয়ে উঠছেন, অতিকথায় পর্যবসিত হচ্ছেন। ইতিহাসপূর্বযুগে বাস্তব ধীরে ধীরে এইভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। লৌকিক সত্য ক্রমশ অলৌকিকত্ব লাভ করেছে। কিন্তু আজ এর বিরুদ্ধ-শক্তিও সক্রিয়। ভ্রান্তবিশ্বাস, অমূলক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক শক্তি আজ ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে। অলৌকিক

ভ্রান্ত বিশ্বাস সাময়িক সান্ত্বনা দিতে পারে কিন্তু বাস্তবকে পরিবর্তিত করতে পারে না। উড়ন্তচাকীর বা নেতাজীর অস্তিত্ব ইয়ুং-এর কাছে বড় কথা নয়—অগণিত মানুষের বিশ্বাস তাঁর কাছে বড় কথা। রহস্যময় রটনা, অমূলক বিশ্বাস তাদের মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য সত্ত্বেও, নিশ্চয়ই খণ্ডনযোগ্য। বিশ্বাসীদের ভ্রান্তি-নিরসনের জন্য তথ্যমূলক যুক্তি-নির্ভর প্রচারের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন।

অলৌকিকত্ব ও রহস্যময়তার প্রতি আকর্ষণ বিজ্ঞানের যুগে ক্রমক্ষীয়মান হওয়া সত্ত্বেও কৌশলী প্রচারক ও সংরক্ষণশীল পত্র-পত্রিকার দৌলতে সরলবিশ্বাসীর মন এখনও মোহাচ্ছন্ন। বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যায়ত্ত নয় এইরকম ঘটনার সংস্পর্শে আসতে যেন আমরা উদগ্রীব। এইরকম অলৌকিক ঘটনার সংস্পর্শে এসে আমরা যেন সত্যিই যুক্তিবুদ্ধি হারাতে ভালবাসি। এইত সেদিনের কথা ভোলনি নিশ্চয়ই। সর্বভারতীয় সংবাদপত্রে জনৈক যোগীর সম্পর্কে ঢক্কানিনাদ। অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। অলৌকিক কাণ্ড। মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অবহেলা। যীশুর পর এই ঐশী ক্ষমতা প্রদর্শন আর কারুর দ্বারা সম্ভব হয় নি। জলের উপর দিয়ে হেঁটে যাবেন যোগিবর; অথচ পা ভিজবে না। এর আগে এই যোগী সম্পর্কে যে সব প্রশস্তি প্রকাশিত হয়েছিল তার দুটো হেড লাইন মনে করিয়ে দিচ্ছি। "ধনীশ্রেষ্ঠা রমণী যোগিশ্রেষ্ঠের পদমূলে", "যোগী ও মারলিন মনরো", "যোগীর সাক্ষাৎ-প্রার্থী কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক নেতা", "বার্তাজীবীদের আসরে যোগিবর।" অলৌকিক বিশ্বাস মানুষের মনে বেঁচে থাকলে সমাজের একাংশ নিঃসন্দেহে লাভবান হতে পারেন—এই ঢক্কানিনাদ থেকে সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। কাজেই ১০১'০০ থেকে ৫০১'০০ মূল্যের সব কয়খানি দর্শক আসনই যে পূর্ণ হয়ে যাবে বিচিত্র নয়।

অবশেষে সেইদিন—১২ই জুন ১৯৬৬ এসে গেল। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনের রিপোর্টাররা হাজির। চিত্র-তারকা, ধনী ব্যবসায়ী, হোমরা চোমরা রাজকর্মচারী ও তাদের মত সৌভাগ্যবান কিছুসংখ্যক দর্শক নিঃশ্বাস রোধ করে নিজের নিজের আসনে উপবিষ্ট। স্ফটিক স্বচ্ছ জলরাশি পদস্পর্শে ধন্য হবার জন্য উদগ্রীব। যোগীবর প্রবেশ করলেন।… কি দারুণ 'য়্যান্টিক্লাইম্যাক্সে' এই অতি নাটকীয় প্রস্তুতির পরিসমাপ্তি ঘটেছিল নিশ্চয়ই মনে আছে। যোগীবর তোমার আমার মত সামান্য মানুষের ন্যায় মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কাছে পরাজিত হলেন। আত্মিক শক্তির কাছে প্রকৃতির নিয়ম হার মানলো না।

কিন্তু যোগীবর লজ্জিত হলেন না। তাঁর অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনের তারিখ ক্রমশ পিছিয়ে দিতে লাগলেন। আজও শক্তি প্রদর্শিত হয়নি। দু'তিন বছর ধরে আর এক যোগী সংবাদপত্রের শিরোনামায় স্থান পাচ্ছেন। এঁর সম্বন্ধে 'মানবমন'-এর পাতায় উল্লেখ দেখেছ বোধ হয়। ইনি একাধারে ঋষি এবং যোগী। ইনি একটু বেশি বুদ্ধিমান, অনেক বেশি ব্যবসায়ী। যোগবলে প্রাকৃতিক শক্তিকে পরাভূত করার মত তামাসা প্রদর্শনের চেষ্টা করেন না। 'বিটল' ও 'পপ্‌-সিঙ্গার' তাঁর আরামপ্রদ. আশ্রমের প্রতি বিশেষভাবে আসক্ত। তিনি "transcendental meditation" শিক্ষা দিচ্ছেন। ধ্যানযোগে তুরীয় অবস্থা প্রাপ্তি। এ অবস্থায় পৌছুনোর জন্য আর তোমাকে কষ্ট করে এল. এস. ডি, মেসকালিন সংগ্রহ করতে হবে না। সামাজিক অসাম্য ঘোচাবার সহজতম পথ! তুরীয়ানন্দ লাভের পথ! এই আবিষ্কার এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। মার্কস, লেনিন, গান্ধী, টলষ্টয়, মাও, মার্কুসেব সমপর্যায়ে উঠেছেন এই মহর্ষি। ধন্য সংবাদপত্রের প্রচারকৌশল। ধন্য ডলার-ষ্টার্লিং-মার্কের খেলা!

অলৌকিকত্বের মোহ, আদিপ্রতিমার আকর্ষণ কতখানি সমষ্টিনির্জ্ঞানের ব্যাপার আর কতখানি ব্যবসায়ী কৌশল, এইবার বোধহয় তোমার বুঝতে কষ্ট হবে না। কিন্তু যাদের আমরা অশিক্ষিত জনসাধারণ মনে করি, তাদের আকর্ষণ করা এই সব যোগিদের উদ্দেশ্য নয়। তারা তত্ত্ব শিক্ষায় তোমার আমার থেকে হয়ত পিছিয়ে আছে, কিন্তু সহজবুদ্ধিতে তারা একটুও কম নয়। মহারাজ, যোগিরাজের কর্মস্থল শেঠ-সওদাগরদের শহর নগর এবং এদের দালাল নতুন আলোকপ্রাপ্ত নিওলাইটের দল। অলৌকিকত্বে বিশ্বাস, অতিমানবতায় আস্থা শুধু সমষ্টি নির্জ্ঞানাশ্রিত প্রজাতি স্বপ্ন বলে যারা মনে করেন আমি তাঁদের দলে নই। এই বিশ্বাস, এই অবস্থাকে বজায় রাখবার জন্য মোটা ও সূক্ষ্ম দুরকমের প্রচার ব্যবস্থাই বর্তমান। এইটে তোমাকে বুঝিয়ে বলবার জন্যই পুরণো কাহিনী দুটো আবার বলতে হল।

এবার আমেরিকাতে সাম্প্রতিক কালে স্বপ্ন নিয়ে যন্ত্রনির্ভর যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার চেষ্টা করবো। ওরা যাকে বলে ফ্রয়েডোত্তর স্বপ্ন-সমীক্ষা।

স্বপ্নসমীক্ষাব গুরুত্ব যথেষ্ট। ফ্রয়েডোত্তর স্বপ্ন-সমীক্ষা নিয়ে বেশ কিছু বই বেরিয়েছে। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত এডুইন ডায়মণ্ডের লেখা 'দি সায়েন্স

অফ্ ড্রিমস্' বইটিতে সংক্ষেপে অনেক কিছু বলা হয়েছে। অধ্যাপক ক্যালভিন হালে আমেরিকাতে স্বপ্ন নিয়ে অনেক কাজ করেছেন। প্রায় দশহাজার স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে একটা সর্বস্বীকৃত ব্যাখ্যাক্রম ও প্রতীক নির্ধারণের চেষ্টার মধ্যে যথেষ্ট বাহাদুরি আছে। তাঁদের ব্যাখ্যা গ্রহণে আমার আপত্তি ও অক্ষমতার মধ্যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে কিনা পাঠকরা বিচার করবেন।

[৭]

আমি প্রধানত এঁদের তথ্যবিবরণই তোমাকে শোনাচ্ছি। অবশ্য আমার নিজস্ব মন্তব্য সমেত। আলোচনা প্রসঙ্গে কিছু পুনরুক্তি করতে বাধ্য হচ্ছি। তা না হলে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যাবে না।

স্বপ্নবিজ্ঞানের বয়স খুবই কম। এই শতাব্দীর পঞ্চাশের পর থেকে স্বপ্ন নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষানিরীক্ষার শুরু। অবশ্য, এর পঞ্চাশ বছর আগে সিগমুণ্ড ফ্রয়েড-এর 'দি ইণ্টারপ্রিটেশন অফ ড্রিমস' প্রকাশিত হয়, এবং স্বপ্নসমীক্ষা সাধারণের মধ্যে বিশেষ ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করে। শিল্পীসাহিত্যিক, নাট্যচলচ্চিত্র পরিচালকরা ফ্রয়েডীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ফ্রয়েডীয় স্বপ্নপ্রতীকের সাহায্যে অবদমিত ইচ্ছার রূপায়ণে তৎপর হয়ে ওঠেন। সাম্প্রতিককালে ফ্রয়েড-অনুরাগীর সংখ্যা কিছু হয়তো হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু পশ্চিমী সংস্কৃতিতে এখনও ফ্রয়েডের প্রভাব সর্বাধিক। আমি এবং আমার মতো বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী বিজ্ঞান-কর্মীরা অন্তর্দর্শনভিত্তিক 'সাইকো-এ্যানালিটিক' তত্ত্বকে, এর জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও, বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব মনে করি না। ফ্রয়েড, আমার মতে, মেটাসাইকলজির প্রবর্তক। কাজেই, বলা চলে, ফ্রয়েডোত্তর কালের স্বপ্ন-গবেষণা থেকেই স্বপ্ন-বিজ্ঞানের সূত্রপাত।

আদিম যুগ থেকে মানুষ স্বপ্ন নিয়ে, বিশেষ করে স্বপ্নব্যাখ্যা নিয়ে, কৌতূহল প্রকাশ করে আসছে। স্বপ্ন নানাভাবে মানুষের চিন্তাভাবনা, জীবনযাত্রাপ্রণালীকে প্রভাবিত করেছে। মানুষ স্বপ্নের মধ্যে ঈশ্বরের আদেশ, ভবিষ্যতের নির্দেশ খুঁজেছে, স্বপ্নব্যাখ্যার জন্য পুরোহিত ধর্মযাজকের শরণাপন্ন হয়েছে, স্বপ্নের মধ্যে গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের ভালোমন্দের ইঙ্গিত পেয়েছে। রোগনির্ণয়ের ও রোগনিরাময়ের উপায় হিসেবে স্বপ্নের ব্যবহার সব দেশেই প্রচলিত ছিল, এখনও আছে। স্বপ্নাদ্য মাদুলি ও ওষুধের চাহিদা অতিসভ্য মানুষের মধ্যে আজও রয়েছে।

'প্রফেটিক ড্রিম' সম্পর্কিত দুর্বলতা মানুষের আজও কাটে নি। এব্রাহাম লিঙ্কন আততায়ীর হাতে নিহত হবার কয়েকদিন আগে যে স্বপ্নটি দেখেছিলেন, তার উল্লেখ বিশ্বাসীরা আজও সগর্বে করে থাকেন [১]। অলোকদৃষ্টি (ক্লেইরোভয়েন্স) আজ পুরোহিত ধর্মযাজকের দপ্তর ছেড়ে প্যারাসাইকলজিষ্টদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের একজন ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট' গার্ডনার মারফি কয়েকবছর আগে এক পুস্তকে অনেকগুলো 'প্রফেটিক ড্রিম'-এর বিবরণ প্রকাশ করেছেন। চল্লিশ বছর আগে লিণ্ডবার্গের শিশুপুত্র হরণের কাহিনী তোমার হয়তো মনে আছে। সে সময় হার্ভার্ডের সাইকোলজি-কাল ক্লিনিক থেকে সংবাদপত্রে বিবরণ দিয়ে এই অপহরণ-সংক্রান্ত স্বপ্ন সংগ্রহ করা হয়। ১৩০০ স্বপ্নের মধ্যে মাত্র সাতটিতে যে ভাবে শিশুর মৃত দেহটি পাওয়া যায়, সে সম্পর্কে খানিকটা আভাস ছিল [২]। তা সত্ত্বেও, সাইকিক্যাল রিসার্চ বা প্যারা-সাইকলজির গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নি। এক হাজারের মধ্যে একটা স্বপ্নও যদি ভবিষ্যতের বার্তা বহন করে আনে, তবে সেই একটাকেই সাধারণ মানুষ মনে রাখে। ভাববাদ রহস্যবাদ প্রভাবিত মানুষের পক্ষে এই মনোভাবই স্বাভাবিক।

স্বপ্ন এক সময় শিল্পীসাহিত্যিকদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। কিছু হিষ্টিরিক টাইপের কবি ও শিল্পী স্বপ্নের মধ্যে সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছেন। মাদুলি ওষুধের মতো অত বেশি না হলেও স্বপ্নাদ্য কবিতা-গল্পের সংখ্যা খুব কম নয়। রোমাণ্টিক যুগের কবিরা নাইট গাউনের উপর স্বপ্নে পাওয়া কবিতার লাইন লিখে রাখতেন। কবি কোলরিজ তাঁর অতি-পরিচিত কুবলা খাঁ-কে (১৮৯৭) স্বপ্নাদ্য কবিতা বলে দাবি করেছেন। রবার্ট লুই ষ্টিভেনসনের অধিকাংশ গল্পের প্লটই নাকি স্বপ্নাদিষ্ট। জেকিল হাইড-এর আখ্যানভাগ স্বপ্নে পাওয়া। ষ্টিভেনসন মনে করতেন যে, স্বপ্নের 'ছোট মানুষরা' (লিট্‌ল পিপ্‌ল) তাঁর সাহিত্যের জনক।

রোমাণ্টিক কবিতা অথবা ভূতুড়ে গল্পই শুধু স্বপ্নে পাওয়া গেছে ভাবলে ভুল হবে। কিছু কিছু উঁচুদরের বিজ্ঞানচিন্তাও বৈজ্ঞানিকরা স্বপ্নে পেয়েছেন বলে দাবী করেন [৩]। পুরণো কথা না হয় ছেড়ে দিলাম। ১৯৩৬ সালের একজন নোবেল লরিয়েট তাঁর আত্মজীবনীতে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, তাঁর নোবেল পুরস্কার পাওয়া আবিষ্ক্রিয়ার মূলে ছিল স্বপ্ন [৪]। ১৯২১ সালে তিনি অনুমান করে-

ছিলেন যে নার্ভস্পন্দন-সম্প্রসারণ ঘটে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে। প্রমাণ করার মতো পরীক্ষানিরীক্ষার হদিশ পেলেন অনেক বছর পরে, ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের মাধ্যমে। বৈজ্ঞানিকরাও সংস্কারমুক্ত নন।

এই সব 'ক্রিয়েটিভ ড্রিম', 'প্রফেটিক ড্রিম'-এর মতোই অনেকদিন ধরে মনস্তাত্ত্বিকদের ধাঁধার মধ্যে রেখেছে, রহস্যবাদকে প্রশ্রয় দিয়েছে। গত কয়েক-বছর ধরে স্বপ্নবিজ্ঞানের যেসব পরীক্ষানিরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার ফলে আমরা এখন স্বপ্ন সম্পর্কে অনেকটা স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করেছি, সৃজনক্রিয়ার স্বরূপ ধরতে পেরেছি। তাছাড়া এখন মস্তিষ্কবিজ্ঞান মনে রাখা, ভুলে যাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারের উপর নতুন আলোকপাত করেছে। মস্তিষ্কভিত্তিক বস্তুবাদসম্মত মনোবিজ্ঞান এখন অনেক রহস্যের সমাধানে সক্ষম। এডুইন ডায়মণ্ড-এর ছোট বইটিতে ফ্রয়েডোত্তর যুগের পরীক্ষানিরীক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে, পরীক্ষকরা যেসব নতুন তথ্য সংগ্রহ করেছেন তার পরিচয় আছে, এবং এই সব তথ্যকে ভিত্তি করে নতুন যে সব তত্ত্ব গড়ে উঠছে তার আলোচনা আছে। আমরা প্রথমে তথ্যগুলির উল্লেখ করে তোমার পুরনো ধারণাগুলো দূর করার চেষ্টা করব এবং তারপর নতুন তত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করব। এই প্রসঙ্গে পাভলভ-এর আবিষ্কৃত নিস্তেজনা প্রসঙ্গের অবতারণা এসে পড়বে। দুঃখের বিষয়, আলোচ্য লেখক পাভলভতত্ত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি নীরব থেকেছেন।

স্বপ্ন নিয়ে যন্ত্রনির্ভর পরীক্ষানিরীক্ষার প্রথম উদ্যোক্তা শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবৃত্তের অধ্যাপক নাথানিয়েল ক্লাইটম্যান। ১৯২৯ সালে বার্জার ইলেকট্রো-এনসেফালোগ্রাম সম্পর্কিত প্রথম রিপোর্ট প্রকাশ করেন। পাঁচ বছরের মধ্যেই ক্লাইটম্যান স্বপ্ন-সমীক্ষায় এই যন্ত্রের-সাহায্য গ্রহণ করেন। যন্ত্রটিকে আরো দু-একটি বাড়তি বন্দোবস্তের সাহায্যে স্বপ্ন-সমীক্ষায় বিশেষ উপযোগী করে গড়ে তোলা হল; যাতে একই চার্টে মস্তিষ্কের বিদ্যুৎতরঙ্গের পাশাপাশি শ্বাস-প্রশ্বাস, ঘুমন্ত দেহের নড়াচড়া, এবং চোখের কাঁপনের গতিবেগ নির্ণয় সম্ভব হতে পারে। ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাম সম্বন্ধে দু-একটি প্রাথমিক তথ্য জানা থাকলে ক্লাইটম্যানের পরীক্ষানিরীক্ষার তাৎপর্য অনুধাবন সহজ হবে। জার্মানীর এক স্নায়ুতত্ত্বের অধ্যাপক হান্স বারজার উদ্ভাবিত মস্তিষ্কের বিদ্যুৎতরঙ্গ পরিমাপের এই যন্ত্রটির কাজ মস্তিষ্কের বিদ্যুৎতরঙ্গকে প্রায় দশ লক্ষ গুণ শক্তিশালী করা এবং

একটি গ্রাফ-পেপারের উপর একটি পেন্সিলের সাহায্যে তার প্রতিলিপি ফুটিয়ে তোলা। জাগ্রত ঘুমন্ত বিশ্রান্ত—ইত্যাদি মস্তিষ্কের বিভিন্ন অবস্থায় কাগজের উপর বিভিন্ন ধরনের লেখা দেখা যাবে। জাগ্রত অবস্থায় চোখ বন্ধ থাকলে যে লেখা পাওয়া যায় (সেকেণ্ডে স্পন্দনসংখ্যা আট থেকে তের) তার নাম এ্যালফা রিদম্। গভীর ঘুমে স্পন্দনচক্রগুলো ধীরগতি ও বড় হয়ে দেখা দেবে এবং স্পন্দনসংখ্যা হবে সেকেণ্ডে আধ থেকে দুই। এর নাম ডেলটা রিদম্। কোনো বিষয়ে মনঃসংযোগ করলে বিদ্যুতের স্পন্দন একেবারে থেমে যাবে।

চোখের তারা ঘুমের মধ্যে ধীরে ধীরে এদিক ওদিক ঘোরে, বাচ্চাদের ঘুমন্ত অবস্থায় পর্যবেক্ষণের ফলে এ খবর ক্লাইটম্যানের জানা ছিল। ঘুমন্ত মানুষের চোখের তারার কাঁপনের অন্য একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেন গবেষক। ঘুমিয়ে পড়ার প্রায় নব্বই মিনিট পরে চোখের তারা খুব দ্রুত এবং জোরে জোরে নড়তে শুরু করে। দুটো চোখই একই সময়ে একই দিকে ঘোরে, মনে হয় তারা যেন টেনিস খেলা দেখছে। এই দ্রুত চোখের তারার ঘোরা বেশ কিছুক্ষণের জন্য চলে। এই ঘোরার নাম দেওয়া হয়েছে 'র‍্যাপিড আইমুভমেণ্ট', সংক্ষেপে আর-ই-এম। এই সময় জাগিয়ে দিলে প্রায় শতকরা নিরানব্বই জন বলবে তারা স্বপ্ন দেখছে। দেহের অন্যান্য পরিবর্তন এবং বিদ্যুৎ-তরঙ্গলেখা দেখে মনে হবে তারা যেন জেগে রয়েছে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ও ধমনীর গতিবেগ আর ঘুমন্ত অবস্থার মতো নেই। রক্তচাপ ও আনুষঙ্গিক দৈহিক ক্রিয়াকলাপ নিয়মিতভাবে ওঠা নামা করতে থাকে, প্রক্ষোভতাড়িত হলে বা দৈহিক পরিশ্রমের সময় যেমন হয়। ভেতরে তুলকালাম কাণ্ড চলছে, অথচ বাইরে থেকে সেটা বোঝা যাবে না। নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে ঘুমন্ত মানুষটি। পেশীগুলো নরম তুলতুলে, মাথা ও চিবুককে ঠিক জায়গায় রাখতে পারছে না ঘাড়ের পেশী। এই আর-ই-এম প্রথম দিকে প্রায় নয়/দশ মিনিট স্থায়ী হয়। যত রাত গভীর হবে, আর-ই-এম বা স্বপ্নকাল ততই দীর্ঘস্থায়ী হবে। আটঘণ্টা ঘুমের মধ্যে নিয়ম করে আমরা প্রায় পাঁচবার স্বপ্ন দেখি ; মোট স্বপ্ন দেখার সময় প্রায় দেড় ঘণ্টা। বলা বাহুল্য, 'র‍্যাপিড আই মুভমেণ্ট'-এর সময় ছাড়া অন্য সময় ঘুম ভাঙলে কোনো মানুষই স্বপ্নের কথা বলবে না। এই থেকে গবেষকরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে আমাদের স্বপ্ন দেখার সময় ছক কাটা, পূর্বনির্ধারিত।

আর-ই-এম পর্বে ঘুম ভাঙানোর পর যাঁরা স্বপ্নবৃত্তান্ত বলতে পারেন, পুরো ঘুমের পর সকালে উঠে তাঁরাও কিন্তু কোনো স্বপ্নই মনে আনতে পারেন না।

ল্যাবরেটরিতে স্বেচ্ছাসেবক ডেকে অথবা পয়সা দিয়ে মানুষ সংগ্রহ করে, তাদের উপর এইসব জটিল যন্ত্রপাতি-নির্ভর পরীক্ষা চালানো হয়েছে। এই পরীক্ষার ফলে অনেক তথ্য জানা গেছে। স্বপ্নবৃত্তান্ত যথাযথভাবে জানবার বা জানাবার কোনো নিশ্চিত পদ্ধতি এর আগে ছিল না। সমীক্ষাধীন ব্যক্তিকে আর-ই-এম পর্বে ঘুম ভাঙিয়ে শুধু যে স্বপ্নবৃত্তান্ত জানা গেল তাই নয়, ঘুম ও স্বপ্নের আরো অনেক ব্যাপারে আলোকপাত সম্ভব হল। কতবার স্বপ্ন দেখি, কতক্ষণ ধরে স্বপ্ন দেখি, স্বপ্ন দেখার সময়কার শারীরবৃত্তের খুঁটিনাটি ইত্যাদি অনেক প্রশ্নের উত্তর মিলল। যাঁরা কোনো স্বপ্ন দেখেন না বলে মেরীর নামে শপথ করতে রাজি ছিলেন, তাঁরাও আর-ই-এম পর্বে ঘুম ভাঙানোর পর স্বপ্ন-বিবরণী শুনিয়ে চমক লাগালেন, নিজেরাও চমকে গেলেন।

ক্লাইটম্যানরা দাবি করেন যে ই-ই-জি ও আর-ই-এম সহযোগে ঘুম ও স্বপ্ন সম্বন্ধে সর্বজনীন এক নৈশ প্যাটার্নের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই প্যাটার্ন পূর্বনির্দিষ্ট, এই পূর্বনির্ধারিত পথে ঘুম ও স্বপ্নকে ভ্রমণ করতেই হবে।

তুমি যদি ক্লাইটম্যানদের সমীক্ষাধীন হয়ে গায়ে মাথায় ইলেকট্রোড আর তার লাগিয়ে ওঁদের একটা বিছানায় শুয়ে পড়ো, তা হলে প্রথমটায় তোমার চোখের সামনে ভেসে উঠবে আবছা মূর্তি, অস্পষ্ট নানারকমের আলোকরশ্মি। মনে হবে নিরালম্ব নিরাশ্রয় হয়ে তুমি শূন্যে ভাসমান। এই সময় জাগিয়ে দিলে স্বপ্ন দেখছিলে মনে হতে পারে, কিন্তু স্বপ্নবৃত্তান্ত কিছুই বলতে পারবে না। এই সময় সেকেণ্ডে দশ ঢেউয়ের এ্যালফাছন্দ অঙ্কিত হতে থাকবে বিদ্যুৎলেখ গ্রাফকাগজে। এরপর দ্বিতীয় পর্ব। ঘুম গভীর হয়ে আসছে, ই-ই-জির লেখাগুলোও বদলে যাচ্ছে। টেকো থেকে জড়ানো সুতো ছাড়িয়ে নিলে যে রকম দেখতে হয়, ঠিক সেই রকম দেখতে হচ্ছে; পরিভাষায় যার নাম 'স্লিপ-স্পিণ্ডল'। ঢেউগুলো টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, বিস্তার বাড়ছে কমছে। স্থায়িত্ব পনেরো মিনিট। ক্রমশ তৃতীয় পর্বে তুমি গভীর ঘুমে তলিয়ে যাবে। বিদ্যুৎতরঙ্গচিত্রে দেখা যাবে শ্লথগতির বড় বড় ঢেউ। ছবিটা যেন পাহাড় ও উপত্যকার। এখন সেকেণ্ডে একটা কি দুটো ঢেউ দেখা যাচ্ছে গ্রাফকাগজে, যাকে বলা হয় ডেলটা-

ওয়েভ। তিরিশ মিনিটের মতো স্থায়ী এই পর্ব। তারপর আবার দ্বিতীয় পর্ব হয়ে প্রথমে প্রত্যাবর্তন।

ঘুমিয়ে পড়ার নব্বই মিনিটের মধ্যে স্বপ্নপর্বের শুরু হবে। চোখের তারার কাঁপন দ্রুততর হচ্ছে। র‍্যাপিড আই মুভমেণ্ট দেখা যাচ্ছে। ই-ই-জি প্যাটার্ন বদলে গেছে। আগেই সে কথা বলা হয়েছে। দশ মিনিট ধরে প্রথম স্বপ্ননাট্য অভিনীত হল। স্বপ্ন শেষে তুমি আবার প্রথম পর্বে চলে যাবে। সেখান থেকে দ্বিতীয়, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয়। আবার আসবে ডেলটা-ওয়েভ। এবার ঘুম তত গভীর নয়। দ্বিতীয় পর্ব হয়ে প্রথম পর্বে প্রত্যাবর্তন এবং পরে দ্বিতীয় স্বপ্ন দেখা আরম্ভ হবে। সময় সবশুদ্ধ নব্বই মিনিট। প্রথম ঘুমের পর তিন ঘণ্টা বাদে স্বপ্নের দ্বিতীয় অধ্যায়। স্থায়িত্ব গড়ে উনিশ মিনিট। এইভাবে চলবে বৃত্তের পুনরাবৃত্তি। তৃতীয় স্বপ্ন দেখা চলবে প্রায় চব্বিশ মিনিট ধরে। শেষ স্বপ্ন দেখবে ভোররাত্রে, স্থায়ী হবে আরো বেশিক্ষণ।

আর ই-এম নিয়ে নানারকমের গবেষণা হয়েছে। শুধু শিকাগো নয়, আরো অনেক কেন্দ্রে হাজার হাজার ফুট গ্রাফকাগজের উপর বিদ্যুৎতরঙ্গলেখ-পেন্সিলের দাগ পড়েছে। গবেষকরা একবাক্যে বলেছেন যে, এই অক্ষিগোলকের ঘন ঘন ঘূর্ণন; উলম্ব বা আনুভূমিক যে রকমই হোক না কেন—স্বপ্ননায়কের স্বপ্নদর্শনের চেষ্টা। নিজের অভিনয় নিজে দেখছেন সামনে পিছনে উঁচুতে নিচুতে চোখ ঘুরিয়ে। অবশ্য এঁরা এ কথাও বলছেন যে, স্বপ্নে নিষ্ক্রিয় ভূমিকাও গ্রহণ করা যায়। তাকিয়ে আছি কিন্তু দেখছি না, কথা কানে যাচ্ছে কিন্তু শুনছি না—এরকম অবস্থার সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। এই অবস্থায়, গবেষকরা স্বীকার করেছেন, চক্ষুগোলকের ঘূর্ণন দ্রুত হবে না। অর্থাৎ আর-ই-এম ছাড়াও স্বপ্ন আছে, অমোঘ নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে।

স্বপ্নসমীক্ষকদের দৌলতে স্বপ্ন-ঘুম সম্পর্কে আরো অনেক তথ্য জানা গেছে। স্বপ্ন দেখার সময় ও স্বপ্নের স্থায়িত্বকাল অপরিবর্তনীয়; টাকা-পয়সায় লোভ দেখিয়ে, ওষুধ বা মদ খাইয়ে সাধারণত এর পরিবর্তন ঘটানো যায় না[৫]। অবশ্য এ সম্পর্কে সকলে একমত নন[৬]। ডেমেণ্ট, ফিশার প্রমুখ মনস্তাত্ত্বিক এ্যামফিটামিন জাতীয় ওষুধ খাইয়ে স্বপ্নবৃত্ত পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। সফল হন নি। ঘুম ও স্বপ্ন দেখা থেকে নিবৃত্ত করার ফল খুবই বিপজ্জনক হতে পারে। সাধারণত এই অবস্থায় মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং স্বপ্নের পরিবর্তে

স্বেচ্ছাসেবকরা অমূলপ্রত্যক্ষদর্শন (হ্যালুসিনেশন) করেন। অনেকে স্বেচ্ছায় নিজের উপর দীর্ঘকাল জেগে থাকার পরীক্ষা চালিয়েছেন এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন[৭]। ঘুম ছাড়া মানুষ বাঁচে না, এ ধারণা সকলেই পোষণ করেন। কিন্তু স্বপ্ন থেকে বঞ্চিত হলেও মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, স্বপ্নও আহারনিদ্রার মতোই প্রয়োজনীয়, এই সম্পূর্ণ নতুন তথ্য আবিষ্কারের জন্য ফ্রয়েডোত্তর সমীক্ষকদের ধন্যবাদ দেওয়া যেতে পারে। উইলিয়ামস ডেমেণ্টের পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে [৮] জানা গেছে যে স্বপ্ন থেকে বঞ্চিত মানুষ যেনতেন-প্রকারেণ বেশি স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করে অভাব পুষিয়ে নিতে চায়। স্বপ্ন থেকে যত বঞ্চিত হয়, ততই অসুস্থ হতে থাকে এবং 'হ্যালুসিনেশন' দেখতে থাকে। কয়েক রাত স্বপ্ন দেখা থেকে আংশিক বঞ্চিত রেখে পরে অবাধে ঘুমোবার সুযোগ দিয়ে দেখা গেছে যে বঞ্চিত ব্যক্তিরা স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ সময় স্বপ্ন দেখছে।

স্বপ্ন দেখার অপরিহার্যতা নিয়ে কোনো মতভেদ না থাকলেও স্বপ্নের কারণ ব্যাখ্যা ও এই অপরিহার্যতার প্রকৃতি নিয়ে যথেষ্ট বিতণ্ডা চলেছে। তিনটি প্রশ্নই পরস্পর-সম্পৃক্ত, একসঙ্গেই আলোচনা চলতে পারে। এই আলোচনা আরম্ভ করার আগে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার।

স্বপ্ন পূর্বনির্ধারিত নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা সূচী মেনে চলে, এই যান্ত্রিক ধারণা সম্বন্ধে কিছু বিজ্ঞানী এখনও সন্দিগ্ধ। তাঁরা মনে করেন, ল্যাবরেটরির পরিবেশে পরীক্ষকের নিয়ন্ত্রণাধীনে স্বপ্ন দেখার ফলে স্বপ্ন দেখার সময় ও স্বপ্নের স্থায়িত্বকাল এই ধরনের অস্বাভাবিক গতিপ্রকৃতি লাভ করে থাকতে পারে। যতদিন না কোনো গবেষক এই তথাকথিত যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ উপস্থিত করছেন, ততদিন এই প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করা চলে। ঘুম-জাগরণের যদি একটা নির্দিষ্ট সম্পর্ক থাকতে পারে, পৃথিবীর আহ্নিক ছন্দ যদি আমরা মেনে নিতে পারি, তবে স্বপ্ন-ঘুমের এই নির্দিষ্ট ছন্দকেই বা অস্বাভাবিক বলব কেন? প্রকৃতির বহু ব্যাপারই তো এই ধরনের নিয়মশৃংখলার অধীন, বলা চলে স্বাভাবিক। ক্লাইটম্যানরা এই রকম বলবেন।

স্বপ্ন দেখি কেন? শারীরবৃত্তিক প্রয়োজনে না মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনে? না, স্বপ্নের মধ্য দিয়ে শরীরমন দুয়েরই প্রয়োজন মেটাই?

ডঃ চার্লস ফিশার মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ফিশার

সাইকো-অ্যানালিটিক অর্থাৎ ফ্রয়েডীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁর মতে স্বপ্নের কাজ শৈশবের যৌন ও অন্যান্য প্রেরণাকে মুক্ত করা। অবদমিত কামনার তৃপ্তি সাধন। সেই ক্ল্যাসিকাল ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব-কথা। প্রমাণ? প্রথম প্রমাণ, মিঃ এক্স ও অন্যান্য কয়েকজন স্বপ্নবঞ্চিত লোকের অতিরিক্ত ক্ষুধা ও খাবার ইচ্ছা। দ্বিতীয়, এঁরা নিজেদের বাচ্চাদের পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন যে তিন থেকে ছ-মাসের মধ্যে তাদের 'র‍্যাপিড-আই-মুভমেণ্ট' আরম্ভ হয়, এবং দর্শনেন্দ্রিয় অনেকটা পরিণতি প্রাপ্ত হয়। এই সময় থেকে তারা রাতে ঘুমোয়, স্বপ্ন দেখে এবং আঙ্গুল চুষতে থাকে। এই সময় মায়ের দুধ বা বোতল আর রাতে বড় বেশি দরকার পড়ে না। আঙ্গুল চুষে এবং খাবার স্বপ্ন দেখে নাকি তারা তৃপ্তি পায়, তাদের 'ওরাল ড্রাইভ'-এর তাগিদ মেটে[৯]। ফ্রয়েডীয় মৌখিক তৃপ্তির প্রেরণা বা ইচ্ছা যৌন-জীবনের প্রথম পর্ব। বড়রাও স্বপ্নের সাহায্যে এই আনন্দ পায়, এই আনন্দ তাদের দরকার। ঘুম বা স্বপ্ন থেকে বঞ্চিত হলে এই আনন্দলাভ স্থগিত থাকে। বেশিদিন স্থগিত রাখা যায় না। একটা সময় 'ওরাল লিবিডো'র বাসনা সংজ্ঞানের রাজ্যে বিনা ছদ্মবেশে বেরিয়ে আসে। তখন ঐ অতিরিক্ত ক্ষুধা ও খাবার ইচ্ছা প্রকাশ পায়। স্বপ্নবঞ্চিত মিঃ এক্স-এর অতিভোজনস্পৃহা নাকি একটা সর্বজনীন ব্যাপার। স্বপ্নবঞ্চিতদের মানসিক অসুস্থতার মূলে আছে এই লিবিডোতৃপ্তির অভাবজনিত আঘাত[১০]। স্বপ্নে আমরা প্রতিরাতে সাময়িকভাবে উন্মত্ত হয়ে দিনেরবেলায় উন্মাদ হবার সম্ভাবনাকে এড়িয়ে চলি!

আমেরিকার সব স্বপ্নগবেষক ফিশারের মতাবলম্বী নন। বাচ্চাদের আঙ্গুল চোষা, রাতে ঘুমানো ও স্বপ্ন দেখা তাদের মৌখিক লিবিডোর তৃপ্তি সাধন করে না বলে, অনায়াসে বলা যায়, ছ'মাসে মস্তিষ্কের ও স্নায়ুর ক্রম-পরিণতি এবং বাস্তব পরিবেশ রাতে ঘুমানো অভ্যাসের সৃষ্টি করে, তার ফলে শিশুর 'র‍্যাপিড আই মুভমেণ্ট' দেখা যায়, আঙ্গুল চোষা শিশুর একটি ভৌতিক প্রয়োজন মেটায়। সাইকোঅ্যানালিটিক তত্ত্ব প্রমাণিত হয় না বটে, তবে এই শারীরবৃত্তিক সোজা কথা অনেকটা বাস্তবানুগ হয়, নিঃসন্দেহে। সব স্বপ্নবঞ্চিত মানুষই কি মিঃ এক্স-এর মতো অতিভোজনে আসক্ত হয়?

না। অপরপক্ষে, অন্যদল ঠিক উল্টো কথা বলছেন! রাতের স্বপ্ন উন্মত্ততার লক্ষণ নয়, বরং নৈশ উন্মত্ততার প্রতিষেধক। এটা শুধু তত্ত্বকথা নয়। সংবেদন

(সেনসেশন) থেকে বঞ্চিত করে তাঁরা মানুষের উপর যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন এবং জেট প্লেনের পাইলট, দূরপাল্লার ট্রাক-ড্রাইভারদের যেসব অভিজ্ঞতার বিবরণ সংগৃহীত হয়েছে—তা থেকে এই পক্ষের তত্ত্বটি অনেক বেশি বাস্তবঘেঁষা ও তথ্যনির্ভর বলে মনে হয়।

কানাডার একজন বৈজ্ঞানিক প্রথম (১৯৫০-এ) সংবেদন-বঞ্চনা (সেন্সরি-ডিপ্রাইভেশন) নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। অবশ্য এর অনেক আগে ইভান পেত্রভিচ পাভলভ কুকুরের উপর এই ধরনের পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। মস্তিষ্কের উপর একসঙ্গে দর্শন শ্রবণ স্পর্শন ইত্যাদি ইন্দ্রিয় মারফৎ যদি অনেক উদ্দীপক আসতে থাকে, (কমপিউটারের ক্ষেত্রে যাকে বলা হয় 'ইন্পুট ওভারলোড') তাহলে মানসিক অস্থিরতা, চিন্তার বিশৃংখলা ইত্যাদি দেখা দিয়ে থাকে। এ ব্যাপারটা তোমার জানা। এর উল্টোটা যদি ঘটে, অর্থাৎ মস্তিষ্কে যদি ইন্দ্রিয় কোনোরকম উদ্দীপনা না পাঠায়, ইন্দ্রিয়গুলোকে যদি উদ্দীপ্ত হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়, তাহলে ব্যাপারটা কি ঘটে? এই অবস্থাতেও (কম্পিউটার পরিভাষায়—'ল্যাক্ অফ ইনপুট') মানসিক রোগের লক্ষণ দেখা দেবে। একটা ন্যূনতম উদ্দীপনা ছাড়া মস্তিষ্কের 'টোন' বজায় থাকে না, এ আবিষ্কার পাভলভ এঁদের অনেক আগে করেছেন। তবে মানুষ নিয়ে পরীক্ষা ও অনেক পরিমাণে তথ্য সংগ্রহ করে এই সংবেদনের অভাব-জনিত অবস্থার একটা সর্বাঙ্গীন সঠিক চিত্র স্বপ্নগবেষকরা কল্পনা করতে পেরেছেন। প্রথমে ইংলণ্ডের রয়্যাল এয়ারফোর্সের নিঃসঙ্গ পাইলটদের কাছে এই 'সেন্সরি-ডিপ্রাইভেশন'-এর অসুবিধার কথা শোনা যায়[১১]। পাইলটদের চোখের সামনে দৃশ্য-পরিবর্তন ঘটে না, কানে অনবরত একঘেয়ে শব্দ, স্পর্শনেন্দ্রিয়ের একঘেয়েমি দূর করারও উপায় নেই। এরা পুরোপুরি ইন্দ্রিয়-উদ্দীপনা বঞ্চিত না হলেও আংশিকভাবে বঞ্চিত। গুহাবাসী সাধুসন্তদের কাহিনী[১২] থেকে ও 'সেন্সরি-ডিপ্রাইভেশন'-এর অনেক তথ্য পাওয়া যায়। চতুর্থ শতকের সেইন্ট অ্যান্টনির জীবনীতে অনেক অদ্ভুত কথার উল্লেখ আছে। মরুগুহায় একলা থাকতেন তিনি। সপ্তাহে দু-একদিন মাত্র সামান্য কিছু খাদ্য গ্রহণ করতেন। ইন্দ্রিয় উদ্দীপ্ত হত তাঁর কমই। তাঁর তপস্যা ভাঙবার অভিপ্রায়ে শয়তান নানা চেষ্টা করত: প্রলুব্ধ করার জন্য সুন্দরী তরুণী, ভয় দেখাবার জন্য বিকটাকার নিগ্রো ইত্যাদি তাঁর কাছে পাঠানো হত। বিজ্ঞানীদের মতে

তিনি হ্যালুসিনেশন দেখতেন। আমাদের পুরাণের কাহিনীতে এরকম অনেক গল্প আছে। অধ্যাপক হেব ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা চালালেন। কৃত্রিমভাবে ইন্দ্রিয় উদ্দীপনার সব ব্যবস্থা করলেন, টাকা দিয়ে পরীক্ষার জন্য লোক সংগ্রহ করলেন। এই ধরনের পরীক্ষা আরো অনেক গবেষক করেছেন। দেখা গেল, পরীক্ষাধীন ব্যক্তিরা সবাই কিছুকাল পরেই নানারকম অদ্ভুত দৃশ্য দেখছে, নানারকমের শব্দ শুনছে, উদ্ভট উদ্ভট কল্পনা তাদের মনে আসছে[১৩]। যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ এইভাবে সংগৃহীত হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে সংবেদনবঞ্চিত অবস্থা অনেকাংশে স্বাভাবিক ঘুমের অবস্থা। দুই অবস্থাতেই ন্যূনতম সংবেদন মস্তিষ্কে পৌঁছুচ্ছে। ঘুম আসার পূর্ব অবস্থায় আর সংবেদনরোহিতদের প্রাথমিক অবস্থায় ঠিক একই ধরনের অনুভূতি-চিন্তা মনে আসে। ম্যাক্‌গিল বিশ্ববিদ্যালয়ে সংবেদনরহিতদের যে ই. ই. জি. চিত্র পাওয়া গেছে, তা ঠিক স্বপ্ন দেখার সময়কার চিত্রের অনুরূপ। নানা তথ্য-প্রমাণ থেকে বোঝা গেছে যে নৈশস্বপ্ন আর সংবেদনরহিতদের অমূলপ্রত্যক্ষ (হ্যালুসিনেশন) একই ধরনের ব্যাপার।

এ-থেকে এই অনুমান করা হয়েছে যে রাতের ঘুম মস্তিষ্কের সংবেদনরহিত অবস্থায় উদ্দীপনা জুগিয়ে মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। এই উদ্দীপনা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক। সংবেদনরহিতদের হ্যালুসিনেশন ঐ একই উদ্দেশ্য সাধিত করে। গবেষকরা মনে[১৪] করেন, জাগ্রত মস্তিষ্কের মতোই ইন্দ্রিয়-উদ্দীপনা ঘুমন্ত মস্তিষ্কেরও দরকার।

মস্তিষ্কবিজ্ঞানের অন্যান্য অধুনালব্ধ তথ্যের সঙ্গে এই অনুমানের সামঞ্জস্য আছে। উচ্চতর মননক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে মস্তিষ্কবল্কলের মতোই অধুনা আবিষ্কৃত সূক্ষ্মজালতন্ত্র (রেটিকুলার ফরমেশন) বিশেষভাবে জড়িত। মেরুদণ্ড যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে এটি অবস্থিত। এই জালতন্ত্র বাইরের খবরাখবর সেন্সর করে উপরতলার কর্টেক্সের (বল্কল) কাছে পাঠায়, কর্টেক্সের খবরও এই জালতন্ত্রের মাধ্যমে আবার মগজের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। যখন বাইরের জগৎ থেকে সংবেদনমাত্রা কমে আসতে থাকে, তখন এই জালতন্ত্র কর্টেক্স খবর পাঠাতে পারে না, চিন্তাভাবনার জটিল ব্যবস্থা সাময়িকভাবে অকেজো হয়ে পড়ে। সেই অবস্থায়, ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন উদ্দীপনা পাঠিয়ে গোটা মস্তিষ্ককে সক্রিয় রাখে। বাইরের থেকে উদ্দীপনা না এলেও, পুরণো যেসব সংবেদন, স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা মস্তিষ্কে জমা আছে, তা থেকেই স্বপ্ন উদ্দীপনা সংগ্রহ

করে[১৫]। অন্তভাবে বলা যায় যে, বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ফলে, কর্টেক্সের নিয়ন্ত্রণ কমে যাবার দরুণ, মস্তিষ্কের নিচুর অংশ ও স্মৃতির (যা সেই দিনকার ঘটনা ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও অনুষঙ্গিত) আধার,— বিচ্ছিন্ন কোষগুলো, উদ্দীপ্ত হয়ে স্বপ্ন সৃষ্টি করে। স্বপ্ন রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী হয়, আমরা জেনেছি। এর কারণ, যত রাত গভীর হয় তত বেশিক্ষণ ঘুমন্ত মানুষটি বাইরের সংবেদন থেকে বঞ্চিত হয়; ফলে দীর্ঘস্থায়ী উদ্দীপনার দরকার হয়। ঘুমন্ত মানুষ সাধারণত এপাশ ওপাশ করে, কিন্তু স্বপ্ন দেখার সময়টা একেবারে নিশ্চল হয়ে থাকে। স্বপ্ন উদ্দীপনা পায় বলে, বোধহয়, স্পর্শন-ঘর্ষণের উদ্দীপনার প্রয়োজন হয় না। এইসব গবেষকদের মতে বিকট নিশাস্বপ্ন, যাকে নাইটমেয়ার বলা হয়, সংবেদন-আধিক্যের ফল।

কেন স্বপ্ন? এ সম্পর্কে দু দলের অভিমত ব্যক্ত করা হল। আর একটা অভিমতের কথাও বলা উচিত। স্বপ্নগবেষকদের অগ্রণী ক্লাইটম্যান মনে করেন, স্বপ্নের কোনো 'কেন' নেই। ঘুমের মতো এও একটা অভ্যাস, যা আমরা আয়ত্ত করেছি। নিত্য আভ্যাসিক এ প্রক্রিয়া কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করে না।

এবার এ সম্পর্কে পাভলভিয়ানদের দু-একটা কথা বলে ছেদ টানব।

স্বপ্নকে হ্যালুসিয়েশনের সঙ্গে তুলনা করে আমেরিকান গবেষকরা পাভলভিয়ানদের ধারণাকেই সমর্থন করেছেন। অথচ এঁরা পাভলভ অথবা তাঁর অনুবর্তী বিজ্ঞানকর্মীদের সম্পর্কে একেবারে নীরব।

ইন্দ্রিয়োপলব্ধির মূলে আছে উৎসের অস্তিত্ব। শব্দতরঙ্গই হোক আর আলোর তরঙ্গই হোক, পরিবেশের কোনো মূর্ত বস্তু থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে ইন্দ্রিয়পথে মস্তিষ্ককোষে উপলব্ধি ঘটায়। উপলব্ধি থেকে ধারণা বা কল্পনা (পারসেপশন বা কন্‌সেপ্ট) গড়ে ওঠে। ধারণা-কল্পনার জন্য বস্তুর উপস্থিতি নিষ্প্রয়োজন। এই কল্পনা-ধারণার উৎস মনোদেশ, সঠিকভাবে বলা উচিত মস্তিষ্ক। উপলব্ধির পরও ইন্দ্রিয়প্রান্তের বিশ্লেষণী কোষে উত্তেজনার জের বজায় থাকে। অবশ্য প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ঔজ্জ্বল্য ও তীব্রতা কল্পনার মধ্যে থাকে না। বহির্বাস্তব উপলব্ধির স্তর থেকে এইভাবে 'পারসেপশন', 'কন্‌সেপ্ট'-এর স্তরে পৌঁছুচ্ছে। 'হ্যালুসিনেশন'-এও বাইরের উৎস অনুপস্থিত, কিন্তু এই কল্পনা বা ধারণা প্রায় প্রত্যক্ষদর্শন বা শ্রবণের মতোই উজ্জ্বল ও তীব্র। কাজেই একে কল্পনা না বলে বাঙলায় অমূলপ্রত্যক্ষ

বলা হয়। মস্তিষ্কের এমন একটা অবস্থা আছে, (এ নিয়ে পাভলভ অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন) যখন দুর্বল উদ্দীপক প্রবল উত্তেজনা জাগাতে পারে। এই অবস্থার নাম প্যারাডক্সিক্যাল বা আপাত-স্ববিরোধী অবস্থা—এ কথাতো তোমার জানা। এই সময় মস্তিষ্ককোষগুলো স্তিমিত বা শ্রান্ত থাকে। বেশি-মাত্রায় সংবেদন অথবা সংবেদনার স্বল্পতা, দুইই এই প্যারাডক্সিক্যাল অবস্থা আনতে পারে। এই সময় কল্পনার উৎস, মস্তিষ্কের মৃদু উত্তেজনার কেন্দ্রগুলো তীব্রভাবে আলোড়িত হয়; কল্পনাস্মৃতি প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মতো স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে ওঠে। যার মস্তিষ্ক এরকমটি ঘটবে, তার স্বভাবতই মনে হবে উৎসটি বাইরের জগতেই আছে।

স্বপ্ন, পাভলভের মতে, এক ধরনের মননক্রিয়া, হ্যালুসিনেশনের সমগোত্র। ঘুমের মধ্যে আমরা একেবারে অচেতন হই না। মস্তিষ্কের কিছু জায়গা স্বপ্নের মধ্যেও জেগে থাকে। জৈবপ্রক্রিয়ার কেন্দ্রগুলি শুধু নয়, যে সব জায়গা দিনের কার্য উপলক্ষে খুব বেশি উত্তেজিত বা নিস্তেজিত হয়েছে, সেগুলো জেগে থাকতে পারে। এইসব কেন্দ্র ও কোষসমষ্টির উদ্দীপনার ফলে স্বপ্নদৃশ্যের অভিনয় ঘটে। যুদ্ধোত্তর গবেষকদের মূল্যবান আলোচনা পাভলভের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবে।

স্বপ্নব্যাখ্যা নিয়ে ডায়মণ্ড ফ্রয়েড-ইয়ুং-এর মতামত ও পদ্ধতি নিয়ে সামান্য কিছু লিখেছেন। সবই পুরণো কথা, মন্তব্য করার মত কিছু নেই। 'প্রফেটিক ড্রিম' ও ভবিষ্যৎবাণী নিয়ে সুন্দর বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেছেন এবং রহস্য-বাদীদের অলৌকিক তত্ত্বকথা খণ্ডন করেছেন। সৃজনক্রিয়া (ক্রিয়েশন অব আর্ট) সম্পর্কে তাঁর সমর্থিত স্বতঃস্ফূর্ততা-তত্ত্বের সঙ্গে আমার মতো অনেকেই একমত হতে পারবেন না[১৬]।

স্বপ্নবিজ্ঞান এখনও সুনির্দিষ্ট কোনো স্বপ্নতত্ত্ব অথবা স্বপ্নের কোনো বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেবার মতো অবস্থায় আসেনি বটে, কিন্তু গবেষকদের অগ্রগতি দেখে মনে হয় যে খুব শীঘ্রই জানা যাবে স্বপ্নের আদৌ কোনো বাস্তবসম্পর্কিত অর্থ আছে, না স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই।

শিশিরবিন্দু যেমন রোদ উঠতে না উঠতেই মিলিয়ে যায়, বেশির ভাগ স্বপ্ন তেমনি ঘুম ভেঙ্গে চোখ মেলে নড়াচড়া করার সঙ্গে সঙ্গেই বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে যায়। কেন? 'কেন'র জবাব দিতে গিয়ে শুধু ক্লাইটম্যানের শারীরবৃত্তিক

ব্যাখ্যা নয়, অন্যান্য সমীক্ষকদের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও প্রাসঙ্গিকভাবে এসে পড়বে। সেই সূত্রে জৈব মস্তিষ্ক ও উচ্চ মস্তিষ্কের পারস্পরিক সম্পর্কের অতি আধুনিক গবেষণার কিছু কিছু তথ্য পেশ করব। হয়ত পূর্বেকার চিঠিতে বা অন্যান্য সূত্রে তথ্যগুলো তোমাকে আগেও শুনিয়েছি; তবুও খুব খারাপ লাগবে না।

ক্লাইটম্যানের শারীরবৃত্তিক তত্ত্বের সারকথা এই যে গুরু-মস্তিষ্ক-বল্কল (cerebral cortex) চিন্তা-ভাবনা-স্মৃতির আধার; এবং ঘুমন্ত অবস্থায় যখন আমরা স্বপ্ন দেখি, এই গুরুমস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে; কাজেই স্বপ্নবৃত্তান্ত মনে রাখা সম্ভব হয় না। গুরুমস্তিষ্ক জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়বাহিত উদ্দীপনাগুলোকে, অর্থাৎ তার কাছে আসা খবরাখবরগুলোকে বিশ্লেষণ করে, বিমূর্ত করে, স্মৃতির ভাঁড়ার থেকে টেনে আনে অন্যান্য খবর, জমানো অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করে, মূল্য নির্ধারণ করে, তারপর সেগুলোকে নির্দিষ্ট ভাণ্ডারে জমিয়ে রাখে। ঘুমন্ত অবস্থায় ইন্দ্রিয় সংকেত বহন করে না, কাজেই গুরুমস্তিষ্কের গুরুত্বও থাকে না। বিশ্লেষণী ক্ষমতা হ্রাস পায়, কোনো খবর বা ঘটনা উদ্ভট, অসম্ভব বলে বর্জিত হয় না। গুরুমস্তিষ্কের এই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় স্বপ্নরাজ্যের দরজা খুলে যায়। স্বপ্ন দেখাকে ক্লাইটম্যান শিশু, বৃদ্ধ ও মাতালের চিন্তাধারার সঙ্গে তুলনা করেছেন। শিশু খেলার পুতুলকে সজীব কল্পনা করে, অনুপস্থিত সঙ্গীর সঙ্গে খেলা করে; তোমার দিদিমণি মৃত শিশুর শয্যায় হাত বুলিয়ে ঘুমপাড়ানি গান গাইতেন, ভুলে গিয়ে একই গল্প বারবার শোনাতেন, অনেক মাতাল তিন নম্বর পেগের পর কি ঘটেছিল মনে করতে পারে না। এই সময় গুরুমস্তিষ্ক কোনো কাজই করছে না, বলা চলে। 'স্বপ্ন ভুলে যাই কেন'—এর থেকে ক্লাইটম্যানের কাছে 'স্বপ্ন জাগার পরও মনে থাকে কেন', এইটেই বড় প্রশ্ন। উত্তরে তিনি বলেছেন; অনেক বছরের অর্জিত অভ্যাসের ফলে কেউ কেউ ভোরের দিকটার শেষ স্বপ্নটার মাঝখানে জেগে ওঠে। নাটকের শেষ দৃশ্যটাই শুধু মনে পড়ে। আবার নানা কারণে মাঝরাত্রে কখনও দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্বপ্নের মাঝে যদি ঘুম ভাঙে, তবে ঐ স্বপ্নের অংশবিশেষ মনে আসতে পারে।

এইবার দুজন মনস্তাত্ত্বিকের স্বপ্ন-সমীক্ষার উল্লেখ করব। এঁরা হলেন নিউইয়র্কের শ্যাপিরো ও গুডেনফ। যারা স্বপ্ন দেখার কথা স্বীকার করে আর যারা স্বীকার করে না এই দুই গ্রুপের স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

চালিয়ে এঁরা কি সিদ্ধান্তে এসেছেন জানো? যারা বলে স্বপ্ন দেখিনা—তারাও আসলে স্বপ্ন দেখে, কিন্তু অনেক সময় বুঝতে পারে না স্বপ্ন দেখছে, না চিন্তা করছে। আর-ই-এম্ পর্বে ঘুম ভাঙ্গালে তারা বুঝতেই পারে না তারা ঘুমুচ্ছিল না জেগেছিল। এরা ঠিক জানেই না স্বপ্ন দেখা ব্যাপারটা কি? অনেক সময় স্বপ্ন-বৃত্তান্তের অসম্ভাব্যতা থেকে বিচার করে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়ে তারা ঘুমিয়েছিল এবং স্বপ্ন দেখছিল। যারা 'নন্-ড্রিমার্স' বা স্বপ্নবিরোধী, তারা, এঁদের মতে, স্বপ্ন মনে করতে চায় না। তাদের ঘুম ভাঙানো খুবই কঠিন ব্যাপার। অনেক ধাক্কাধাক্কির পর যখন ঘুম থেকে ওঠে, তখন অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ স্বপ্নবৃত্তান্তটি বেমালুম ভুলে গেছে। এদের আকস্মিকভাবে অবিলম্বে ঘুম ভাঙানোর বিশেষ বন্দোবস্ত করার পর এদের কাছ থেকে স্বপ্নবিবরণী আদায় করতে পেরেছেন সমীক্ষক। ঘুরে ফিরে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা পুরণো ফ্রয়েডীয় বিস্মরণতত্ত্বকেই পুনরুজ্জীবিত করেছেন। স্বপ্ন দেখার পর ঘুম ভাঙতে যত দেরী হবে, স্বপ্নীয় ঘটনা ততই বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে যাবে। নির্জ্ঞান আর সংজ্ঞান মনের মধ্যবর্তী দ্বাররক্ষক বা সেন্সর একটু সময় পেলেই স্বপ্নের অবাঞ্ছিত অসামাজিক ইচ্ছাকে নির্জ্ঞানকক্ষে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। মানসিক বাধা বা resistance থেকেই স্বপ্নদৃষ্ট সব কিছু স্মৃতি বিলুপ্ত হয়। কেন না, স্বপ্নের মাধ্যমে আমরা অসামাজিক ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করি। এসম্বন্ধে অনেক কিছু লিখেছি আগের চিঠিগুলোতে। নতুন করে ঝগড়া করতে চাই না। হারিয়ে ফেলে থাক যদি, কিছু বলবো না। অন্তত ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা করে হারিয়ে ফেলাকে নির্জ্ঞান-প্রেরণা বলে তোমার বিরুদ্ধে নালিশও জানাবো না।

এবার মনরোগ চিকিৎসকদের ব্যাখ্যা দিয়ে বক্তব্য শেষ করা যাক। ক্লাইট-ম্যান স্বপ্নদ্রষ্টাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ও হৃৎপিণ্ডের গতিবেগ পরিমাপক কৌশল সন্নিবিষ্ট করেছিলেন তাঁর ই-ই-জি যন্ত্রে, বলেছি আগেই। স্বপ্নদ্রষ্টার হৃৎপিণ্ডের ধুক্‌পুকুনি ও নিঃশ্বাসের বেগ দুই-ই বেড়ে যায়, এটা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। এর মানে স্বপ্ন দেখার সময় প্রক্ষোভে (emotion) আকুল হই আমরা। মনোরোগবিদ স্নাইডার স্বপ্নকালীন প্রক্ষোভবৃদ্ধি নিয়ে গবেষণা চালিয়ে স্বপ্নতত্ত্বকে সমৃদ্ধ করেছেন। স্নাইডার তাঁর ল্যাবরেটরীর যন্ত্রে প্রক্ষোভ মাত্রা নির্ধারণের জন্য আরো কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা করেন। হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, রক্তপ্রবাহের গতি ও দেহের তাপ-নির্ণয়ের বন্দোবস্ত করার পর তিনি দেখলেন যে স্বপ্নের মধ্যে

প্রক্ষোভমাত্রা অনেকটা বাড়ছে। এ বৃদ্ধির আবার একটা বিশেষ নিয়মও তিনি আবিষ্কার করলেন। প্রথম স্বপ্ন থেকে তৃতীয় স্বপ্ন অবধি ক্রমশ বেড়ে আবার ভোরের দিকে কমতে থাকে। এই প্রক্ষোভ পুরণো মস্তিষ্ক বা নিম্ন মস্তিষ্কের ক্রিয়া। ডাক্তারীতে একে জৈব-মস্তিষ্ক বা visceral brain বলে। বহুদিন ধরে শারীরবৃত্তবিদ্‌দের ধারণা ছিল যে অটোনমাস্ নার্ভাস সিষ্টেম জৈবক্রিয়া—যথা হৃদযন্ত্র, পরিপাক, বিপাক, শ্বাসপ্রশ্বাস ইত্যাদির ক্রিয়া চালায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে। সত্যসত্যই অটোনমাস বা স্বচালিত। সে ধারণা গত পঞ্চাশ বছরে বদলে গেছে। New brain বা কেন্দ্রীয় স্নায়ু-সংস্থা, যার পূর্ণ পরিণত রূপ মানব মস্তিষ্কে সংগঠিত, যার সংচালন তথা চিন্তাভাবনা বিবেচনা বিশ্লেষণ সংশ্লেষণ ইত্যাদির সমন্বিত কর্তৃত্ব গুরুমস্তিষ্ক বল্কলে সংরক্ষিত ; সেই কেন্দ্রীয় সংস্থা বা সেণ্ট্রাল নার্ভাস্ সিষ্টেমের নিয়ন্ত্রণ-নিরপেক্ষ নয় জৈব মস্তিষ্ক বা visceral brain। এসব কথা তোমার কাছে খুবই পুরণো, তবুও স্বপ্নস্মরণ বিস্মরণ প্রসঙ্গে প্রক্ষোভের বিশেষ তাৎপর্যের কথা বিবেচনা করে আবার তোমাকে এ সম্পর্কে দু'এক কথা শুনতে হবে। Emotion আর Intellect,—মস্তিষ্কের পুরণো আর নতুন অংশের দ্বন্দ্বসমন্বয় নিয়ে মনস্তাত্ত্বিক মহলে, চিকিৎসক মহলে অনেক অনেক তর্ক বিতর্ক আলাপ আলোচনার ঝড় বয়ে গেছে। ভয় নেই, পুরণো কাসুন্দি ঘাঁটবো না। ফ্রয়েডোত্তর সমীক্ষকদের ধারণা অতি সংক্ষেপে পরিবেশন করবো। মাত্র সেইটুকু, স্বপ্ন ব্যাখ্যায় যেটুকু অপরিহার্য।

মস্তিষ্কের দুই অংশ, প্রক্ষোভ-অংশ ও বুদ্ধি-অংশ প্রকৃতি পরিকল্পিত দুটি টেলিভিশনের পর্দার সঙ্গে তুলনীয়। এই পর্দায় প্রতিফলিত হচ্ছে পরিবেশের চিত্র। প্রক্ষোভ-অংশ যেন প্রকৃতির কাঁচাহাতের তৈরী ; সেই প্রথম যুগের নয় ইঞ্চি টেলিভিশন পর্দার মত, কলাকৌশলের দিক থেকে নীচু স্তরের। প্রতিফলিত ছবিগুলো অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে। যুক্তি বুদ্ধির ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ভাষায় ব্যক্ত করা চলে না এর আদিম আরণ্যক প্রকৃতি। রূপক প্রতীক এ ছবির আত্মপ্রকাশের একমাত্র মাধ্যম। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের ছবিগুলোর কথা মনে করতে পারো। "One might imagine that though the visceral brain could never aspire to conceive of the colour red in terms of a three letter word or as specific wave length of light, it could associate the colour symbolically with

such diverse things as blood, fainting, fighting, flowers etc"—একজন সমীক্ষকের কথাগুলোই তুলে দিলাম। ধারণাটা অনেকখানি পরিষ্কার হবে। তোমরা যারা অতি আধুনিক কবিতা পড়, উদ্ভট নাটক দেখ, নিশ্চয়ই আদিমস্তকের এই অনুভূতির তাৎপর্য ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। অনুভূতি আদিম, প্রকাশভংগী অন্ত্র-কেন্দ্রিক; ইংরেজিতে একে বলে gut-feelings। শ্রবণ-দরশন-পরশন সব মিলে মিশে আন্তরযান্ত্রিক হরষণে অভিব্যক্ত। এই অবস্থায় পান্তার স্বাদ সবুজ লাগে, গান শুনে বমি আসে, মনে চোট লাগলে পেট ব্যথা করে।

অন্যদিকে নয়া অংশের টেলিভিশন পর্দাটিতে প্রতিফলিত পরিবেশ চিত্র যুক্তি-গ্রাহ্য, অঙ্গাঙ্গীসম্পৃক্ত। ভাষায় ব্যক্তসম্ভব এর প্রতিটি লাইন, আলোছায়ার প্রতিটি দ্যোতনা। এখানে পর্দায় পরিবেশ সুস্পষ্ট এবং বিশদভাবে বিশেষভাবে চিত্রিত, যার ফলে পরিবেশ-পরিবর্তন ও পরিবেশের সঙ্গে সমন্বয় সাধন সম্ভব। মানুষের সব সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড এই নতুন মস্তিষ্কের (কেন্দ্রীয় সংস্থা) নিয়ন্ত্রণাধীন; তা বলে পুরণো মস্তিষ্ক মানুষকে প্রভাবিত করে না এমন নয়। অর্থাৎ সময় বিশেষে মানুষ কেবলমাত্র অনুভূতি বা প্রক্ষোভতাড়িত হতে পারে; গুরুমস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়তে পারে। ঘুম এমনি এক অবস্থা; এই সময় visceral brain বা আন্ত্রিক মস্তিষ্ক স্বাধীনভাবে কাজকর্ম চালাতে থাকে, ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তার নাম স্বপ্নকাণ্ড। এই কাণ্ডে যা কিছু ঘটে সবই যুক্তিবিহীন ও অন্ত্রধর্মী। স্বপ্নের সবকিছুই অত্যুজ্জ্বল, অত্যধিক প্রক্ষোভ-পীড়িত ও প্রতীকধর্মী অনুভূতিসঞ্চারক।

স্নাইডারের স্বপ্ন মনে না থাকার ব্যাখ্যা শারীরবৃত্তবিদ ও মনস্তত্ত্ববিদদের ব্যাখ্যা থেকে স্বতন্ত্র। ইনি মনে করেন, যে স্বপ্ন কেবলমাত্র অনুভূতি জাগায়, যে সব স্বপ্ন প্রক্ষোভ উদ্দীপক, সে-স্বপ্ন স্বভাবত আন্ত্রিক মস্তিষ্কের ক্রিয়াফল, বাচনিক স্তরের প্রভাবরহিত। লাল এদের কাছে রক্তের প্রতীক, ল, আ এবং ল শব্দের সমন্বয়ে গঠিত অর্থব্যঞ্জক কোনো বাক্য নয়। জাগ্রত অবস্থায় অর্থব্যঞ্জক ভাষার সাহায্যে এই স্বপ্ন স্মৃতিপথে আনা সম্ভব নয়। যে স্বপ্ন মনে থাকে, সেগুলোকে এরা নাম দিয়েছেন 'থট্-ড্রিম' বা চিন্তা-স্বপ্ন। এ-স্বপ্ন দেখা মস্তিষ্কের নয়া-বিভাগের অর্থাৎ গুরুমস্তিষ্কের ধর্ম। এদের উত্তাপ কম; কিন্তু এরা ভাষায় প্রকাশযোগ্য, কাজেই স্মৃতিমন্দিরে অধিষ্ঠান করতে পারে। স্বপ্নের এই দ্বি-জাতিত্ব আবার

অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে গরমিল। কাজেই তিনি অনুমান করলেন স্বপ্নবৃত্ত মনের বিভিন্ন স্তরকে আলোড়িত করে। তার ফলে কোনো স্বপ্ন মনে থাকে, কোনো স্বপ্ন মনে থাকে না। মনের বিভিন্ন স্তর আছে যে তার প্রমাণ কি? স্মৃতি সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান ধারণা থেকে অনায়াসে স্তরের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়—এটা হল স্নাইডারের দৃঢ় বিশ্বাস। স্বপ্নের আবেগ-অনুভূতি স্বপ্নদ্রষ্টার অতীত অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত। এই অভিজ্ঞতা মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বা স্তরে সন্নিবিষ্ট। এই অভিজ্ঞতার প্রকৃতি ও স্তরবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সমীক্ষকদের অভিমত শুনলে খুব খুসী হবে তুমি। কেননা তিনি প্রথমেই সেই অভিজ্ঞতার উল্লেখ করেছেন, যাকে ইয়ুং-এর ভাষায় বলা হয় যৌথ-নির্জ্ঞান। (Collective Unconscious)। এই স্মৃতি বিবর্তনের ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে রক্ষিত হয়ে আসছে হাজার হাজার বছর ধরে। মানবপ্রজাতি শুধু নয়, স্তন্যপ্রায়ী জীব মাত্রেই এই আদিম স্মৃতির অধিকারী। এর অধিষ্ঠান সেই পুরণো আন্ত্রিক মগজে। এ-ছাড়া আরো দুটি স্মৃতিস্তরের উল্লেখ করা হয়। এ-দুটি স্মৃতিস্তরের নাম দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে পূর্বাভিজ্ঞ স্মৃতি বা experiental memory এবং ব্যাখ্যামূলক স্মৃতি বা interpretative memory। 'নাম দুটি কানাডার বিশ্ববিখ্যাত নিউরো-সার্জন পেনাফিল্ড চালু করেন। মৃগীরোগীর মস্তিষ্কে অপারেশন করতে গিয়ে পেনফিল্ড গুরুমস্তিষ্কের বল্কলে সূচের মত ইলেক্‌ট্রোড্ প্রবিষ্ট করিয়ে এইসব স্মৃতিস্তরের সন্ধান পান। এক ভদ্রলোকের কপালের ঠিক নিচেতে একই জায়গায় ইলেক্‌ট্রোড ঢুকিয়ে তাঁর মুখে মজার মজার অভিজ্ঞতার কথা শোনা গেল। প্রথমবার বললেন, কাছাকাছি কেউ পিয়ানো বাজাচ্ছে শুনতে পাচ্ছি। দ্বিতীয় দিন বললেন, দুজনে কথা বলছে, একজন একটা নাম বললো, আমি বুঝতে পারলাম না। ঠিক যেন একটা স্বপ্ন। তৃতীয় দিন বললেন, কেউ একটা গান গাইছে। চতুর্থ দিনে সেই একই গান শুনতে পেলেন এবং বললেন এটা একটা রেডিও প্রোগ্রামের বিষয়বস্তু। পেনফিল্ডের অভিমতটা এইরকম: যখন ইলেক্‌ট্রোড্ ঢুকিয়ে মস্তিষ্কের কোনো জায়গায় মৃদু আকস্মিক আঘাত দেওয়া হয় তখন অতীতের কোনো স্মৃতি-অভিজ্ঞতা এলোমেলোভাবে আবার নতুন করে চৈতন্য-প্রবাহ রূপে জেগে ওঠে এবং নতুন করে বইতে থাকে। অতীতের গুহাভাণ্ডার থেকে স্বতঃউৎসারিত এই অসম্বন্ধ স্মৃতিস্রোত পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ।

এর নামই experiental memory; বাংলায় বলা চলে পূর্বাভিজ্ঞ-স্মৃতি। অন্য ধরনের ইলেক্ট্রোড্-প্রতিক্রিয়ায় রোগী বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠে এবং বর্তমানকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। অবশ্য এই প্রচেষ্টার মধ্যে চিন্তাবিবেচনার কোনো ব্যাপার নেই। এটা অনেকটা ঐ আকস্মিক আঘাতের স্বতস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া। স্বপ্নবৃত্তান্ত মনে আসা বা ভুলে যাওয়া কোনো স্বেচ্ছাকৃত ব্যাপার নয়, এইরকম স্বতস্ফূর্ততা ও আকস্মিকতার নিদর্শন।

[৮]

এখন স্মৃতি-তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা যাক।

স্মৃতির ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা এখনও পেলবখণ্ড সংগ্রহ করছেন। সামনে পড়ে রয়েছে অসীম সাগর। প্রাচীনদের থেকে জ্ঞানের পরিধি খুব বেশি বেড়েছে বলে মনে হয় না। স্মৃতি-ভাণ্ডার কথাটি খুবই চালু, তবে ভাণ্ডারটির সঠিক অবস্থান বোধ হয় এখনও অনির্দিষ্ট। তোমার জটিল প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারব না; তবু যতটা জানা আছে, তোমার বোধগম্য করে এই পত্রে প্রকাশ করার চেষ্টা করছি।

পেনফিল্ড মস্তিষ্ক-বল্কলে সূচ ফোটানোর পর থেকে স্মৃতিতত্ত্ব নিয়ে বিজ্ঞানীরা উঠে পড়ে লাগলেন। কি হয়েছিল মনে আছে নিশ্চয়ই। খুব অল্প পরিমাণ বিদ্যুৎবাহী সূচী-ইলেক্ট্রোডের প্রবেশ-উদ্দীপনায় রোগী মজার মজার কথা শুনতে পেলেন। একদিন পরিচিত একটা গানও শুনলেন। ইলেকট্রোডটা কানের কাছাকাছি অবস্থিত মস্তিষ্ক-ত্বকে প্রবিষ্ট হয়েছিল। জায়গাটার নাম 'টেম্পোরাল লোব'। মস্তিষ্কের ছবি এবং চার্ট নিশ্চয়ই অনেক দেখেছ। আর একবার মিলিয়ে নাও। 'সিলভিয়ান ফিশার' এর ঠিক নীচের অংশটিকে ঐ নাম দেওয়া হয়েছে। কানের পাশে যে অস্থিখণ্ডটি ঐ অংশকে ঢেকে আছে তার নাম 'টেম্পোরাল' অস্থি। এরপর পেনফিল্ড সামনের দিকে মানে কপালের দিকে চার সেন্টিমিটার সরিয়ে বসালেন ইলেকট্রোডটি। এবার রোগীর মনে পড়ল একটা রুটির দোকানের বিজ্ঞাপনের কথা। এ বিজ্ঞাপনটা তার পূর্ব-পরিচিত। এটা যে রোগীর স্বাভিভাবনপ্রসূত নয় তার প্রমাণ কি? পেনফিল্ডের মনেও সেই সন্দেহ এসেছিল। তিনি তাই বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করলেন (ইলেকট্রোডটি ঠিকই রাখলেন)—এবার কি দেখলেন? উত্তর হল—কিছু না। এর থেকে স্থিরনিশ্চয় হলেন যে ইলেক্ট্রোডের খোঁচায় মস্তিষ্কের এই অংশের উদ্দীপনা থেকেই স্মৃতি

জাগরিত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষানিরীক্ষার পাত্রপাত্রী ত' বিশ্বাসই করতে চায় না যে এটা পূর্ব-স্মৃতির জাগরণ। একটি ভদ্রমহিলার টেম্পোরাল লোবের একই জায়গায় বারবার ইলেক্ট্রোড প্রবেশ করানোতে একই গান বারবার তাঁর কানে বাজতে লাগল। তিনি মনে করলেন নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও ঐ গানের রেকর্ডটা বাজানো হচ্ছে। আর একজন তাঁর ভাই-এর সঙ্গে কথাবার্তার নিখুঁত রেকর্ডিং শুনলেন; সে ভাই তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভ্রমণ করছেন। মস্তিষ্কের ঐ অংশটির বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন কালের স্মৃতি সঞ্চিত রয়েছে বলে মনে হয়। স্মৃতি যতই পুরণো হয় ততই যেন উঁচুতলায় উঠতে থাকে। সমকালীন স্মৃতি জমা আছে যেন টেম্পোরাল লোবের নীচুর তলায়। উপরের অংশটি কেটে বাদ দিলেও সমকালীন স্মৃতির ইতরবিশেষ ঘটেনা, কিন্তু পুরণো স্মৃতি লোপ পায়। আবার নীচের তলার ক্ষয়ক্ষতিতে কাছাকাছি সময়ের কোনো কিছুই আর মনে পড়ে না। ব্যাপারটা কিন্তু অত সরল নয়। পেনফিল্ডের মতে স্মৃতির ভাণ্ডার মস্তিষ্কের নানা অংশে ছড়িয়ে আছে। টেম্পোরাল লোবের সঙ্গে সেই সব অংশের সম্পর্ক নিবিড়। টেম্পোরাল লোবের অংশবিশেষ বিদ্যুতবাহিত হয়ে অনুষঙ্গের ফলে একটা নির্দিষ্ট পূর্বস্মৃতি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। স্মৃতিভাণ্ডার নয় এ জায়গাটি, বরং একে বলা চলে স্মৃতিভাণ্ডারের চাবি। ইলেকট্রনিক যন্ত্রের মত মস্তিষ্কের কোনো বিশেষ অংশে শুধুমাত্র স্মৃতি জমা আছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন না। স্মৃতিকেন্দ্র বলে কোনো কেন্দ্র এখনও বোধ হয় আবিষ্কৃত হয় নি।

কেন্দ্রীয় স্মৃতি-আগার নেই; তবে স্থানীয় স্মৃতিসংরক্ষণ ব্যবস্থা আছে অজস্র। কেন্দ্রীয় খাদ্য-ভাণ্ডার না থাকলে মজুতদার ও চোরাকারবারীদের কিছুটা সুবিধা হয় নিঃসন্দেহ। অলীক দর্শন, অলীক শ্রবণ (haliucinations) আমাদের অনেকসময় পীড়িত করে। কিন্তু স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের সুবিধাও অনেক। একজায়গায় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হলে, একটি কেন্দ্রীয় স্মৃতিভাণ্ডার থাকলে, দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, ইন্দ্রিয়জাত বিভিন্ন ধরনের স্মৃতির জটপাকিয়ে যাবার সম্ভাবনা হত বেশি। বিশৃংখলা আরো বাড়ত। বর্তমানে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন আমাদের স্মৃতি অনেকটা ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রিক। দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ ও পেশী-সঞ্চালনের সংবেদন থেকে স্মৃতি গড়ে ওঠে ও স্থানীয় কেন্দ্রে সঞ্চিত থাকে। তাই কেউ চেহারা মনে করতে পারে, নাম মনে করতে পারে না; কেউবা বন্ধুবান্ধবের টেলিফোনের নম্বর অনায়াসে মনে রাখতে পারে, কিন্তু সহজে ভাষা শিখতে পারে

না। কেউ শোনা জিনিষ ভোলে না, কারুর বা দৃশ্যপট বেশি মনে থাকে। ঠিক কি ভাবে স্মৃতি সঞ্চিত থাকে, সে সম্বন্ধে ধারণা এখনও অপরিণত। সংবেদন থেকে স্মৃতি মুদ্রণের ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত। ব্যাপারটা ঠিক কি ভাবে ঘটছে দেখা যাক। দোতলার বারান্দায় এসে তোমাদের গেটের পাশের কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে তাকালে, লাল ফুলের সমারোহ তোমাকে সম্বর্ধনা জানাল। দর্শন-ইন্দ্রিয়ের স্নায়ু উদ্দীপ্ত, সেই উদ্দীপনার ঢেউ পৌছুলো মস্তিষ্কের এক বিশেষ গ্রাহী-কেন্দ্রে। গাছ পাতা ফুলে ভরা বাইরের দৃশ্যপট মস্তিষ্কে অনুরূপ সংবেদন জাগালো, ছবিটি চোখের সামনে ফুটে উঠলো। তুমি চোখ ফিরিয়ে নিলে দৃশ্যান্তরে। কৃষ্ণচূড়ার ছবি মিলিয়ে গেল, কিন্তু একেবারে মুছে গেল না। মুদ্রিত হয়ে রইল স্মৃতিপটে। চেষ্টা করলে বা অনুষঙ্গের প্রভাবে দৃশ্যটি যে কোনো সময় তোমার মনে আসতে পারে। মস্তিষ্কের কোষগুলো একসময় উদ্দীপ্ত হয়েছিল, উদ্দীপনা থেমে গেছে, কিন্তু ছাপ রয়ে গেছে। কী ভাবে? স্নায়ুবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, আধুনিক কালের সিবারনেটিক্স—কোনো বিজ্ঞানই এ পর্যন্ত এর সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। এ নিয়ে অনুমানভিত্তিক আলোচনা অনেক হয়েছে এবং হচ্ছে। তত্ত্বকথা আলোচনার আগে স্মৃতিবিষয়ক আরো কিছু তথ্য পরিবেশন করছি। জানিনা, এবিংহোসের (Hermann Ebbinghaus) 'মেমরি স্প্যান' সম্বন্ধে তোমার এত আগ্রহ কেন? তাঁর গবেষণার বিষয় এবং পদ্ধতি সহজ করে লিখে বোঝাতে পারব কি?

গত শতকের শেষ দিকে মনস্তত্ত্বের অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে স্মৃতি বিষয়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষাও সুরু হয়। এবিংহোস্ এই স্মৃতি গবেষণার পথিকৃৎ। স্মৃতি ও বিস্মৃতি নিয়ে মাত্রাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন ১৮৭৯-৮০ সালে। তাঁর আগে গ্যালটন উন্দ একটি মাত্র শব্দ-উদ্দীপকের সাহায্যে অনুষঙ্গ প্রক্রিয়ার সময়-সম্পর্ক নির্ণয়ের পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। এবিংহোস্ অনেকগুলো সংযোগ শব্দের সাহায্যে সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন। কী ভাবে ধাপে ধাপে অনুষঙ্গ গড়ে ওঠে, দৃষ্ট বা শ্রুত কোনো কিছু কী ভাবে স্মৃতি-পটে অঙ্কিত হয়ে যায়, এই নিয়ে বিশদ অনুসন্ধান চালালেন তিনি। শ্রুতিলিখন, শ্রুতিপঠন কাকে বলে জানো? আগেকার দিনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গুরুমশায়ের কাছে যারা পড়েছে, তারা কথাগুলো মর্মে মর্মে জানে। গুরুমশাই হাঁকলেন—লেখ। পড়ুয়ারা শ্লেট-পেন্সিল নিয়ে তৈরী হল। গুরুমশাই বললেন—অনন্তর

নবজলধর পটলে শাল্মলী বৃক্ষের শীর্ষদেশ আচ্ছাদিত হইল। পড়ুয়াদের শ্লেট-পেন্সিলের ঘর্ষণে ঠকাঠক শব্দ হতে লাগল। তারা সমস্বরে শেষ কথাটি উচ্চারণ করল—"দিত হইল"। গুরু অন্য পংক্তি হাঁকলেন। এই হল শ্রুতিলিখন। শ্রুতিপঠন আরো মজার। সর্দার পড়ুয়া একদিকে দাঁড়াল, অন্যান্যেরা অন্যদিকে। সর্দার হাঁকল—এক কড়ায় পোয়া গণ্ডা। ছেলেরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো—পোয়াগণ্ডা। দুষ্টু ফাঁকিবাজ যারা, তারা শুধু—'ণ্ডা' উচ্চারণ করে ঐকতান বজায় রাখল। গণ্ডায় আণ্ডা মেশালো। এর নাম শ্রুতিপঠন। এবিংহোসের পরীক্ষা-নিরীক্ষা পদ্ধতিটা অনেকটা এই রকমের ছিল। এই শ্রুতিলিখন, শ্রুতিপঠনের সাহায্যে বাক্য বা নামতা কতটা সময়ের মধ্যে মুখস্থ করা যায়—সেইটে নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে তিনি গবেষণা চালিয়েছিলেন। মুখস্থ করবার বিষয়বস্তু যত দীর্ঘ হয় মুখস্থ করার সময় তত বাড়ে। নিজের উপর পরীক্ষা চালিয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন যে অর্থহীন বাক্য মুখস্থ করতে অর্থপূর্ণের তুলনায় বেশি সময় লাগে। দৃষ্টিপঠন নিয়েও পরীক্ষা চালানো যায়। দৃষ্টিপঠন শ্রুতিপঠনেরই অনুরূপ। শোনার বদলে পড়ে মুখস্থ করা; যে ভাবে পড়তে আমরা সকলেই অভ্যস্ত। এবিংহোস্ দেখলেন একবার পড়ে তিনি সাতটা/আটটা অবধি 'নন্‌সেন্স সিলেবল্' মনে রাখতে পারেন। বাড়িয়ে ন'টা করতেই মুখস্থর সময় অনেকখানি বেড়ে গেল। অর্থাৎ অনেকবার পড়তে হল। আনুপাতিক হারে মুখস্থর সময় বাড়ে না। বারোটা কথা মুখস্থ করতে যত সময় লাগে, পনেরোটা মুখস্থ করতে তার প্রায় দ্বিগুণ সময় লাগে। তিনটে কথা বাড়ার দরুণ অঙ্কের হিসেবে কিন্তু চার ভাগের এক ভাগ সময় বাড়া উচিত ছিল। একবার পড়ে বা শুনে যতগুলো বাক্যাংশ বা syllable মনে রাখা যায়, সেইটেই সে ব্যক্তির মুখস্থ-শক্তির পরিমাপক একক। স্মৃতির পরিমাপ বা memory span বের করবার এই হচ্ছে প্রথম প্রচেষ্টা। এর জন্যেই এবিংহোসের এত নাম। এ ছাড়াও ভূরি ভূরি তথ্য সরবরাহ করে গেছেন ভদ্রলোক। লিখতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। তার আর একটির উল্লেখ করে এই নীরস আলোচনায় ছেদ টানব। জানি, তোমার অনুসন্ধিৎসা আর জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা হয়ত অসীম, কিন্তু আমার জ্ঞানদানের বাসনা ও ক্ষমতা দুই-ই সীমিত। পড়তে পড়তে তোমার সুন্দর ভ্রূ কুঞ্চিত হোক, চোখে বিরক্তির ছায়া নামুক, এ আমি চাই না।

মুখস্থ করার সব থেকে কার্যকর পদ্ধতি কি? ধর, তোমাকে কাল আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় একটা কবিতা আবৃত্তি করতে হবে। আজকের মধ্যেই মুখস্থ করা দরকার। একটানা ঘণ্টা খানেক ধরে বার বার কবিতাটা পড়বে না আধঘণ্টা অথবা পনেরো মিনিট করে পড়ে খানিকটা সময় বিরতি দেবে? কি ভাবে তাড়াতাড়ি মুখস্থ হবে? এবিংহোসের পরীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা গেল যে "spaced repetition was better than continuous and unspaced repetition।" একটানা পড়ার থেকে পড়া—থামা—পড়া,—এই পদ্ধতিই শ্রেয়। পরবর্তীকালের এই পদ্ধতির গবেষকরা অনেক কিছু নতুন তথ্য সরবরাহ করেছেন।

মনে রাখা শুধু বাক্য-অনুষঙ্গ অথবা বার বার পড়া বা শোনার উপরই নির্ভর করে না। বাক্য-অর্থের তাৎপর্যেরও স্মৃতির ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আছে। এ ছাড়া, শিক্ষার্থীর মনোভাব ও উদ্দেশ্যের সঙ্গেও মনে রাখা না রাখার নিগূঢ় সম্পর্ক। মুখস্থ করা বা মনে রাখার ব্যাপারে আমরা সকলেই বিভিন্ন রকমের, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পদ্ধতির প্রয়োগ করে ফললাভ করে থাকি। সে পদ্ধতি অন্যের পক্ষে অচল। ইতিহাস পড়ার সময় তোমার ছোট বোন সারা দেহ আন্দোলিত করে ছন্দের হিল্লোল তোলে। জীবনানন্দের কবিতা আবৃত্তি করার সময় তুমি ঘাড়টা বাঁ পাশে বেঁকিয়ে অল্প অল্প দোলাতে থাক; নিশ্চয়ই ঐ ভাবে মুখস্থ করেছিলে। কেউ-বা নিজস্ব উদ্ভাবিত অনুষঙ্গ আরোপ করে প্রয়োজনীয় তথ্য মনে রাখবার চেষ্টা করে। বাড়ীর ও টেলিফোনের নম্বর মনে রাখার অনেকেরই নিজস্ব পদ্ধতি আছে। নিজস্ব পদ্ধতি প্রয়োগ করে অনেক সময় শ্রুতিধর বলে অন্যকে হকচকিয়ে দিয়ে থাকে। একজন সোভিয়েত লেখক এইরকম একজন শ্রুতিধরের আশ্চর্য ক্ষমতার গোপন রহস্য উদ্ঘাটন করে দেখিয়েছেন, নিজের উদ্ভাবিত অনুষঙ্গের সাহায্যে কি ভাবে স্মৃতিশক্তির অদ্ভুত পরিচয় দেওয়া যায়। ঘটনাটা বলছি, শোনো। শ্রুতিধর উঁচু চেয়ারে বসে আছেন। একটু দূরে দর্শকমণ্ডলী। তাদের প্রত্যেককে ধীরে ধীরে একটা করে যা খুশী শব্দ উচ্চারণ করতে বলা হল। অবশ্য শব্দটি অর্থবহ হওয়া চাই। শ্রুতিধর প্রত্যেকটি কথককে একটি করে সংখ্যা দিয়ে সূচিত করলেন। তাদের ঐ সংখ্যাটি লিখে রাখতে বলা হল। এইরকম আটচল্লিশটি জন ব্যক্তি আটচল্লিশটি কথা উচ্চারণ করলেন; শ্রুতিধর তাদের আটচল্লিশটি ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা-সূচিত

করলেন। তারপর তারা (কোনো নির্দিষ্ট নিয়মে নয়, যখন যার খুসী) নিজেদের শব্দগুলো আবার আউড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতিধর আউড়ে গেলেন তাদের সূচক-সংখ্যাগুলি। তারপর দর্শক অষ্টাচত্বারিংশত একে একে তাদের সূচক-সংখ্যা জানালো, আর শ্রুতিধর বললেন সংখ্য-অনুগত যথাযথ শব্দগুলো। সাতচল্লিশটি নির্ভুল হল। কী ভাবে এটা সম্ভব হল? শৈশবে ভদ্রলোক পঞ্চাশটি অতি প্রচলিত শব্দ এবং পঞ্চাশটি সংখ্যা পরস্পর সম্পর্কিত করে কণ্ঠস্থ করেছিলেন। দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধর, চেয়ার সূচক সংখ্যা ১, টেবিল সূচক সংখ্যা ২, রাস্তা সূচক সংখ্যা ৩, ইত্যাদি। যখনই শ্রোতারা একটি শব্দ উচ্চারণ করলো তখনই শ্রুতিধর ঐ শব্দ এবং নিজের সংখ্যা-সূচিত শব্দটি দিয়ে বাক্য রচনা করে দুটি শব্দ অনুষঙ্গিত করলেন। যেমন যেই একজন বলল—পিয়ানো, তিনি অমনি মনে করলেন চেয়ারে না বসে পিয়ানো বাজানো যায় না। চেয়ারের সূচিত সংখ্যা ১। পিয়ানো→চেয়ার→১, এইভাবে নতুন অনুষঙ্গ-শৃংখল তৈরী হল। একজন দর্শকের 'ট্রাউজার' শব্দটিকে রাস্তা, তথা সংখ্যা ৩ এর সংখ্যা সংযুক্ত করলেন। ট্রাউজার পরে ছাড়া রাস্তায় বের হওয়া চলে না—এইভাবে ট্রাউজারের অনুষঙ্গে 'রাস্তা' শব্দটি তার মনে এল। পিয়ানো থেকে চেয়ার, চেয়ার থেকে ১; ট্রাউজার থেকে রাস্তা, রাস্তা থেকে ৩; আবার উল্টোদিকে ১ থেকে চেয়ার, চেয়ার থেকে পিয়ানো···ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন উঠবে শ্রুতিধরের দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষঙ্গ চেয়ার-পিয়ানো সম্পর্ক তিনি ঠিক রেখেছিলেন কি ভাবে? পিয়ানো বললে চেয়ার মনে হওয়া যতটা সোজা, চেয়ার থেকে পিয়ানো মনে আসা ততটা সোজা কি? ব্যাপারটা সম্বন্ধে তোমার মতামত জানতে চাই।

অনুষঙ্গের সাহায্যে মনে রাখার আর এক ধরনের দৃষ্টান্ত শোনো। তুমি জানো নিশ্চয়ই, বারোটি নার্ভ মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়ে দেহযন্ত্রকে সংচালিত করছে। এদের নাম যথাক্রমে Olfactory, Optic, Oculomotor, Trochlear, Trigeminal, Abducens, Facial, Acoustic, Glossopharyngeal, Vagus, Accessory এবং Hypoglossus। এইগুলোকে পর্যায়ক্রমে মনে রাখবার জন্য আমেরিকার ছাত্ররা একটা ছড়ার ছুটো পংক্তির সাহায্য নিয়ে থাকে: On One Olympus Tiny Top A Finn And German Viewed a Hop. হবু ডাক্তাররা সব দেশেই ভেষজবিদ্যার এক একটি

মৌলিক দ্রব্য থেকে প্রস্তুত বিভিন্ন ওষুধের নাম (Aqua, Extract, Tincture ইত্যাদি) মাত্রা সমেত মনে রাখবার জন্য ঐ রকম ছড়া-অনুষঙ্গের সাহায্য নিয়ে থাকে।

শ্রুতিধর কিন্তু আছে। হরিনাথ দের স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য গল্প প্রচলিত আছে। নানা ভাষার ক্লাসিক অনবরত মুখস্থ বলে যেতে পারতেন। শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক থেকে যে কোনো লাইন বললে, তিনি নাকি পরবর্তী লাইনগুলো গড় গড করে আউড়ে যেতে পারতেন। কিছুদিন আগে একটা পত্রিকায় তাঁর আরো আশ্চর্য এক ক্ষমতার কথা পড়েছি! কোনো লাইনের পরবর্তী লাইনগুলো শুধু নয়, পূর্ববর্তী পংক্তিগুলোও তিনি উল্টোদিক থেকে বলে যেতে পারতেন। পূর্বানুবৃত্তি নয়, উত্তরানুবৃত্তি। পাতার নীচ থেকে তিনি ক্রমশ উঁচুতে উঠতে থাকতেন। খুবই আশ্চর্য! তাই নয় কি?

প্রায় তিরিশ বত্রিশ বছর আগে বারাণসীতে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তিনি অনেকদিন আগে পড়া ইতিহাস গড় গড় করে মুখস্থ বলে যেতেন। সবুজ-পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রবন্ধের বেশ কিছু লাইন তাঁর মুখে শুনেছি। আর একজন বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি ঐতিহাসিক ঘটনার সন, তারিখ নির্ভুলভাবে অনর্গল বলে যেতে পারেন। হরিনাথ দের মত না হলেও এঁদের স্মৃতিশক্তিও বিস্ময়কর।

'সংখ্যার মানবযন্ত্র' বলে খ্যাত হয়েছেন যাঁরা, তাঁদেরও খ্যাতির মূলে মনে রাখবার আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে। ষোলটি সংখ্যা দিয়ে ষোলটি সংখ্যার গুণফল, কুড়িটি সংখ্যার কোনো রাশির বর্গমূল ইত্যাদি অল্প সময়ের মধ্যে সঠিকভাবে বলতে পারার দৃষ্টান্ত একেবারে বিরল নয়। সংখ্যা-স্মৃতি এদের অত্যদ্ভূত।

স্মৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বিস্মৃতি, যেমন আলোর সঙ্গে যুক্ত অন্ধকার। স্মৃতি-বিস্মৃতি মস্তিষ্কের পরিপূরক গুণ। স্মৃতি বিস্মৃতি দুই-ই জীবনধারণের পক্ষে অতি আবশ্যিক ধর্ম। জীবনের দুঃখ-বেদনার ইতিহাস ভুলতে না পারলে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। প্রসবের কষ্ট ভুলে গিয়ে সন্তানের হাসিটি মনে রাখার ফলেই সৃষ্টিধারা অব্যাহত। অনেকের মতে আমরা কিছুই ভুলি না, সময় বিশেষে, উপযুক্ত অনুষঙ্গ সমাবেশে অনেক ভুলে যাওয়া ঘটনা মনে এসে পড়ে। আমরা আসলে বাছাই করে মনে রাখি, বাছাই করে ভুলে যাই। বলা চলে, প্রক্ষোভ-উদ্রেককারী ঘটনা মনে করার ব্যাপারে আমরা বিশেষভাবে পক্ষপাতমূলক। সাধারণভাবে

আমাদের ধারণা, সাম্প্রতিক ঘটনা অতীতের থেকে বেশি মনে থাকে। আমার মত বৃদ্ধদের বেলায় এ নিয়ম খাটে না। বৃদ্ধদের মস্তিষ্ক ও মানসিকতার বৈশিষ্ট্যের ফলে সাম্প্রতিক কোনো কিছু তাদের স্মৃতিপটে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হয় না। যান্ত্রিক স্মৃতি, নতুন ভাষা শেখবার ক্ষমতা বৃদ্ধ বয়সে থাকে না। ধরণী যখন আমাদের চোখে তরুণী ছিল তখনকার, আমাদের শৈশব কৈশোরের, স্বর্ণময় (?) দিনগুলির অনেক কিছু আমাদের স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে! চল্লিশ বছর আগে দেখা কৈশোরের সহপাঠী শ্মশ্রুগুম্ফ আচ্ছন্ন মকসুদ আলিকে ফকির-হাটের এক দোকানে দেখেই চিনতে পারি; আর সাতদিন আগে দেখা রোগীদের নাম মনে আসে না। কিন্তু তাদের রোগ ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে পড়ে যায়। আসলে মনে রাখার সঙ্গে শুধু বয়স নয়, প্রয়োজন এবং মনযোগও জড়িত।

বৃদ্ধ বয়সের স্মৃতি-চর্চা প্রসঙ্গে এক মনস্তাত্ত্বিক-উল্লিখিত একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল। এক বৃদ্ধ নিউইয়র্কের এক হাসপাতালে শুয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন। তাঁর শৈশব কেটেছে জন্মভূমি ইতালীতে, কৈশোর কেটেছে ফরাসী দেশে, তারপর থেকে সারাজীবন আমেরিকায়। প্রথমে তিনি কথা বলছিলেন ইংরাজিতে, অবস্থার অবনতি হতে তিনি ফরাসী ভাষায় কথা বলতে সুরু করলেন, মৃত্যুর দিনে তাঁর মুখে শোনা গেল ইতালির ভাষা।

[৮]

ফ্রয়েডের নির্জ্ঞানতত্ত্বে যে আদিম স্মৃতি-ভাণ্ডারের উল্লেখ আছে, সে সম্বন্ধে তুমি আরো কিছু জানতে চেয়েছ। বেশ, অবহিত হও—জানাচ্ছি।

আদিম মানবের যৌন প্রকৃতি ও ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তির স্মৃতি আমাদের নির্জ্ঞান আধারে সঞ্চিত;—এই হল ফ্রয়েডের অভিমত। স্মৃতি-ভাণ্ডারে একদিকে আছে সমকামেচ্ছা, অসমকামেচ্ছা, অজাচার প্রবণতা, আত্মরতিপ্রবৃত্তি (যার মূলে আবার স্বমেহইচ্ছা), আর অন্যদিকে আছে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী ইত্যাদিকে হনন-ইচ্ছা। এই ইচ্ছা বা প্রবণতা সম্পর্কে আমরা অবহিত নই, কেননা এগুলো বিশেষভাবে বিস্মৃত ও নির্জ্ঞান-আশ্রয়ী। এরা দুর্দম মানসিক শক্তির বাহক, সর্বদা নির্জ্ঞানের কারাগার ভেঙে স্মৃতিপথে উদিত হবার জন্য উন্মুখ। পারছে না,—কেননা নির্জ্ঞানের আর এক প্রকোষ্ঠে রয়েছে সুপার-ইগোর

নিষেধকারী প্রবণতা,—'টাবু'। 'টাবু'র স্মৃতিও আপাত-বিস্মৃত হলেও কম শক্তিশালী নয়। এই নির্জ্ঞানস্মৃতি জাতিজনিসম্ভূত,—ইংরিজিতে যাকে বলা হয় 'ফাইলোজেনেটিক'। এই দুই অন্ধশক্তির সংগ্রামে 'ইগো' বা অহং—যার অধিষ্ঠান সংজ্ঞান মনে, অনেকটা মধ্যস্থের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। আবার এই জাতীয় স্মৃতি বা অভিজ্ঞতাকে আমরা শৈশব থেকে, এক থেকে তিন বছরের মধ্যে, নিজের অজ্ঞাতে অবদমিত করে যাচ্ছি; অসামাজিক প্রবৃত্তিজাত কাম ও ধ্বংসাত্মক প্রবণতাকে নির্জ্ঞান প্রকোষ্ঠে নির্বাসিত করে সমাজ-সভ্যতার সংগে নিজেদের অভিযোজিত করছি। এই স্মৃতি ব্যক্তি-জনিকেন্দ্রিক, যাকে বলা হয় 'অন্টোজেনেটিক'। এই লিবিডো-তত্ত্ব অন্য প্রসঙ্গে তোমাকে জানিয়েছি; স্মৃতিপ্রসঙ্গে আরো একবার বললাম।

এর সংগে অবশ্য আধুনিক গবেষকদের স্মৃতি-তাত্ত্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। আধুনিক নাট্যকার ঔপন্যাসিকদের উদ্বুদ্ধ করলেও, মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানী বা বস্তুবাদী মনস্তাত্ত্বিকদের কাছে এই তত্ত্বকথার ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া অন্য কোনো মূল্য নেই।

স্মৃতি নিয়ে সব দেশেই নতুন নতুন গবেষণা চলছে। 'সাইবারনেটিক্স', আণবিক জীববিদ্যা, জৈবরসায়নশাস্ত্র, ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে। এই সব ল্যাবরেটরীতে স্মৃতি নিয়ে যে সব কাজকর্ম হচ্ছে, তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি।

সংবাদের প্রতিলিপি গ্রহণ ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়া না জানলে স্মৃতিতত্ত্ব বোঝা যাবে না। মস্তিষ্ক কতগুলো খণ্ড-সংবাদ প্রতি সেকেণ্ডে গ্রহণ করতে পারে? একজন বৃটিশ মনস্তাত্ত্বিক হিক্ বললেন,—অবশ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর, আমাদের মস্তিষ্ক সেকেণ্ডে গড়ে মাত্র পাঁচটি সংবাদ গ্রহণ করতে পারে। তিনি মাত্র বারোটি রুটিন-সংকেত নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন; তাছাড়া, সংকেত গ্রহণের সাড়া হিসেবে তিনি বাচনিক ও অঙ্গসঞ্চালক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছিলেন। সাড়া দিতে কতটা সময় লেগেছে সেটা হিসেব করেন নি আর সংকেতের তাৎপর্য নিয়েও মাথা ঘামান নি। সাধারণ রুটিন-মাফিক সংকেতে সাড়া দেওয়া এক জিনিষ, আর গুরুত্বপূর্ণ বিপদের সংকেতে সাড়া দেওয়া অন্য জিনিষ। মস্কো ইউনিভারসিটির গবেষকরা দেখেছেন যে বিপদের সংকেতে মস্তিষ্ক অনেক তাড়াতাড়ি সাড়া দিয়ে থাকে। সংকেতের তাৎপর্য ও গুরুত্বটাই আসল।

মস্কোর গবেষকদের পরীক্ষার ফলাফলে জানা গেল যে মস্তিষ্ক সজ্ঞানে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় পঁচিশ খণ্ড সংবাদে সাড়া দিতে পারে। অবশ্য সংকেতগুলো এমন হওয়া চাই যাতে তোমার বিচার-বিবেচনা পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার আছে।

একটা খবর আমাদের মস্তিষ্কে পৌঁছে দশ সেকেণ্ড মাত্র সংজ্ঞান-রাজ্যে অবস্থান করে। জার্মান মনস্তাত্ত্বিক হেলমার এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ঢং ঢং করে ঘড়িতে দশটা বাজছে। তুমি তখন হয়ত ফিতে খুলে কেশদাম এলায়িত করতে ব্যস্ত, স্নানের সময় হয়েছে। ঘড়িতে পাঁচবার ঢং ঢং শব্দ হবার পর তোমার খেয়াল হলে তুমি কটা বাজল ঠিকমত শুনতে পারবে; আটবার, নবার শব্দ হবার পর সঠিকভাবে ধরতে পারবে না কটা বেজেছে। তাঁর মতে স্মৃতি-ভাণ্ডার দুটো; একটা স্বল্পমেয়াদী অন্যদা দীর্ঘমেয়াদী। স্বল্পমেয়াদী ভাণ্ডারে তাৎক্ষণিক ক্রিয়াকর্মে লাগতে পারে এমনি সব প্রতিলিপি প্রতিধ্বনি (যা ইন্দ্রিয়সংকেতে তুমি জানতে পারছ) সঞ্চিত। এই স্বল্পমেয়াদী ভাণ্ডারকে সক্রিয় স্মৃতি-ভাণ্ডারও বলতে পারো। অবিলম্বে কাজে লাগবে না, এমনি সব প্রতিলিপি প্রতিধ্বনি অন্য ভাবে দীর্ঘমেয়াদী ভাণ্ডারে, তোমার অজ্ঞাতসারেই জমা হতে থাকে। প্রয়োজনমত চিত্তপটে উদিত হয়ে তোমার চিন্তাভাবনা কাজকর্মকে প্রভাবিত করে।

স্বল্পমেয়াদী স্মৃতির পরিমাপের একটা মোটামুটি হিসেবও দিয়েছেন হেলমার। ১৬০ টুকরো খবর নাকি তুমি তাৎক্ষণিক কাজের জন্য মনে রাখতে পারো। কিভাবে এই হিসেবে পৌঁছুলেন? একটা পরদার ওপর এক সেকেণ্ডের দশ ভাগ অন্তর কতকগুলো অক্ষর নিয়মিত ভাবে দেখানো হলে তুমি প্রতি সেকেণ্ডে ১৬টার বেশি অক্ষর দেখে মনে রাখতে পারবে না। দেখানোর সময় যদি বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে কি বেশি সংখ্যক মনে রাখতে পারবে? না। মোটকথা, মস্তিষ্কের গ্রাহীক্ষমতা ঐ ষোলোর বেশি নয়। এটা অবশ্য হেলমারের মতে, 'lower threshhold'। প্রতি সেকেণ্ডে ১৬ টুকরো সংবাদ বা অক্ষর মস্তিষ্কে পৌঁছে দশ সেকেণ্ড করে থাকছে। কাজেই ১৬×১০=১৬০ হচ্ছে তোমার short term memory capacity; এর মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক খবর দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতি তহবিলে জমা পড়ছে; আর প্রায় সেই সংখ্যক খবর এক সেকেণ্ডে মগজ থেকে বেরিয়ে গিয়ে নতুনের জায়গা করে দিচ্ছে। কী খবর এলো, পুরণো স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়ে তার অর্থ অনুধাবন করতেই অর্ধেক সংবাদ-উদ্দীপককে

কাজে লাগাতে হয়। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। ধর, সিনেমা দেখতে গেছ। যে ছবিটি দেখানো হবে প্রথমে পর্দার উপর তার শিরোনামাটি উজ্জ্বল হয়ে ভেসে উঠল। "কল্মাসপাদ নাটক—কুইক্টট বিরচিত"। ১৬টি অক্ষরের অর্ধেক, মানে ৮টি তোমার প্রত্যক্ষ গোচর হবে; আর ৮টি মস্তিষ্ককে উদ্দীপ্ত করে স্মৃতিভাণ্ডার থেকে অর্থবহ উপাত্ত খুঁজতে লেগে যাবে। এই হল মোটামুটি মস্তিষ্কের গ্রাহী এবং সংরক্ষণক্ষমতা সম্পর্কিত সামান্য কিছু তথ্য।

* * * *

মস্তিষ্কে স্মৃতি সংরক্ষিত হয় কি ভাবে? এই 'মেমারি মেকানিজম' বোঝবার চেষ্টায় আজ বিজ্ঞানীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। একটা কথা বা দৃশ্য বা গন্ধ কি ভাবে মস্তিষ্ককোষে ছাপ তৈরী করে, এবং কি ভাবে ভবিষ্যতের দরকারে সেই ছাপ থেকে মূর্ত স্মৃতি ফুটে ওঠে? কয়েক বছর আগে পর্যন্ত এ সম্পর্কে আমাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না। বিগত ২০।২৫ বছরে আমরা অনেকটা এগিয়েছি। তোমার মুখচন্দ্রিমা একদিন আমার অপটিক নার্ভকে উদ্দীপ্ত করে মস্তিষ্কের পেছনদিকের কোষগুলোতে কিছু বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন এনেছিল। তার ফলে, চোখের ক্যামেরায় ধরা পড়া তোমার মুখচ্ছবি কোষগুলোতে পাকাপাকি ভাবে মুদ্রিত হয়ে গেল! যখন খুসী তোমার মুখখানির ছায়া মনের আয়নায় ফেলে তোমাকে দেখার সাধ অন্তত আংশিক মেটাতে পারি। এমনি হাজার হাজার দৃশ্য, শব্দ, ঘটনা, গন্ধ, স্পর্শ, স্মৃতি-ভাণ্ডারে তাদের বৈশিষ্ট্য স্বাতন্ত্র্য নিয়ে জমা হয়ে রয়েছে। মস্তিষ্কে তাদের স্থায়ী ছাপ পড়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা এই ছাপের নাম দিয়েছেন 'engram'। এই 'এনগ্রামে'র সঠিক প্রকৃতি হয়ত জানতে এখনও দেরী হবে, কিন্তু জানবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং অনুসন্ধানের ঔৎসুক্য ও তীব্রতা বেড়েছে। স্মৃতি-ভাণ্ডার এবং এন্গ্রাম সম্পর্কিত গবেষণায় পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্তক্রিয়ার পরীক্ষা-পদ্ধতি ও বার্জারের ইলেকট্রো-এনসেফালোগ্রাম যথেষ্ট কাজে লাগছে। আর প্রজননবিদ্যার নবতম আবিক্রিয়া—জিন সম্পর্কিত জ্ঞান স্মৃতি-গবেষণাকে বিশেষ সাহায্য করছে।

তুমি যা দেখছ বা শুনছ, সেটা মস্তিষ্কে স্মৃতি হয়ে সংরক্ষিত হচ্ছে সংকেত-লিপির সাহায্যে। স্মৃতিভাণ্ডার অভিজ্ঞতার 'coded representation'-এ ভরতি। জিনের মাধ্যমে বংশগতির ধারা সংক্রমিত হয়। জিনের মধ্যে প্রজাতির দেহ-সংগঠনের সংবাদ ও পদ্ধতি সাংকেতিক ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

ডি-এন-এ-তে সেই সংকেতলিপি বা প্রজাতি-স্মৃতি সংরক্ষিত আর দূত আর-এন-এ সেই সংকেত অনুযায়ী সংবাদ ও রূপকল্প বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। ভ্রূণ থেকে পূর্ণাবয়ব শিশু, শিশু থেকে পূর্ণ-বয়স্ক মানুষ গড়ে উঠছে জিনের মধ্যে সংরক্ষিত স্মৃতির সংকেত-লিপির ইংগিতে। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন 'ফাইলোজেনেটিক মেমরি'র বেলায় যে রকমটি ঘটেছে, 'অন্টোজেনেটিক মেমরি'র বেলায়ও হয়তো সেই রকমটি ঘটছে।

জানো বোধ হয়, জীববিজ্ঞান এখন আর কোষভিত্তিক নয়। কোষের অণু-গুলোর ক্রিয়াকলাপ ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের দৌলতে এখন বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে রাইবোনিউক্লিক এ্যাসিডের (আর এন এ) অণুর সঙ্গে স্মৃতি সংরক্ষণ বিশেষভাবে সম্পর্কিত। খুব অবাক লাগছে নিশ্চয়ই। প্রথম শুনলে অবাক লাগবারই কথা। ডি-এন-এ, আর-এন-এ—এই কথাদুটো এ যুগের সব শিক্ষিত ছেলেমেয়েদেরই জানা। অনেকবার সাময়িক পত্রের পাতায় কথাদুটো নিশ্চয়ই তোমার চোখে পড়েছে। তবে কোথায় প্রজনন সংশ্লিষ্ট আর-এন-এ, আর কোথায় স্মৃতিরসংক্ষণ! আমারও প্রথম শুনে অবাক লেগেছিল।

স্মৃতি ও আর-এন-এর সম্পর্ক সংক্ষেপে বিবৃত করছি। মস্তিষ্ক নিউরণের আর-এন-এর পরিমাণ একটা শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে পঠবার পরই বেড়ে যায়। কোন নতুন কিছু শেখা মানেই নতুন শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে তোলা। আর শেখা মানেই মনে রাখা। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে আরও জানা গেছে যে, পরীক্ষাধীন প্রাণীর মস্তিষ্ককোষের আর-এন-এ গুণগতভাবে, পরীক্ষাধীন নয় এমন প্রাণীর (অর্থাৎ যাকে নতুন কিছু শেখানো হচ্ছে না) মস্তিষ্ককোষের আর-এন-এ থেকে আলাদা। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে নতুন শিক্ষাটির স্মৃতির 'কোডমেসেজ' আর-এন-এ অণু ধারণ করার ফলেই তার মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে। শর্তাধীন পরাবর্ত (কণ্ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স) গড়ে ওঠা মানেই সংশ্লিষ্ট মস্তিষ্ককোষের আর-এন-এ'র গুণগত পরিবর্তন।

এবার একটা মজার পরীক্ষার কথা বলছি। কতকগুলো পোকাকে তাদের দেহে আলোকরশ্মিপাতের সঙ্গে সঙ্গে দেহ সঙ্কুচিত করতে শেখানো হল। সঙ্কুচিত না করলে যন্ত্রণাদায়ক বৈদ্যুতিক শক লাগবার সম্ভাবনা। এই নতুন কণ্ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স তৈরী হবার পর পোকাগুলোকে টুকরো টুকরো করে কেটে খলনুড়ীতে

পিষে ফেলা হল। এবার ঐ জাতের অন্য পোকাদের খাবারের সঙ্গে এই পেষা মাংস মিশিয়ে তাদের ভূরিভোজে আপ্যায়িত করার পর, তাদের মধ্যে আলোকজাত দেহ-সঙ্কুচন রিফ্লেক্স গড়ে তোলা হল। দেখা গেল নতুন রিফ্লেক্স গড়ে তুলতে অনেক কম সময় লাগছে, অর্ধেকেরও কম। প্রথম ব্যাচের শিক্ষিত ভ্রাতাদের মাংসপুষ্ট দ্বিতীয় ব্যাচের কম সময় লাগার কারণ দ্বিতীয় ব্যাচের উপর প্রথম ব্যাচের স্মৃতিসংরক্ষক আর-এন-এ অণুর প্রভাব। ইঁদুর নিয়েও এরকম পরীক্ষা করা হয়েছে। কণ্ডিশন্‌ড ইঁদুরের (শিক্ষিত) মস্তিষ্ককোষের আর-এন-এ ইনজেকশন দেবার ফলে অশিক্ষিত ইঁদুরদের প্রশিক্ষণ সময় অনেকখানি কমে গেছে। অন্য জাতের প্রাণীর উপর ইনজেকশনে কোন ফল পাওয়া যায় নি।

পরীক্ষাগুলোর ফলাফল যাই হোক না কেন, ব্যাপারটা হজম করা খুবই কঠিন। আর-এন-এর মধ্যে নতুন শিক্ষার স্মৃতির ছাপ পড়ে স্বীকার করে নিলেও, একথা বিশ্বাস করা বেশ কষ্টকর যে ঐ স্মৃতিসংরক্ষক অণুগুলো নতুন প্রাণীর দেহের সব বাধাগণ্ডী পেরিয়ে সরাসরি তার মস্তিষ্ককোষে অক্ষত অবস্থায় অনুপ্রবেশ করে তাদের নতুন শিক্ষাগ্রহণ সহজতর করে তোলে। তবে একথা আর অস্বীকার করা চলে না যে, স্মৃতির ব্যাপারে মস্তিষ্ককোষের আর-এন-এ অণুর বিশেষ অবদান আছে। অন্যান্য নানা ধরনের তথ্য প্রমাণ থেকে এই ধারনা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিশক্তি কমতে থাকে, সবাই জানে। সঠিক কারণ এখনও জানা যায় নি। কিছুদিন আগে এক ভদ্রলোক আমার কাছে স্মৃতিবিভ্রমের চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন। বয়স ৬৫, কয়েকমাস আগে তাঁর 'প্রসটেট' অপারেশন হয়েছে। 'প্রসটেট' গ্ল্যাণ্ড যৌন-প্রজনন-ব্যাপারের সঙ্গে সম্পর্কিত। কয়েকবছর আগে আরো দুটি এই ধরনের রোগী দেখেছিলাম। এ থেকে কিছু অনুমান বা সিদ্ধান্ত তোমাকে করতে বলছি না। ব্যাপারটা জানিয়ে রাখলাম।

[৯]

এইবার সম্মোহন পর্ব। এই সম্মোহন তত্ত্ব উপস্থাপিত করবার জন্য বিরাট ভূমিকা তোমাকে শুনিয়েছি। ঘুম স্বপ্ন স্মৃতি ইত্যাদির শারীরবৃত্তিক মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তোমাকে শুনতে হয়েছে। এতদিনে বহু-প্রতীক্ষিত সম্মোহন পর্বের অবতারণা করার সুযোগ পেলাম। ঘুমের কথা দিয়েই সুরু করছি।

শিশুকে ঘুম পাড়ানোর কৌশল নিশ্চয়ই জানো। একটানা একঘেয়ে মৃদুকণ্ঠে গাওয়া ঘুমপাড়ানি গান সব দেশের শিশুদের ঘুম আনবার চিরন্তন পদ্ধতি। 'ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো'-র সুর ও ছন্দ সব ভাষাতে একই রকম। বৈচিত্র্যহীন একটানা কণ্ঠের বক্তৃতা শুনতে শুনতে পেছনের সারির অনেক শ্রোতাই ঝিমুতে থাকে। সংবেশকের কণ্ঠের একই লাইনের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি রোগীর সংবেশন-নিদ্রা নিয়ে আসে। শিশুকে ঘুমপাড়ানো আর রোগীকে ঘুম পাড়ানোর প্রণালীর মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ নেই। তাছাড়া চিকিৎসক-সংবেশক বারবার রোগীকে অভ্যস্ত ঘুমের পরিবেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ঘুম আনতে সাহায্য করেন। অভ্যস্ত পরিবেশে সহজেই ঘুম আসে, নতুন জায়গায় নতুন পরিবেশে ঘুম আসতে চায় না।

স্বাভাবিক ঘুম আর হিপনটিক ঘুমের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য থাকলেও, দুই ঘুম পুরোপুরি এক ধরনের নয়। স্বাভাবিক ঘুমে মস্তিষ্কের নিস্তেজনা-নিদ্রাতরঙ্গ, বিনা বাধায় সারা মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু হিপনটিক ঘুমে মস্তিষ্কের অংশবিশেষ, যে অংশ সংবেশকের কণ্ঠস্বর ও নির্দেশে উদ্দীপিত হচ্ছে, জেগে থাকে। এই অংশ সম্মোহিত রোগীর বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র পথ। পথরক্ষী মাত্র একজন—সংবেশক-চিকিৎসক। তাঁর নির্দেশ ছাড়া অন্য কারুর নির্দেশ রোগীর উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম নয়। হিপনটিক ঘুম এক বিশেষ ধরনের ঘুম, নির্দিষ্ট কতকগুলো শর্তের উপর নির্ভরশীল। শর্তাধীন প্রতিক্রিয়ার এক সুন্দর দৃষ্টান্ত। পাভলভ আবিষ্কৃত শর্তাধীন প্রতিক্রিয়া (কণ্ডিশনড রিফ্লেক্স) সম্বন্ধে যাঁদের ধারণা আছে তাঁরা এই ঘুমের বৈশিষ্ট্য সহজেই বুঝতে পারবেন।

এই হল হিপনটিক ঘুম ও 'র‍্যাপোর্টের' (সম্মোহক-সম্মোহিতের সম্পর্ক) শারীরবৃত্তিক ব্যাখ্যা, পাভলভতত্ত্ব।

চিকিৎসকের নির্দেশ যথাযথ প্রতিপালিত করার বিরোধী কোন ইচ্ছা বা শক্তি রোগীর থাকে না। অভিভাবনের ফলে ব্যথা চলে যায়, ঠাণ্ডা কোনো জিনিষ রোগীর দেহে ছুঁইয়ে ফোস্কা পড়ানো যায়—এসব অতি-পরিচিত তথ্যের শারীরবৃত্তিক ব্যাখ্যা আজ আমরা কিছুটা অন্তত জানি। সম্মোহিত অবস্থায় মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ক্রিয়াক্ষমতা কমে যায়, কেন না, একটি জায়গা ছাড়া আর সব জায়গাই এ সময় নিস্তেজিত। এই অবস্থায় মস্তিষ্কের উপর মৃদু উদ্দীপক-জোরালো প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে,—এটা পরীক্ষিত সত্য। মৃদু উদ্দীপক,—

অভিভাবিত নির্দেশ-বাক্য মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট স্থানকে উত্তেজিত করার সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি অংশগুলো নিস্তেজিত হয়ে পড়ে। এই নিস্তেজনা-আরোহ (induced inhibition) মস্তিষ্কের অন্য একটি ধর্ম এবং পরীক্ষিত সত্য। চিকিৎসকের অভিভাবিত নির্দেশবাক্যটিই এখন মস্তিষ্কের একমাত্র পরিচালক, একচ্ছত্র সম্রাট। অন্য অংশ নিদ্রাচ্ছন্ন, কাজেই নিষ্ক্রিয়। মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থানের সংযোগ ব্যবস্থা এখন এই পরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন। বেদনাবাহী স্নায়ুপ্রবাহ পরিচালকের ইঙ্গিতে থেমে পড়তে বাধ্য। একেবারেই গরম নয় এমন কোন জিনিষ গায়ে ছুঁইয়ে চিকিৎসক উষ্ণতার নির্দেশ দিলে ফোস্কাও পড়বে। ফোস্কাপড়ার মত জটিল স্নায়ুপ্রক্রিয়াও এখন পরিচালকের অধীনে।

অনেকে নিজেকে সম্মোহিত করতে পারেন। তাঁদের ক্ষেত্রে স্ব-অভিভাবনও কার্যকরী হয়। ফরাসী দেশের এক মহাপুরুষের, ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মত, হাত পা দিয়ে রক্ত পড়তে দেখা গেছে। আমাদের দেশেও এক মহাপুরুষের পিঠে অন্য একজনের পৃষ্ঠদেশের আঘাতচিহ্ন অঙ্কিত হতে শোনা গেছে। এ-সবই স্বাভি-ভাবনের ফল, এর মধ্যে কোন বিভূতি বা অলৌকিকত্বের মহিমা নেই। মানসিক আঘাত পেয়ে রাতারাতি সব চুল পেকে গেল বা উঠে গেল,—এরকম ঘটনা খুব বিরল নয়। এই ঘটনাগুলো আর আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে না।

মনে রাখা দরকার, সম্মোহিত ব্যক্তিকে দিয়ে সব রকমের কাজ করানো যায় না। দুর্নীতির প্রবণতা যার নেই, তাকে দিয়ে নৈতিক অপরাধ অনুষ্ঠিত করা অসম্ভব। চুরি ডাকাতি ব্যাভিচার ইত্যাদি সম্মোহকের নির্দেশে যদি কেউ করে, বুঝতে হবে তার এই জাতীয় কাজের প্রতি বেশ খানিকটা আকর্ষণ ছিল। রাস-পুটিনকে নিয়ে অনেক গল্প চালু আছে, তার সবগুলো সত্যি বলে মনে হয় না।

এ ক্ষেত্রে অভিভাবন নির্দেশকে বাধা দিচ্ছে কে? বাধা দুদিক থেকে আসতে পারে। পরীক্ষা-নিরীক্ষাকালীন এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে আমরা প্রধানত পরিচিত। পরীক্ষাকালীন অভিভাবন-নির্দেশে হয়ত চিকিৎসক সংবেশকের আন্তরিক ইচ্ছার অভাব থাকে; অর্থাৎ তিনি হয়ত চান না সম্মোহিত ব্যক্তি দুর্নীতিমূলক কাজটি করুক। তাঁর কণ্ঠস্বরে হয়ত দৃঢ়তার অভাব থাকে, অথবা এমন কোন সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য থাকে যা শুধু সম্মোহিত ব্যক্তির কানেই ধরা পড়ে। কাজেই নির্দেশ প্রতিপালিত হয় না। অন্যদিক থেকে অর্থাৎ সম্মোহিত ব্যক্তির সত্তা সংরক্ষণের প্রশ্ন থেকেও বাধা আসতে পারে। কিছু কিছু সামাজিক বৃত্তি ও কোন কোন

নীতিবোধ আমাদের মস্তিষ্কের স্বভাবধর্মে পরিণত হয়ে যায়, সহজাত প্রবৃত্তির মত,—শর্তহীন প্রতিক্রিয়ার মত দৃঢ় ও অনড় হয়ে পড়ে। অভিভাবন-বাক্য এই ধারার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফলতা লাভে অক্ষম। মানুষ মূলত সামাজিক প্রবৃত্তি পরিচালিত এবং সামাজিক ধর্ম অনেক সময় আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিকেও হার মানায়।

সব মানুষকে সম্মোহিত করা যায় না। সম্মোহনের গভীরতাও সকলের সমান হয় না।

[১০]

'সম্মোহন' কথাটিতে তুমি আপত্তি তুলেছ। তোমার আপত্তি যুক্তিসঙ্গত। গ্রীক 'হিপনসিস'-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'সংবেশন'ই হওয়া উচিত। কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন ম্যাঞ্চেষ্টারের শল্য চিকিৎসক জেমস্ ব্রেইড্। 'সংবেশন' মানে শয়ন, নিদ্রা; আর আমার মতে 'হিপনসিস' ও এক ধরনের নিদ্রা। তবে সম্মোহন কথাটি ব্যুৎপত্তিগত অর্থে 'হিপনসিস' না বোঝালেও, পাঠক-সাধারণের কাছে বিশেষ তাৎপর্যব্যঞ্জক ও 'হিপনসিস'-এর সমার্থসূচক। জাদুবিদ্যার সঙ্গে বিজ্ঞানের আদিম সম্পর্ক তর্কাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলেও, একথা সর্বজনস্বীকৃত যে হিপনসিস জাদুতন্ত্র-পুরোহিততন্ত্র-কুহকীবিদ্যা-ভেলকিবাজির সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত ছিল এবং এখনও আছে। উচাটন-বশীকরণ-সম্মোহন ইত্যাদি অভিচার ক্রিয়ার সঙ্গে হিপনসিসকে এক করে দেখার প্রবণতা অনেকের মধ্যেই রয়েছে। তাছাড়া, তুমিও 'সম্মোহন' শব্দটি তোমার পত্রে ব্যবহার করেছিলে, তাই আমি এ যাবত শিরোনাম পরিবর্তনের কথা চিন্তা করিনি। আরো একটা দিক আছে। 'হিপনসিস' কথাটির মানে নিদ্রা হলেও, এখন আবার অনেক পণ্ডিত 'হিপনসিস'কে নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থা বলতে রাজি নন। নিদ্রার বহু লক্ষণই হিপনসিসে পাওয়া যায় না। এই সব কুটতর্কের প্রয়োজন বর্তমানে আমাদের নেই। প্রয়োজন হলে পরে তর্কের আসরে নানা যাবে। আমরা কিন্তু হিপনসিসকে ঘুমেরই রকমফের, নিদ্রা জাগরণের একটা অন্তর্বর্তী অবস্থা বলে মনে করি। পাভলভ শিষ্য ইভানভ স্মলেনস্কী এ বিষয়ে অনেক তথ্য প্রমাণ হাজির করেছেন। মনোবিদ্যার অনেক সময় লাগছে জাদুবিদ্যা অধ্যাত্মবিদ্যা থেকে বেরিয়ে আসতে। অনেক আজেবাজে অর্থহীন অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, অনেক অপ্রয়ো-

জনীয় তথ্য মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করার পথের বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হিপনসিসের বেলায় তো কথাই নেই। এখানে বাধা আরো বেশি, কুসংস্কার আরো দৃঢ়মূল। 'সংবেশন' কথাটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় এখনও নিবিড় হয়নি, 'সম্মোহন' কথাটির মধ্যে যে মোহ আছে তার সঙ্গে সাধারণের মনে 'হিপনসিস'-এর সংযোগ রয়েছে। আমার মতে, এই পর্যায়ের আলোচনায় শিরোনাম পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। এ্যানিমল ম্যাগনেটিজম্, মেসমেরিজম্, ইত্যাদির সমার্থক হিসেবে সম্মোহন কথাটি আমি ব্যবহার করছি না, বাংলা ভাষায় অনেকদিন ধরে কথাটি চালু বলেই ওটাকে বেছে নিয়েছি।

'হিপনসিস' সম্পর্কে নানারকম অদ্ভুত উদ্ভট ধারণা চালু আছে সত্যি, কিন্তু আবার এই বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ বিজ্ঞানঘেঁসা আলোচনা-পুস্তকেরও অভাব নেই। এক হাজারের বেশি বই, আট হাজারের বেশি প্রবন্ধ তুমি পেতে পার—যে গুলোকে মোটামুটি বিজ্ঞানভিত্তিক আখ্যা দেওয়া চলে। সবরকম মিলিয়ে প্রায় দশ হাজারে ওপর পুঁথিপত্তর এ নিয়ে লেখা হয়েছে। সব বই অবশ্য তোমার বোধগম্য ভাষাতে লেখা নয়, কিছু কিছু বই বর্তমানে দুর্লভ বা একেবারেই পাওয়া যায় না।

খুব অল্পকথায় সম্মোহনবিদ্যার পুরণো ইতিহাসটা বলে নেওয়া যাক। সব বইতে তুমি এসব কথা পড়তে পারো, আর অমিও পুরাতাত্ত্বিক বা ইতিহাসবেত্তা নই। নতুন কথা কিছু বলতে পারবো না। তবুও মনে হয়, আলোচনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে গেলে পুরণো ইতিহাস চোখের সামনে থাকা দরকার। তোমার সঙ্গে পত্রালাপের প্রথম দিকে পুরণো কথা কিছু তুলেছিলাম, হয়তো তোমার মনে নেই। থাকলেও ক্ষতি নেই; পুনরুক্তি সব সময় বিরক্তি উৎপাদন করে না।

গ্রীস মিশর চীন ভারত—সব পুরণো সভ্যতার আদিপর্বে ধর্মীয় ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে সম্মোহনের প্রয়োগও প্রচলন ছিল। খৃষ্টপূর্ব চারের শতকে গ্রীসে সম্মোহনচিকিৎসাবিধি চালু ছিল। অথর্ববেদে সম্মোহনের বিশেষ উল্লেখ আছে। গ্রীসদেশে উনিশ শতকের কিছু প্রস্তরে ক্ষোদিত লেখন আবিষ্কৃত হয়েছে। যা থেকে মনে হয় আরো অনেক প্রাচীনকালে চিকিৎসাক্ষেত্রে সম্মোহনের প্রয়োগ ছিল। এই সব লেখনে আছে দুরারোগ্য ব্যাধিমুক্তির সংবাদ এবং ব্যাধিমুক্তির জন্য পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। খৃষ্টপূর্ব চারের শতকে

এস্কুলিপিয়াসের যুগে চিকিৎসায় যে অভিভাবনের প্রচলন ছিল, এ বিষয়ে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ সংগৃহীত হয়েছে।

মহাভারতে শুধু সম্মোহন বাণ নয়, সম্মোহনের অন্যান্য প্রয়োগেরও উল্লেখ আছে।

সেই প্রাচীন কালে দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত রোগী অনেক মেহনত করে, কোন কোনো সময় কয়েকশত মাইল পথ পায়ে হেঁটে, কোনো নামকরা আরোগ্য-নিকেতনের দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির হতো, অনেক আশা নিয়ে। এই সব আরোগ্যনিকেতন ছিল ভগবানের বিচরণ বা লীলাক্ষেত্র। আরোগ্যমন্দিরে প্রবেশের আগে রোগীর পক্ষে অনেক কিছু আচার অনুষ্ঠান পালন অপরিহার্য ছিল। আরোগ্যমন্দিরের লোকজনের হাবভাব ব্যবহারে এবং তার আগেই লোকমুখে প্রচারিত অলৌকিক কাহিনী শুনে রোগীর মনে বিশ্বাস ও নিরাময়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। স্বপ্নে সে ঈশ্বরের দেখা পাবে এবং আরোগ্যের ব্যবস্থাপত্র জানতে পারবে। এই প্রত্যাশা নিয়ে সে সাময়িকভাবে আরোগ্যশালার বাসিন্দা হয়ে দিন কাটাতো। তারপর একরাত্রে রোগের দেবতা দেখা দিতেন এবং রোগ উপশমের ব্যবস্থা হয়ে যেত। প্রাচীনকালের কাহিনী আমাদের সঠিক জানা নেই। জানা নেই, দেবতাদের প্রতিনিধি আরোগ্যশালার পরিচালক দেবতা সেজে এসে অভিভাবনের সাহায্যে রোগ সারাতেন, না রোগী নিজেকে নিজে অভিভাবন দিয়ে রোগমুক্ত হতো। দুরকমই ঘটতে পারে। আমাদের দেশে বহু পীঠস্থানে এখনও হাজার হাজার রোগী রোগনিরাময়ের অভিলাষ নিয়ে বিশেষ বিশেষ দিনে সমবেত হয়ে থাকেন। তিরুপতি, তারকেশ্বর ছাড়াও বহুস্থানে জাগ্রত দেবতারা অধিষ্ঠিত। এর ওপর আছেন অনেক যোগী, বাবা, মহারাজ। শিষ্যদের আর্থিক পরমার্থিক সব ব্যাপারের নিয়ন্তা। ইয়োরোপেও এই রকম আরোগ্যনিকেতন নেই যে তা নয়। 'মিরাকল্ অফ্ লুর্ডস'-এর খবর তো তুমি জানো। এসব জায়গায় ঠিক কিভাবে অসুখ সারানো হয়, কি ধরনের রোগী ভাল হয়, আরোগ্যের হার কি রকম, আরোগ্য সাময়িক না স্থায়ী, এসম্পর্কে সঠিক তথ্যপ্রমাণাদির অভাব আছে। 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর',—এই সূত্র প্রয়োগ করলে প্রশ্নের মীমাংসা হবে না। হ্যামলেটের মত 'দেয়ার আর মেনি থিংগস্'—ইত্যাদি আওড়ালেও ব্যাপারটা বোধগম্য হবে না। আমার ধারণা অভিভাবনের প্রভাব ছাড়া এইসব রোগ নিরাময়ের আর কোনো সম্ভাব্য ব্যাখ্যা বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যায় না। অভিভাবন

কখনও জাগ্রত অবস্থাতে দেওয়া হয়ে থাকে। কখনও বা প্রসাদ-চরণামৃতের সঙ্গে মাদকদ্রব্য খাইয়ে ভক্ত-রোগীদের ঘুম পাড়িয়ে, অভিভাবন শোনানো হয়। স্বাভিভাবনের ফলেও কিছু কিছু রোগী আরোগ্যবিধির সন্ধান পেয়ে থাকেন। ভক্ত-রোগীরা অবশ্য বুঝতে পারেন না যে তাঁরা অভিভাবিত হয়েছেন বা সম্মোহিত হয়েছেন। তাঁরা মনে করেন দেবস্থানের মহিমা এবং পুরোহিত মোহান্তের অসামান্য ঐশী শক্তির প্রভাবে রোগমুক্ত হয়েছেন।

মধ্যযুগে হিপনসিস বা সম্মোহন ডাকিনীযোগিনী বিদ্যার সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে প্রাচীন যুগের মর্যাদা হারিয়ে 'ব্ল্যাক ম্যাজিক' আখ্যা পায়। সম্মোহককে সাধারণ মানুষ ভীতির চোখে দেখতে থাকে। ভাল কিছু হোক না হোক, এদের নজরে পড়লে ক্ষতি হবেই, এই ধারণা মানুষকে পেয়ে বসে। তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্যে দূর থেকেও শত্রুতা সাধন করা যায়, এই বিশ্বাস এখনও অনেকের মনে বিদ্যমান। 'তুক করেছে', 'বাণ মেরেছে',—রোগীদের মুখে এই সব কথা শুনতে আমরা অভ্যস্ত। ইংরিজী-শিক্ষিত সমাজে কুচক্রী—সুভনগলির তীব্র দৃষ্টিপাত, রুশ কূটনীতি-বিশারদ রাসপুটিনের কর্তৃত্বব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর,—সম্মোহনের সমার্থসূচক। তান্ত্রিক কাপালিক অলৌকিক ক্ষমতা ধারণ করেন ও তাঁদের ক্ষমতার উৎস তাঁদের সম্মোহন শক্তি—এ বিশ্বাস অনেকের মনে আজও বদ্ধমূল।

আধুনিক যুগের আরম্ভ মেসমারের সময় থেকে। আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে (১৭৮৪) মেসমার প্যারির বিজ্ঞানমণ্ডলীর কাছে তাঁর জৈবচুম্বকতত্ত্ব পেশ করেন। অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি সারানোর ফলে তাঁকে নিয়ে খুব হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। প্রথমে রোগীর গায়ে চুম্বক বসিয়ে, তারপর চুম্বকদণ্ড ছুঁইয়ে তিনি রোগীদের ঘুম পাড়াতেন ও ব্যাধি দূর করতেন। তিনি মনে করেছিলেন যাঁরা গ্রহ উপগ্রহের চৌম্বকশক্তি নিজের মধ্যে গ্রহণ করে বিশেষ আত্মিক বলে বলীয়ান হয়ে ওঠে তারাই জৈব-চুম্বকশক্তির প্রভাবে রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা লাভ করে। তাঁর এই জৈব-চুম্বকতত্ত্ব বিজ্ঞানমণ্ডলীর কাছে গ্রাহ্য হয়নি। মেসমারের তত্ত্ব টিকলো না, কিন্তু মেসমেরিজম্-এর রহস্য ও প্রভাব বেড়েই চলল। আঠারশো শতকের মাঝামাঝি সময়ে মেসমার প্রথম চিকিৎসাক্ষেত্রে সম্মোহনের প্রয়োগ করেন। প্রয়োগে নিপুণ হলেও তত্ত্বের দিক থেকে দৈন্যের ফলে প্যারিতে তাঁর তাঁর প্রতিপত্তি নষ্ট হয় এবং সম্মোহনচিকিৎসার অগ্রগতি ব্যাহত হয়। অবশ্য, অনুভূতি বিলোপের ওষুধ আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত মাঝে মাঝে অস্ত্রোপচারে

অবেদন সৃষ্টির জন্যে সম্মোহনের ব্যবহার চলতে থাকে। এরপর একেবারে উনিশ শতকের মাঝামাঝি (১৮৪৩) জেম্‌স্ ব্রেইডের গবেষণার ফলে সম্মোহন আবার চিকিৎসকমহলে আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। স্কটল্যাণ্ডের এই ডাক্তার জেমস্ ব্রেইড মেসমেরিজম্‌কে আংশিকভাবে রহস্য-যবনিকার বাইরে নিয়ে এলেন। তিনি বললেন—মেসমার-প্রভাবিত ঘুমের কারণ চোখের স্নায়ুতন্তুর ক্লান্তি। একদৃষ্টে উজ্জ্বল কোন বস্তুর দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখ আপনা থেকে বন্ধ হয়ে আসে এবং নিদ্রার সঞ্চার হয়। তিনি এই অবস্থার নতুন নামকরণ করলেন—হিপনসিস। 'হিপনস' কথাটির মানেই ঘুম। ঘুমের ব্যাখ্যা দিলেন, কিন্তু সংবেশক ও সংবেশিতের মধ্যে যে বিশেষ সম্পর্কটি গড়ে ওঠে তার সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। আর এই সম্পর্ক নিয়েই ত' যত কিছু রহস্যময় ও অলৌকিক কাহিনীর প্রচার। সংবেশক (যে সম্মোহিত করছে—চিকিৎসক) সংবেশিতকে (যাকে সম্মোহিত করা হয়েছে) কিভাবে প্রভাবিত করে? সংবেশিত সংবেশকের নির্দেশ মত চলা-ফেরা কাজকর্ম করে কেন? সংবেশিতের দেহে নানারকমের পরিবর্তন ঘটে কেন? সংবেশকের অভিভাবনের ফলে তার বেদনাবোধ চলে যায়, আরও অনেক ধরনের রোগ উপসর্গের উপশম ঘটে। এর কারণ কি? সংবেশক হাসালে সে হাসে, কাঁদালে সে কাঁদে; ভুলতে বললে ভোলে, মনে করতে বললে মনে করে। দুজনের মধ্যে এক নতুন ধরনের আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে মনে হয়। একে বলা হয় rapport। ঘুম থেকে জেগে ওঠবার পর সংবেশিত এসব কিছু ভুলে যায়। কি করে এসব ঘটে? র‍্যাপোর্টের ব্যাখ্যা বা সংবেশিতের রোগ উপসর্গ উপশমের কোন হদিশ গত শতকে পাওয়া গেল না।

এবার চলে আসতে হবে উনিশ শতকের শেষ দশকের ফ্রান্সে। প্যারীতে শার্কো আর ন্যান্সীতে বার্ণহাইমের নেতৃত্বে হিপনসিস নিয়ে তখন চলেছে পরীক্ষানিরীক্ষা, চিকিৎসা, প্রদর্শনী। তুমুল উত্তেজনাময় বাদপ্রতিবাদ। হিষ্টিরিয়ার উপসর্গের সঙ্গে সম্মোহিতের আপাতসাদৃশ্য দেখে শার্কো বললেন—সম্মোহন মানে তৈরী করা নকল হিষ্টিরিয়া; যারা সম্মোহিত হয় তারা সবাই নিউরোটিক। (ফেনোমেনা অফ্ হিপনটিজ্‌ম্ আর এ্যান্ আরটিফিশিয়ালি প্রোডিউস্‌ড হিষ্টিরিকাল নিউরোসিস)। অভিভাবনের ব্যাপারটাকে তিনি আমলই দিলেন না। আবার ওদিকে ন্যানসীর বার্ণহাইম বললেন, সম্মোহন অভিভাবনেরই ফলশ্রুতি। সব মানুষই কমবেশী অভিভাবনপ্রবণ এবং সব

মানুষকেই সম্মোহিত করা যায়, অবশ্য সম্মোহনঘুমের গভীরতা সকলের সমান নয়। তিনি আরও বললেন, সম্মোহনের পরেও অভিভাবনের ক্রিয়া (পোস্ট-হিপনটিক সাজেশন) চলতে থাকে। এই দু'জনের শিষ্যসামন্তরা অনেকদিন অবধি তর্কবিতর্ক চালিয়ে গেলেন; তত্ত্ব বা তথ্য, কোনোদিকেই এঁদের মতৈক্য ঘটলো না। বিশ শতকের প্রথম দিকে সম্মোহন নিয়ে তর্কবিতর্কের স্রোতে কিছুটা ভাঁটা পড়লো। বার্ণহাইমের অভিভাবনতত্ত্ব, শার্কোর হিষ্টিরিয়াতত্ত্বের কোনটাই প্রতিষ্ঠিত হলো না। আরো অনেক নতুন নতুন থিওরি; যেমন গুরুমস্তিষ্কের অতিউত্তেজনা, অতি-নিস্তেজনা—এই বিপরীত থিওরি হাজির করলেন যথাক্রমে মেতেল ও জিমসেন। ভেরওর্ন বললেন—সম্মোহন অতি-জাগ্রত অবস্থা, আবার বেকটেরেফ (১৯১১) বললেন--স্বাভাবিক ঘুমেরই এক বিচিত্র রকমফের সম্মোহন।

এখনও বাজারে আরো হরেকরকম থিওরি চালু আছে। সবগুলো বিবৃত করে তোমাকে ঘাবড়ে দিতে চাই না। তবে দু'একটার উল্লেখ প্রয়োজন মনে করছি। ফরাসীদেশের মনোবিদ জ্যানেটের বিষঙ্গ বা ডিসোসিয়েশনতত্ত্ব শার্কোতত্ত্বেরই উন্নত সংস্করণ। মনের অংশ বিশেষ গোটা মন থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে অথবা সক্রিয় হয়ে ব্যক্তিকে পরিচালিত করতে পারে। সম্মোহিত অবস্থার ক্রিয়াকলাপ সামগ্রিক চেতনাস্তর থেকে বিচ্ছিন্ন খণ্ডিত চেতনার নিষ্ক্রিয়তা বা সক্রিয়তার ফল। হিষ্টিরিয়া রোগীর ইন্দ্রিয়বিশেষের নিষ্ক্রিয়তা (যেমন হিষ্টিরিয়া রোগীর অন্ধত্ব) খণ্ডিত চেতনার নিষ্ক্রিয়তার ফল আর স্বপ্নচারিতা (ঘুমের মধ্যে চলাফেরা, কাজকর্ম করা—সোমনাম-বুলিজ্‌ম) খণ্ডিত চেতনার সক্রিয়তার নিদর্শন। কি করে ব্যাপারটা ঘটে তার ব্যাখ্যা অবশ্য এ তত্ত্বে নেই, তবুও মনোরোগ চিকিৎসকদের মধ্যে এই তত্ত্ব বেশি চালু। শুধু তাই নয়, গল্প উপন্যাস চলচ্চিত্রে তুমি এই ধরনের বিষঙ্গিত অবস্থার অনেক কাহিনী দেখতে পাবে। এর পরেই উল্লেখ্য ফ্রয়েডীয় সাইকো-এ্যানালিটিক থিওরি। ফ্রয়েড মনে করতেন সম্মোহক-সম্মোহিতের বিশেষ সম্পর্ক, র‍্যাপোর্ট গড়ে ওঠে পারস্পরিক প্রেমের ফলে। প্রেমে পড়া আর সম্মোহিত হওয়া এক ধরনের ব্যাপার। সম্মোহিত ব্যক্তি শৈশবে ফিরে গিয়ে পিতামাতার উপর বিদ্বেষ ভালবাসা প্রকাশ করতে চায়—তাই সে সম্মোহিত হতে চায়। এদিক দিয়ে সম্মোহন একধরনের রিগ্রেশন বা পেছুহটা। সম্মোহিত অবস্থার

বিবরণ এ-তত্ত্বে পাওয়া যায়, সম্মোহিতের সঙ্গে র‍্যাপোর্ট (rapport) সৃষ্টির ব্যাখ্যা মেলে, কিন্তু সম্মোহনের কারণ বা সম্মোহিতের স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের কথা এতে নেই। এই সব তাত্ত্বিকরা মস্তিষ্কবিজ্ঞানের ধার দিয়েও গেলেন না।

এইবার প্রথমেই উল্লিখিত পাভলভের ধারণা একটু বিস্তারিত করছি। পাভলভের মতে হিপনসিস আংশিক ঘুম (পারশিয়াল স্লিপ) ; ঘুম ও জাগরণের পরিবৃত্তিকালীন এক অবস্থা। এই অবস্থায় গুরুমস্তিষ্কের বল্কলকোষগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে, উত্তেজনার মাত্রা হয় সীমিত। ঘুম-জাগরণের এক বিশেষ পর্বে, প্যারাডক্সিক্যাল (স্ববিরোধী) পর্বে, অভিভাবনের শক্তি অনেকগুণ বেড়ে যায়। পশুদের উপর পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এই পর্বে এক মাত্রার উদ্দীপক অনেক সময় দশ মাত্রার মত কাজ করে। সাধারণত উদ্দীপকের মাত্রা যে পরিমাণে বাড়ে, পরাবর্তক্রিয়া ঠিক সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। দশ মাত্রার উদ্দীপকে যদি দশ ফোঁটা লালা পড়ে, কুড়ি মাত্রা উদ্দীপকে কুড়ি ফোঁটা, চল্লিশ মাত্রায় চল্লিশ ফোঁটা ইত্যাদি। স্ববিরোধী অবস্থায় দশমাত্রা উদ্দীপকে দেখা যাবে হয়তো একশো ফোঁটা লালা পড়ছে।

চিকিৎসায় আমরা রোগীকে ঘুমের অভিভাবন দিয়ে থাকি, এই অভিভাবিত ঘুম এক ধরনের শর্তাধীন পরাবর্তধর্মী ঘুম। আমরা রোগীর দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্র অর্থাৎ বাক্‌তন্ত্রকে উদ্দীপ্ত করে সম্মোহন-ঘুম আনি ; অনেকে প্রথম সাংকেতিক তন্ত্র অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়ের কোনো একটিকে বা একাধিক ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপ্ত করে সম্মোহিত করেন। জাগরণ, সম্মোহন-ঘুম ও স্বাভাবিক ঘুমের মধ্যে মাত্রাগত পার্থক্য এদের গুণগত পার্থক্য নিয়ে আসে। স্বাভাবিক ঘুমের শারীরবৃত্তিক পরিবর্তন সব সময়ে সম্মোহন-ঘুমে পাওয়া যায় না ; তাই একদল বৈজ্ঞানিক পাভলভীয় ব্যাখ্যা মানলেও তাঁর সম্মোহনের থিওরী মানতে চান না। তাঁরা পাভলভীয় তত্ত্বের সঙ্গে সম্যক পরিচিতির শ্রমস্বীকারে কুণ্ঠিত। নিস্তেজনার (ইন্‌হিবিশন) বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কিত পাভলভীয়ানদের পরীক্ষানিরীক্ষা খুবই কমসংখ্যক পশ্চিমী গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্রের বিশেষ তাৎপর্য সম্পর্কে মার্ফির মত জগদ্বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিকও অনীহ। তুমি নিশ্চয়ই কারণ জানতে চাইবে। কারণ একটা নয়, অনেক। প্রধান কারণ বোধহয় গবেষকদের জীবনদর্শন। 'কার্টেজিয়ান' ধ্যানধারণা পশ্চিমী সমাজ-

বিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানীদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। দ্বয়বাদী দার্শনিক তত্ত্ব দ্বারা তাঁরা সকলেই কমবেশি আচ্ছন্ন। উদ্দেশ্যমূলক প্রচারের জোরে 'মেটিরিয়ালিজম্ মনিজম' ও বৈজ্ঞানিক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে সমীকৃত করা হয়েছে। বিজ্ঞান অধিকাংশ গবেষকের কাছে শুধুমাত্র গবেষণার বস্তু। অন্তরের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দর্শনকে তাঁরা অনেকেই গ্রহণ করতে পারেন নি। রহস্যবাদ, অজ্ঞেয়বাদ, অবচেতনবাদ মনস্তত্ত্বকে, আগেই বলেছি, বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হবার পথে বাধা দিচ্ছে। শেরিংটনের মত সোজাসুজি কেউ আজ আর বলছেন না বটে যে পাভলভের কণ্ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স সাইকলজিতে বস্তুবাদের বদ্ গন্ধ আছে, সুতরাং পাভলভীয় মনস্তত্ত্ব অপাঙ্‌ক্তেয়। তাঁরা অনেক কণ্ডিশন্‌ড রিফ্লেক্সভিত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালাচ্ছেন, অনেক তথ্য সংগ্রহ করছেন, কিন্তু মস্তিষ্কাশ্রিত মনোবিজ্ঞানের প্রতিফলনতত্ত্বকে এড়িয়ে যাচ্ছেন। এ নিয়ে অনেক লিখেছি, এখানে আবার সেই পুরণো কচকচি তুলে তোমার ধৈর্যের পরীক্ষা নেবার ইচ্ছে নেই। আগেই বলেছি, হাজার হাজার পেপার তৈরী হচ্ছে, হিপনসিসের নানা দিকের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, কিন্তু খুব কম সংখ্যক গবেষণাতেই তুমি মস্তিষ্কভিত্তিক তথ্য বা সামগ্রিক তত্ত্ব অনুসন্ধানের চেষ্টা দেখতে পাবে।

তুমি তো জানো, ঘুমের ব্যাপ্তি ও গভীরতার রকমফের আছে। গভীর ঘুমের দরুণ যে সব শারীরবৃত্তিক পরিবর্তন ঘটে, সেগুলো সম্মোহিত অবস্থায় মেলে না বলে পাভলভের তত্ত্বকে নাকচ করা চলে না। আগেই বলেছি, মনে আছে বোধ হয়,—আর. ই. এম. ঘুম আর জাগ্রত অবস্থার মধ্যে অনেকটা মিল আছে। তাছাড়া পাভলভীয়ানরা এমন অনেক তথ্য পেশ করেছেন যা থেকে বোঝা যায় সম্মোহিত অবস্থাতে অনেকক্ষেত্রে নিদ্রাকালীন শারীরবৃত্তিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। দু এক টার কথা উল্লেখ করছি।

ৎসিনকিন (১৯৩০) পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে সম্মোহন-ঘুমের মধ্যে রক্তচাপ আট থেকে পঁচিশ মিলিমিটার পর্যন্ত হ্রাস পায়। তিনি এবং কে. প্লাটানফ স্বাভাবিক ঘুমের মধ্যেও রক্তচাপ কমে—এটাও লক্ষ্য করেছেন। আমরাও এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হয়েছি আমাদের রোগীদের সম্মোহিত অবস্থার অব্যবহিত পরে রক্তচাপ পরীক্ষা করে। প্লাটানফের এবং ৎসিনকিনের উপাত্ত সমূহ থেকে আরো জানা যায় যে সম্মোহিত অবস্থায়

ধমনী (পাল্‌স্) মিনিটে আট থেকে দশবার কম স্পন্দিত হয়। এটা অবশ্য গভীর সম্মোহন অবস্থার কথা। পাতলা সম্মোহন ঘুমের মধ্যে স্পন্দনের গতিবেগ কমে, তবে অতটা নয়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের বেলাতেও এঁরা দেখেছেন, ঘুম আর সম্মোহন-ঘুমের মধ্যে একই ধরনের পরিবর্তন ঘটে। প্লাটানফ লিখেছেন : 'Thus, on the basis of rather large number of observations, conducted by us in association with A. Tsinkin, we can assume that in suggested sleep (hypnosis)—the pulse rate and respiration, as a rule, slow down; moreover, in most cases respiration not only grows weaker but also more rythmic, i. e., it evens out, while the blood pressure under these conditions, as a rule, drops' (Platanov; The Word as a Physiological and Therapeutic Factor : 1959, Moscow; p 59)।

মজার কথা কি জানো? বিরোধীপক্ষের উপাত্ত উদ্ধৃত করে তোমাকে বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব যে সম্মোহন আদৌ নিদ্রাজাতীয় কোনো ব্যাপারই নয়। এক ডব্লিউ. আর. ওয়েলসেরই 'ওয়েকিং হিপনোসিস'-এর উপর খান তিরিশেক পেপার আছে। লেসলী কুন্, স্যালভাটোর রুশো, এরিকসন প্রমুখ মহারথীদের পরীক্ষানিরীক্ষা বিপরীত সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে হাজির করা যায়। স্বভাবতই তোমার মনে প্রশ্ন জাগবে—কাদের তথ্যপ্রমাণ বিশ্বাসযোগ্য? অনেকের মনেই জাগে। ঘুমের অভিভাবন না দিয়ে, অর্থাৎ কেবলমাত্র পঞ্চেন্দ্রিয়ের যে কোনো একটি বা দুটি ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপ্ত করে সম্মোহিত করা যায়। এ থেকে প্রমাণ হয় না যে সম্মোহন মস্তিষ্কের অংশবিশেষের নিস্তেজনাসঞ্জাত অবস্থা নয়। বাচ্চাদের দোল দিয়ে বা পিঠ থাবড়ে মায়েরা ঘুম পাড়িয়ে থাকেন তুমি জানো, সকলেই জানে। লেসলী কুন কিন্তু একজায়গায় এই কথাই লিখেছেন যে ঘুমের কথা না বলেও যেহেতু ব্যক্তিকে সম্মোহিত করা যায়, সেহেতু ঘুম আর সম্মোহন সম্পূর্ণ আলাদা অবস্থা। এই বক্তব্যে যুক্তি নেই। উপাত্তগুলোর বৈসাদৃশ্য নিয়ে চিন্তা করে আমি এই ধারণায় এসেছি যে, হিপনসিসের গভীরতার কমবেশীর সঙ্গে রক্তচাপ, নাড়ীর গতি, শ্বাসপ্রশ্বাসের হ্রাসবৃদ্ধি সম্পর্কিত। বিভিন্ন অবস্থায় উপাত্ত সংগ্রহের ফলে বোধ হয় এই বৈসাদৃশ্য। তাছাড়া আর একটা কথাও চিন্তা করবার

আছে। ঘুমের অভিভাবনের দ্বারা সম্মোহিত করার ফলে ঘুমের মধ্যেকার শারীরবৃত্তিক পরিবর্তন পাভলভীয়ানদের পরীক্ষানিরীক্ষায় বেশী পাওয়া যাচ্ছে—এ অনুমান করা যায় কি? কিন্তু ঘুমের মধ্যে কি কি পরিবর্তন ঘটে তা সব সম্মোহিত ব্যক্তি জানেন কি? তোমার রক্তচাপ কমবে, নাড়ীর গতি শ্লথ হবে; —এই রকম অভিভাবন না দিয়েও তো দেখা গেছে রক্তচাপ, নাড়ীর গতি ইত্যাদি হ্রাস পেয়েছে। ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে, তাই না? থাক, তাত্ত্বিক আলোচনা বর্তমানে স্থগিত রেখে রোগচিকিৎসায় হিপনসিসের প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করা যাক। শুধু মনে রেখো যে, ঘুমের রকমফের গভীরতার হ্রাসবৃদ্ধি সর্বজনস্বীকৃত। একই রাতের ঘুমের মধ্যে কয়েকটি পর্ব আছে। তেমনি আবার জাগ্রত থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় অতিক্রমণের কয়েকটি পর্ব আছে। 'ইনহিবিশন', মানে নিস্তেজনার বিশেষ করে transmarginal inhibition-এর স্বরূপ বুঝতে না চাওয়ার জন্যই পাভলভের হিপনসিসতত্ত্ব বিরোধীরা গ্রহণ করতে পারছেন না। জাগ্রত অবস্থায় যেমন মস্তিষ্কের সব জায়গাগুলো জাগ্রত থাকে না, ঘুমন্ত অবস্থাতেও তেমনি সব জায়গাগুলো ঘুমিয়ে পড়ে না। হিপনসিস এমনি ধরনের একটা আংশিক ঘুমন্ত অবস্থা: নিদ্রাজাগরণের অন্তর্বর্তী একটা পরিবৃত্তিকালীন অবস্থা।

চিকিৎসায় সম্মোহনের প্রয়োগের অভিজ্ঞতা আমাদের কম দিনের নয়। তুমি জানো ১৯৫০ থেকে আমরা নানাধরনের রোগে সম্মোহনের প্রয়োগ করে আসছি। তখন সম্মোহন এদেশে অপাঙ্‌ক্তেয়, বৃটিশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক অবাঞ্ছিত। এ যাবৎ অন্তত ২০/২৫ হাজার বার রোগীদের ঘুমের অভিভাবন দিয়ে আমরা সম্মোহিত করেছি। তারপর দিয়েছি আরোগ্যের অভিভাবন। আরোগ্যের অভিভাবনের বেলায়, রোগের উপসর্গ দূর করার থেকে রোগের মূল কারণ দূর করার দিকে নজর দিয়েছি বেশী। নিউরোসিসের ক্ষেত্রে সামাজিক দ্বন্দ্ব বিরোধের প্রতিফলন দেখেছি রোগীর মনে। অস্বাস্থ্যকর সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে উচ্চমস্তিষ্কের কার্মিক বিশৃঙ্খলার এবং উচ্চ ও নিম্নমস্তিষ্কের সম্পর্কের বিচ্যুতি ঘটে। কিন্তু হায়! পরিবেশ পরিবর্তন করার অধিকার আমাদের নেই। আমরা সমাজের নিয়ন্ত্রক নই।

রোগের মূল কারণ যদি সামাজিক দ্বন্দ্ববিরোধ, অসাম্য, শোষণ, বঞ্চনা, বিষম প্রতিযোগিতা হয়; তবে মূল কারণ দূর করার চেষ্টা করি কিভাবে? এ প্রশ্ন তুমি নিশ্চয়ই করতে পারো। সম্মোহন অভিভাবনের সাহায্যে সমাজকে তো

বদলানো যায় না। তুমি আরও অনেক প্রশ্ন তুলেছ। আমরা কি তবে ব্যক্তিকে বদলে তাকে যেমন তেমন করে এই সমাজের ছকেবাঁধা নিয়মকানুনের দাস করতে চাই ? অথবা বিকৃত সমাজের প্রতিটি বিকারগ্রস্তকে সুস্থ করে তুলে এই সমাজের পরিবর্তন ঘটাতে চাই ? না, এর কোনটাই আমাদের অভিপ্রেত নয়। তবে কি আমরা আমূল সামাজিক পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবো, নতুন সমাজের জন্মের আশায় দিন গুণতে থাকবো ? আমরা কি আশা করবো যে শোষণহীন, বিষম প্রতিযোগিতাহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলেই মনের রোগ, বিশেষ করে নিউরোসিসের আর সম্ভাবনা থাকবে না এবং আজকে যারা অসুস্থ আছে, তারা আপন থেকে ভাল হয়ে যাবে। তোমার এই সব প্রশ্ন সম্মোহন প্রসঙ্গে অবান্তর হলেও, এদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। না, এ-ধরনের উদ্ভট ইউটোপীয় কল্পনা আমরা পোষণ করি না। অবান্তর মনে হলেও, তোমার প্রশ্নগুলোকে এড়িয়ে যেতে পারছি না। দু'এক কথায় উত্তর দিচ্ছি, বারান্তরে বিশদভাবে বলবার চেষ্টা করবো।

সম্মোহন চিকিৎসায় অঘটন ঘটানো যায় না। সমাজে পরিবর্তন তো দূরের কথা, রোগীর মস্তিষ্কের টাইপও আমরা বদলাতে পারি না। পাভলভ-অনুগামীদের মতে মস্তিষ্কের টাইপ (কোলেরিক, স্যানগুইনাস, ফ্লেগম্যাটিক, মেলানকলিক) অনুযায়ী নিউরোসিসের টাইপ মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট। প্রত্যেকটি ব্যক্তি-মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের গঠন স্বতন্ত্র ও তার সহ্যক্ষমতা সাধারণভাবে সীমিত। বাইরের জগৎ বা অন্তরজগত থেকে আসা শর্তাধীন বা শর্তহীন উদ্দীপকের শক্তির মাত্রা যদি ব্যক্তির সহ্যসীমার থেকে বেশী হয়, তবেই ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। গুরুমস্তিষ্কের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সংহতি থাকে না, গুরুমস্তিষ্ক-লঘুমস্তিষ্কের প্রভাব-প্রতিপ্রভাবের মধ্যে অসঙ্গতি ঘটে। মানুষের বেলায় তার দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্র ও প্রথম সাংকেতিকতন্ত্রের সম্পর্কেও বিশৃংখলা দেখা যায়। খুব সংক্ষেপে বলা চলে যে, মস্তিষ্ককোষের মৌলিক তিনটি ধর্মের যে কোনো একটির অতিপীডন ঘটলেই নিউরোসিস হতে পারে। এই তিনটি ধর্ম কি—তা তুমি নিশ্চয়ই জানো। তবুও আর একবার মনে করিয়ে দিতে চাই। উত্তেজনা, নিস্তেজনা আর গতিময়তা (excitation, inhibition and mobility) সব মস্তিষ্ক কোষেরই স্বাভাবিক মৌলিক ধর্ম।

সম্মোহন চিকিৎসায় কিভাবে রোগের উপশম বা নিরাময় ঘটে ? নিউরোসিসে মস্তিষ্কের পরিবর্তম ঘটে অতিপীড়নের ফলে। এই অতিপীড়নের উৎস মূলত

রোগীর সামাজিক পরিবেশে। একই ক্ষতিকর পরিবেশে একজন রোগগ্রস্ত হয়, একজন হয় না। স্নায়ুতন্ত্রের সহ্যশক্তির, (যার কিছুটা অন্তত জন্মগত) তারতম্যের উপর সুস্থতা-অসুস্থতা নির্ভরশীল। সম্মোহন-অভিভাবনের ফলে সহ্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কিভাবে ? পাভলভের মতে অতিনমনীয়তা ও পরিবর্তনসাধ্যতা উচ্চমস্তিষ্ক প্রক্রিয়ার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য "...Most important, strongest and constant impression from the study of higher nervous activity is the extra-ordinary plasticity of this activity, its enormous potentialities : nothing remains immovable, everything can be attained and changed for the best, provided the corresponding conditions are on hand." (I. P. Pavlov : Twenty Years of Objective Study. 1951 ; p 364)। অসুস্থ ও ক্ষতিকর পরাবর্তের পরিবর্তে সুস্থ পরাবর্ত অতি সহজেই সম্মোহন-অভিভাবনের সাহায্যে গঠন করা সম্ভব। সুস্থ সুগঠিত পরাবর্ত মস্তিষ্ক-কোষের দৃঢ়তা বাড়িয়ে অতিপীড়নকে অনেকাংশে সহনীয় করে তুলতে পারে। আমরা জানি গুরুমস্তিষ্ক ও তন্তুজালের (cerebral cortex and reticular formation) অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের ওপর প্রাণীর জৈবিকক্রিয়া থেকে শুরু করে সবরকম কার্যকলাপ নির্ভরশীল। গুরুমস্তিষ্ক, এককথায় বলতে গেলে, প্রাণীর সবরকম ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রক। আবার মানুষের বেলায় বাকতন্ত্র (দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্র), তার চিন্তাভাবনা ধ্যানধারণা—তার অন্তরজগতের স্রষ্টা এবং স্নায়ুতন্ত্রের এই মানবিক এবং বিশিষ্ট সংযোজন গোটা মস্তিষ্ক এবং মনোজগতের নিয়ামক। কথা দিয়ে মানুষকে হাসানো যায়, কাঁদানো যায়। উৎসাহিত, বিষাদগ্রস্ত করার ব্যাপারে কথার প্রভাব অপরিসীম। রোগ সারানোর ব্যাপারে কথার ভূমিকা নগণ্য নয়। এই কথা যখন বিশ্বস্ত কোনো ব্যক্তির মুখ থেকে আশার বাণী হিসেবে বেরিয়ে আসে, তখন হতাশাগ্রস্ত রোগীর মনে সদর্থক প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সদর্থক প্রক্ষোভ অন্তর্গ্রন্থিকে উদ্দীপ্ত করে শুধু মনের কেন, দেহের রোগকেও অনেক সময় আরোগ্যের পথে নিয়ে যেতে পারে। সুযোগ্য চিকিৎসকের অভিভাবনে সম্মোহন ছাড়াই আরোগ্যের পথ প্রশস্ত হয়। সম্মোহন-অভিভাবন এই রোগনিরাময়ের প্রক্রিয়াকে আরো দ্রুত, আরো শক্তিশালী, আরো সুসংগঠিত করে তোলে। সম্মোহন-ঘুমে মস্তিষ্কের বেশির ভাগ অংশ থাকে

নিস্তেজিত, কেবলমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহীকেন্দ্রের একটি অংশ বেশি সজাগ থাকার ফলে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষিত হয়। এই বেশি সজাগ অংশটিকে বলা হয় Rapport zone। চিকিৎসকের সঙ্গে এই যোগসূত্র স্থাপিত ও সংরক্ষিত না হলে, সম্মোহন-অভিভাবনে অভীষ্ট ফললাভ করা যায় না। এই সময় মস্তিষ্ক দুটো অংশে ভাগ হয়ে যায়। একটি অতি-জাগ্রত অংশ, যা অভিভাবন গ্রহণ করতে সমুৎসুক; অন্যটি নিস্তেজিত অংশ, যার ফলে হাত-পা ভারী, সর্বাঙ্গ শিথিল, শ্বাসপ্রশ্বাস শ্লথ। অভিভাবন জাগ্রত অংশটিকে উত্তেজিত করে, মস্তিষ্কের নিজস্ব ধর্মানুযায়ী আশেপাশের অংশে ঘটে আরো নিস্তেজনা, ফলে হয়ে পড়ে আরো নিষ্ক্রিয় (induced inhibition); এবং বিরোধী কোনো চিন্তাভাবনা ধারণা তখন আর ক্রিয়া করে না। ফলে অভিভাবনের ক্রিয়া অপ্রতিহতভাবে চলতে থাকে। এছাড়া ঘুম-জাগরণের অন্তর্বর্তী স্ববিরোধী (paradoxical phase) পর্বে অভিভাবনের মত দুর্বল উদ্দীপক সব থেকে জোরালো মাত্রার পরাবর্ত বা effect সৃষ্টি করতে সক্ষম। পাভলভ-অনুগামীদের বহু পরীক্ষানিরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলে গৃহীত। এই হোলো সম্মোহন-অভিভাবনের রোগ উপশম বা রোগনিরাময়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। রহস্যবাদ, চুম্বকবাদ বা অবচেতনবাদ আমদানি না করেই ব্যাখ্যা করা যায়। সম্মোহন সম্পর্কে অনেক মনস্তাত্ত্বিক এখনও ধোঁয়াটে ধারণা পোষণ করেন; ফ্রয়েডের মেটাসাইকলজি দ্বারা তাঁরা প্রভাবিত। অবচেতন মনকে নাকি সম্মোহন প্রভাবিত করে। কিভাবে করে ও অবচেতন মনের অধিষ্ঠান ঠিক কোন জায়গায়—তা কিন্তু স্পষ্টভাবে তাঁরা বলেন না।

চিকিৎসাদ্বারা আমরা সমাজ বদলাচ্ছি না, কিন্তু রোগীর সহ্যক্ষমতা, মনোবল, সাহস ইত্যাদি বাড়িয়ে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে তাকে সংগ্রাম করে টিকেথাকতে এবং সম্ভব হলে সমাজ পরিবর্তনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করি।

চিকিৎসায় সম্মোহন-অভিভাবনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু আমরা কম গুরুত্ব আরোপ করিনা 'এডুকেটিভ্ থেরাপি' বা রোগ দেহ মন ইত্যাদি সম্পর্কিত পাভলভীয় শিক্ষার ওপর। রোগীর জানা দরকার তার রোগের কারণ, তার উপসর্গের তাৎপর্য। উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ভয়ের ফলে শারীরবৃত্তিক পরিবর্তনের ও উদ্বেগ ভয়ের উৎস জানতে পারলে রোগীর মস্তিষ্কের

পীড়ন অনেকটা কমে। স্নায়ুতন্ত্রের গঠনবিন্যাস, গুরুমস্তিষ্কের ভূমিকা ও দৈহিক ক্রিয়াকলাপের উপর তার প্রভাব বুঝিয়ে দেওয়ার ফলে নিজের উপসর্গ সম্পর্কিত আজগুবি ধারণা বদলায় এবং আনুষঙ্গিক ভীতিও কমতে থাকে। তারপর প্রয়োজন হয় রোগীর নিজস্ব পারিবারিক ও কর্মস্থানিক পরিবেশের আলোচনা। এই আলোচনা প্রসঙ্গে সমাজের স্তরবিন্যাস, শ্রেণীসংস্থান, আন্তর্মানবিক সম্পর্ক ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় এসে পড়ে। বিশেষ ধরনের কাজে নিযুক্ত রোগীর সঙ্গে তার পেশা বা কাজের সামাজিক মূল্যবিচারেরও প্রয়োজন হয়। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কের বিশ্লেষণে চিকিৎসক বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। বিষম প্রতিযোগিতার ও বঞ্চনাভিত্তিক অবক্ষয়ী সমাজব্যবস্থার ইতিবাচক দিকগুলোর উপর আলোকপাত করে অনেক বিষাদগ্রস্ত, সিনিক, সন্দেহ-প্রবণ রোগীর মানসিকতার পরিবর্তন আনা যায়।

এই বিশ্লেষণ-আলোচনার সারমর্ম সম্মোহন অভিভাবনের সাহায্যে রোগীর মস্তিষ্কে ঠিকমত পৌঁছে দিতে না পারলে পরিবেশের নঞর্থক উদ্দীপকগুলো আবার তাকে অসুস্থ করে তুলতে পারে। ব্যাপারটি সময়সাপেক্ষ। সব রোগী চিকিৎসার জন্য অতটা সময়ক্ষেপ করতে পারে না, অথবা চায় না।

নিউরোসিস ছাড়াও নানা ধরনের রোগের উপর সম্মোহন-অভিভাবনের ফলাফল পরীক্ষা করা হয়েছে। আপাতত জেনে রাখো, এ্যাজমা, কোলাইটিস, ষ্ট্যামারিং, ইম্পোটেন্সি, ফ্রিজিডিটি ও হাইপোকনড্রিয়া,—মস্তিষ্ক-আন্তরযান্ত্রিক পরাবর্ত বিশৃংখলায় (যাকে সাইকোসোমাটিক বলা হয়) ভাল ফল পাওয়া গেছে। উন্মাদরোগের মধ্যে প্যারানইয়া, স্কিজোফ্রেনিয়াতে সম্মোহন-অভিভাবনের প্রয়োগ করা হচ্ছে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ওষুধও দিতে হয়েছে। বেদনারহিত সন্তানপ্রসবেও এর প্রয়োগে সুফল পাওয়া গেছে। সাহায্যকারী চিকিৎসা হিসাবে সব রোগেই সম্মোহন-অভিভাবনের প্রয়োগ কবা চলতে পারে। সম্মোহককে কোনো বিশেষ ধরনের মানসিক বা আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হতে হয় না। কয়েক মাসেব প্রশিক্ষণের ফলে যে কোনো চিকিৎসক সম্মোহন পদ্ধতি আয়ত্ত করতে পারেন।

তোমার সম্মোহন-সম্পর্কিত অতি-উৎসাহে আমি কিন্তু চিন্তিত। আজকাল নানাদেশে ভূতপ্রেত জাতিস্মরতা নিয়ে সম্মোহন সাহায্যে নতুন করে গবেষণার ধূম পড়ে গেছে। অনেকবছর পরে 'স্পিরিচুয়ালিজম' 'প্যারাসাইকলজি'

নাম নিয়ে বিজ্ঞানের জগতে পুনঃপ্রবেশের চেষ্টা করছে। তুমি ঐ ধরনের কিছু পরীক্ষানিরীক্ষার বিবরণ ছাপিয়ে রাতারাতি বিখ্যাত হতে চাও নাকি ?

[১১]

তোমার ঔৎসুক্য মেটাতে গিয়ে আমরা যে ক্রমশ দেউলে হয়ে যাচ্ছি। ঘুম স্বপ্ন স্মৃতিতত্ত্ব থেকে সম্মোহনে পৌঁছুতে আমাদের যে সময় লেগেছে, সেই সময়ের মধ্যে পায়ে হেঁটে গোটা ভারত টহল দিতে পারতাম। ভেবেছিলাম সম্মোহন-প্রসঙ্গে সব কথাই বুঝি বলা হয়েছে। এখন কয়েক সপ্তাহ অন্তত বিশ্রাম নিতে পারবো। কিন্তু তোমার নতুন প্রশ্নপত্র পেয়ে আবার কলম নিয়ে বসতে হলো। দেখি, এই চিঠিতে সব কিছু বলে 'সম্মোহন প্রসঙ্গে'র ইতি টানতে পারি কি না!

'গণ-মাধ্যম সম্পর্কে তোমার কৌতূহল আমি স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েছি। এ নিয়ে অনেক কিছু লেখা হয়েছে। তাঁদের বইগুলো উলটেপালটে দেখলাম। ঐ প্রসঙ্গে গণ-সম্মোহনের গণ-হিষ্টিরিয়ার পরোক্ষ উল্লেখ থাকলেও, বিশদ আলোচনা কোথাও খুঁজে পেলাম না। তোমার কৌতূহল ঐসব লেখক মেটাতে পারবেন বলে মনে হল না। কাজেই অনেকটা বাধ্য হয়ে, বেশ খানিকটা ভাবনাচিন্তা করে, তোমার প্রশ্নপত্রের উত্তর দিতে বসেছি। তোমার সব প্রশ্নের উত্তর হয়তো দিতে পারবো না, তবে চেষ্টা করবো। শুরু করছি এবার গণহিষ্টিরিয়ার ইতিবৃত্ত থেকে।

প্রাচীনকালের পুঁথিপত্রে হিষ্টিরিয়ার উল্লেখ প্রচুর পাবে। হিপোক্রেটিসের অনেক আগেই হিষ্টিরিয়া ও মৃগী রোগের বৈশিষ্ট্য মানুষের জানা ছিল। অবশ্য সাধারণের কাছে এ দুটি রোগের মধ্যে কোন তফাত ছিল না। মৃগী ও হিষ্টিরিয়ার আক্ষেপের (convulsions) বৈশিষ্ট্য বোঝাবার মত ক্ষমতা সে সময়কার জাদু-চিকিৎসকদের থাকার কথা নয়। এ দুটি রোগকেই তাঁরা পবিত্র (sacred disease) মনে করতেন। মানুষের দেহে ঈশ্বরের অনুপ্রবেশের ফলে রোগ হয়েছে—এই ধারণাই চালু ছিল। হিপোক্রেটিসের বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে জাদু-ডাক্তাররা এই রোগ সারাবার জন্য যে বিধান দিতেন তা থেকে বোঝা যায় যে শুধু ঈশ্বর নয়, মৃত আত্মীয়স্বজনের আত্মাও রোগীকে ভর করতো। কোন দেবতা বা কি ধরনের প্রেতাত্মা রোগীর দেহে ঢুকেছে সেটা

ঠিক করা হোতো রোগের উপসর্গ দেখে। যিনি ভর করেছেন, তাঁর রীতিপ্রকৃতি অনুযায়ী চিকিৎসার বিধান দেওয়া হতো। আমাদের দেশে ভর হওয়া, ভূতে পাওয়া রোগীর সংখ্যা এখনও বিশেষ কমেনি।

যাদুকর ডাক্তারদের কথা ছেড়ে এবার আধুনিক মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ব্যাপারটাকে বোঝাবার চেষ্টা করা যাক। আদিম সমাজে শ্রমভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস যখন শুরু হয়, ব্যক্তিচেতনা তখনও কিন্তু অস্ফুট, ব্যক্তিসত্তা অসংগঠিত থাকে। গোষ্ঠী, সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরোধের সূত্রপাতের ফলে অপরিণত ব্যক্তিমনে ঘটে তীব্র আলোড়ন। এই আলোড়ন থেকে যে প্রক্ষোভের সৃষ্টি, সেই প্রক্ষোভের নগ্ন প্রকাশ ঘটে হিষ্টিরিয়ায়। ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা ক্রিয়াকলাপ অপরিহার্য; অথচ গোষ্ঠী-সত্তার সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার বাঁধন তখনও অটুট। আত্মকেন্দ্রিকতা তাই নৈতিক সমস্যা নিয়ে আসে, ব্যক্তিস্বার্থরক্ষাচেষ্টাকে পাপ মনে হয়। জ্ঞানবুদ্ধি অপরিণত, গভীরভাবে কোনো কিছু বিশ্লেষণ করার শক্তি নেই; বিবেকবুদ্ধি অসংগঠিত কিন্তু তার তাড়না খুবই জোরালো। পাপবোধ সহ্য করার শক্তি থাকে না এদের। পাপ করেছে অথবা কেউ জাদু করেছে, এই বিশ্বাস একবার বদ্ধমূল হলে, এদের আর বাঁচানো যায় না। উপলব্ধির গভীরতা নেই কিন্তু তীব্রতা আছে; কাজেই সহজে মস্তিষ্কে বিষমাবস্থা দেখা যায়। এই বিষঙ্গিত অবস্থার কালেই হয় হিষ্টিরিয়া। "Run-amok" কথাটাতো তুমি জানো। কাগজে প্রায়ই পড়ে থাকো যে, হঠাৎ একজন ফৌজী সিপাহী ক্ষেপে গিয়ে দু'চারজন সাথী সঙ্গীকে গুলি করে শেষে নিজের মাথায় বন্দুক চালিয়েছে। পুরণো সমাজের মানুষ নতুন সমাজের সংস্পর্শে এসে নিজের মনের দ্বন্দ্ববিরোধের সমাধান করতে না পেরে মাঝে মাঝে এই ভাবে ক্ষেপে যায়। এ এক ধরনের হিষ্টিরিয়া। মানসিক রোগের হাসপাতালের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, হিষ্টিরিয়ার প্রাদুর্ভাব তাদের মধ্যেই বেশি, যারা গ্রাম থেকে হালফিল শহরে এসেছে। সামান্যীকরণ করলে বলা চলে, হিষ্টিরিয়া ব্যাপকভাবে একসঙ্গে অনেকের মধ্যে দেখা যায় যখন পুরণো সমাজ-ব্যবস্থার আশু পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে এবং তার ফলে দেখা দেয় পরিবৃত্তিকালীন সঙ্কট।

কৌমসমাজ ভেঙে যাবার পর, গ্রীসে রহস্যবাদী ধর্মের ভিত্তিতে নতুন করে সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠতে থাকে। রক্তের সম্পর্কের থেকে ধর্মের সম্পর্ক বড় হয়ে

ওঠে। এই সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ আচার-অনুষ্ঠানে গোপনীয়তা রক্ষিত হোতো। ক্রমশ এদের মধ্যে ডায়োনিসাসের উন্মাদনাময় অনুষ্ঠানের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। ছোট ছোট ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায় নিজের নিজের দেবদেবীর নামে ডায়োনিসাসের আচার অনুষ্ঠান—বিশেষ করে মদ খেয়ে নৃত্যগীতের মধ্য দিয়ে হিষ্টিরিক উন্মাদনা সৃষ্টি ও উন্মাদনা নিরসনের উৎসব ইত্যাদি, পালন করতো। তোমার নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে হচ্ছে কেন এবং কোন অবস্থায় এই সব ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায় এই সব হিষ্টিরিক আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ় করবার চেষ্টা করতো। এর উত্তর তুমি পাবে জর্জ টমসনের 'এইসকাইলাস এ্যাণ্ড এথেন্স' এর মধ্যে। যে সব জায়গায় খনিজ শিল্প গড়ে উঠেছে, নগরপত্তন হয়েছে, সেখানেই এই সব সম্প্রদায় দেখা গেছে। গ্রাম থেকে নগরে আসতে এবং আদিম কৃষিকাজ থেকে খনির কাজে লেগে পড়তে গিয়ে এদের নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে ও অনেকরকম দ্বন্দ্ববিরোধের মুখোমুখি হতে হয়েছে। কৌম-সম্প্রদায়ের রক্তসম্বন্ধভিত্তিক একাত্মবোধের বদলে ধর্মভিত্তিক একাত্মবোধ গড়ে তুলতে গিয়ে এই orgiastic বা হিষ্টিরিক আচার অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়েছিল। টমসন লিখেছেন, "The development of these industries must have induced among the neighbouring tribes, which supplied the labour, a spiritual crisis of the same kind as that which the urban revolution precipitated among the Athic peasantry" (Thomson, Aeschylus & Athens ; p. 355)

এবার সেকালের এক 'ম্যাজিকো মেডিক্যাল' গুপ্ত সম্প্রদায়ের কথা বলছি। এই সম্প্রদায়টির নাম করিবান্টেস (Korybantes)। এদের উপাস্য এশিয়া মাইনরের এক দেবী। এদের আচার অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ ছিল ফ্লুট ও ড্রাম বাজনার সঙ্গে উন্মাদকরা নাচ। এই নাচগানের মধ্য দিয়ে এদের মধ্যে হিষ্টিরিয়ার অভিব্যক্তি ঘটতো। একটা মজার ব্যাপার এই যে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যেমন হিষ্টিরিয়া সৃষ্টি করা হোতো, তেমনি আবার গানবাজনা মন্ত্রপাঠের মধ্য দিয়ে হিষ্টিরিয়া সারানোও হোতো। জাদুমন্ত্র নাচগান সে সময়ে সম্মোহনের কাজ করতো। গণহিষ্টিরিয়া ও গণসম্মোহনের মাধ্যম একই ছিল। শুধু গ্রীসে নয়, পৃথিবীর সবদেশে এই ধরনের গুপ্তসমিতি ছিল এবং তাদের কাজ ছিল দুই

বিপরীত ধরনের—মনের রোগ সৃষ্টি ও দূর করা। জানিয়ে রাখা ভালো, একেবারে আদিম যুগে রোগনিরাময়ের পদ্ধতি কিন্তু ছিল পুরোপুরি বস্তুবাদসম্মত। ভূতপ্রেত তাড়ানো বা ঈশ্বরের স্তবস্তুতি নাচগান হৈ হুল্লোড়ের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না।

গণহিস্টিরিয়ার আদি ইতিবৃত্তের সঙ্গে গণসম্মোহন গণমাধ্যমেরও দু'চার কথা শুনলে। গণহিস্টিরিয়ার কথা মহাভারতের মৌষলপর্বে যাদবদের আত্মহননের বৃত্তান্তে বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে। অন্ধক, ভোজ, বৃষ্ণি ও কুকুর ; এই চারটি কৌমগোষ্ঠী বৃষ্ণিবংশের কৃষ্ণের নেতৃত্বে নতুনভাবে ধর্মসম্প্রদায়রূপে সংগঠিত হয়েছিল। 'কৃষ্ণ-কাল্টের' প্রাথমিক পর্বে কৌমবন্ধন পুরোপুরি শিথিল হয়নি। প্রভাসতীর্থে প্রচুর মদ্যপান করে যাদবগণ উন্মাদ হয়ে উঠলেন, কৌমপ্রীতি জেগে উঠলো, ধর্মভ্রাতাদের মধ্যে হত্যালীলা অনুষ্ঠিত হলো। এর আগেও যাদবগণ প্রভাসতীর্থে নিশ্চয় এসেছেন, সুরাপান করে হিস্টিরিক আচরণও করেছেন, তখন হয়তো কৃষ্ণ গণ-সম্মোহনের সাহায্যে তাদের হিস্টিরিয়া আরোগ্য করে ধর্মসাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃত্ববোধ দৃঢ় করার প্রয়াস পেয়েছেন। কৃষ্ণের যে সম্মোহনের ক্ষমতা ছিল তার নিদর্শন অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখানোর মধ্যে পাওয়া যায়। গণসম্মোহনের সাহায্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি সূর্যাস্তের আগেই দুপক্ষের হাজার হাজার যোদ্ধাকে অভিভূত করে, সূর্যাস্ত হয়েছে এই ধারণা দ্বারা অভিভাবিত করেছিলেন। ফলে অর্জুন জয়দ্রথ বধ করে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন ও পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিতে পেরেছিলেন। মহাভারতের যুগে কৌমসমাজ ভেঙ্গে ধর্মীয় সমাজ গড়ে উঠছিলো। তার দ্বন্দ্ব সংঘাত নিঃসন্দেহে সমসাময়িক মানুষকে প্রভাবিত করেছিলো। 'করিবান্টেস'দের মত তখন গুপ্ত ধর্মসম্প্রদায়ও ছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ যদিও দুর্লভ। গণ-হিস্টিরিয়ার উপযুক্ত পরিবেশ তখন বিদ্যমান ছিল,—একথা অবশ্য অনুমানের উপর নির্ভর করে বলতে হয়। তবে একথা বোধ হয় ইতিহাসসম্মত যে গণহিস্টিরিয়ার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সময়। বৌদ্ধধর্মের প্রকাশ্য প্রভাব লোপ পেয়েছে, কিন্তু গোপনে গোপনে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম, নাথধর্ম, কৌলধর্ম, তন্ত্রাচার রীতিমত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তন্ত্রমতাবলম্বী কুলাচারী হিন্দু ও সহজিয়া বৌদ্ধগণ নানাস্থানে দল বেঁধে যে ধরনের ধর্মানুষ্ঠান করতেন তার সঙ্গে গ্রীস দেশের 'ম্যাজিকো-মেডিক্যাল' গুপ্ত সমিতির আচার অনুষ্ঠানের অনেকাংশে মিল ছিল। সমাজের উচ্চবর্ণ রঘুনন্দনের

স্মৃতি ও নব্যন্যায় নিয়ে মেতে থাকতেন, নিম্নবর্ণের মধ্যে প্রচলিত ছিল 'orgiastic' (উন্মাদনাময়) ক্রিয়াকর্ম। এদের ধর্ম, রাজধর্ম ইসলাম ও উচ্চবর্ণের হিন্দুধর্মের মধ্যে সংঘাত লেগেই ছিলো। ধর্মান্তরণও ঘটছিলো। এই ধর্মান্তরণ নিঃসন্দেহে জনসাধারণের মধ্যে তীব্র মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিলো। এ সবই গণহিষ্টিরিয়ার উপযোগী পরিবেশ। এই সময়ে শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত প্রেমধর্ম নিম্নশ্রেণীর অধিকাংশের মধ্যে নিয়ে আসে মানসিক প্লাবন। গোপনে যাঁরা নানাভাবে ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উন্মাদনার আনন্দ পাচ্ছিলেন, তাঁরা প্রকাশ্যে বেরিয়ে এসে নামসংকীর্তনের সাহায্যে নিরুদ্ধ ভাবাবেগ, বিশেষ করে তাঁদের ভয় ও বৈরীভাবের মুক্তি খুঁজে পেয়ে নিরাপত্তা বোধ ফিরে পেলেন। নাম সংকীর্তন করতে করতে অশ্রুবিগলিত হওয়া, ভাবাবেগে চেতনা হারানো—হিষ্টিরিয়ারই অভিব্যক্তি। এই প্রেমধর্ম একদিকে গণহিষ্টিরিয়া সৃষ্টি করে ছোট ছোট গোষ্ঠিগুলিকে এক বৃহৎ ধর্মসম্প্রদায়ের অঙ্গীভূত করে একভাব একাচরণ গ্রহণে প্রবৃত্ত করেছিল; অন্যদিকে তাদের গোপনীয়, অনেকক্ষেত্রে অসামাজিক হিষ্টিরিয়াধর্মী অনুষ্ঠান বন্ধ করেছিল। 'ডায়োনিসিয়ান কাল্ট'-এর সঙ্গে এই 'ambivalence' এর তুলনা করা চলে। "As Dionysos Bakcheios, he induced hysteria in his worshippers, who, being possessed by him, called themselves by his name, becom ing ba´kchai or la´kchai ; as Dionysos Lysios, he withdrew from them and so restored them to their right mind" (Ibid p 354)।

গণহিষ্টিরিয়া কি এক ধরনের সামাজিক রোগ না এক পরিবৃত্তিকালীন পরিস্থিতি, যার প্রভাবে আবিষ্ট জনতার আত্মপ্রকাশ ঘটে বিদ্রোহ-প্রচেষ্টায়? ব্যক্তি-হিষ্টিরিয়ার আধিক্য দেখা যায় সাধারণত অশিক্ষিত ও আদিমসভ্যতার আওতায় বেড়ে ওঠা মানুষের মধ্যে। তার কারণ কিন্তু এ নয় যে, পরিবেশের সঙ্গে তাদের বিরোধ সভ্য মানুষের থেকে বেশি। তাদের মস্তিষ্কের কোষের 'ইলাসটিসিটি' (elasticity) কম এবং তাদের আবেগপ্রবণতা বেশি। যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে তারা কোনো ব্যাপারকে তলিয়ে দেখে না, পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে সব কিছুকে গ্রহণ করে। আজকের সভ্য মানুষের মধ্যে ব্যক্তি-হিষ্টিরিয়ার প্রকোপ কমেছে, গণহিষ্টিরিয়ার প্রকোপ, কিন্তু বিশেষ বিশেষ সামাজিক পরিবেশে, আগের মতই আছে।

অনেকগুলো মানুষ, (বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্ত্রীলোক) আপনা থেকে এক সঙ্গে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে উন্মাদের মত আচরণ করছে—আজকাল হয়তো এরকমটি ঘটে না। প্রাচীন গ্রীসে এ ধরনের ঘটনা হামেশাই ঘটতো। এমনকি পঞ্চাশ ষাট বছর আগেও মালয় দেশে গণহিষ্টিরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে দলে দলে মেয়েরা নিজেদের ঘর ছেড়ে গান গাইতে গাইতে বনে জঙ্গলে গিয়ে কয়েক রাত কাটিয়ে আসতো। প্রথমে একজন এই রোগে আক্রান্ত হতো, তারপর দল বেঁধে সকলে তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতো। এখন ঠিক এ-ধরনের ঘটনার কথা শোনা যায় না। তবে স্বতঃউৎসারিত গণহিষ্টিরিয়ার এক আধটা ক্ষুদ্র সংস্করণ একালেও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। কয়েক বছর আগে এই কোলকাতা শহরে 'ঝিনঝিনিয়া' নামে এক ব্যাধির আবির্ভাবের কথা অনেকের হয়তো মনে আছে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক লোক এই হঠাৎ-কাঁপুনি রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। চারিদিকে হৈচৈ পড়ে গিয়েছিলো। হাসপাতালের নামজাদা চিকিৎসকরা সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছিলেন এই মর্মে যে, এটা কোনো মারাত্মক রোগ নয়, এতে মানুষ মরে না, রোগাক্রান্তকে হাসপাতালে পাঠাবার দরকার নেই। কয়েক বালতি জল মাথায় ঢাললেই রোগ ছেড়ে যাবে। দু'চারদিনের মধ্যেই 'ঝিনঝিনিয়া'র কথা আর শোনা যায়নি। এই 'ঝিনঝিনিয়া' হিষ্টিরিয়া ছাড়া আর কি হতে পারে?

গণহিষ্টিরিয়া সৃষ্টি এখনও করা যায়, করা হয়ে থাকে। গণহিষ্টিরিয়া সৃষ্টির কয়েকটি প্রয়োজনীয় শর্ত আছে। প্রাথমিক এবং অতি-আবশ্যক সামাজিক শর্তের কথা আগেই বলেছি। দ্বিতীয় শর্ত গণসম্মোহন সৃষ্টি করার মত শক্তিশালী 'জাদু-চিকিৎসক' বা দলনেতা। তৃতীয় শর্ত উপযুক্ত মাধ্যম। তিরিশের দশকের জার্মানীর কথা একবার স্মরণ কর। জাদু-চিকিৎসক হিটলারের নামে জনসমাবেশ ঘটেছে। জনতার কাছে হিটলারের বাণী বা সমাবেশের আহ্বান পাঠাবার প্রধান মাধ্যম সংবাদপত্র, রেডিও; সাহায্যকারী মাধ্যম 'ব্রাউনসার্ট' বা স্কাউটদের স্কোয়াড। মহতী সভায় মহান নেতার ডাকে কয়েক হাজার মানুষ এক জায়গায় জমায়েত হয়েছে। দেশের সমস্যা সমাধানের অমোঘ নির্দেশ আসবে ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন নেতার মুখ থেকে। অধ্যাপক, লেখক, কেরানী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, স্বল্পবুদ্ধি ইত্যাদি সব রকমের মানুষের ভিড়। ঠিক যেন গ্রীসের ডেলফি বা ভারতের ভবানীমন্দিরের চত্বরে জমায়েত হয়েছে পুরণো দিনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সরলবুদ্ধি মানুষ দৈববাণী বা প্রত্যাদেশ শুনতে। শ্রোতারা আগে থেকেই আংশিকভাবে

সম্মোহিত। তাদের অভিভাবনের সাহায্যে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত করে তখনকার মত যে কোনো হঠকারী কাজে প্রবৃত্ত করানো যায়। অথবা ভবিষ্যতের কোনো বৃহত্তর নাটকের অভিনয়ের জন্য এই হাজার হাজার অভিনেতাকে মহড়া দিয়ে প্রস্তুত রাখা চলে।

তুমি নিশ্চয়ই প্রশ্ন তুলবে—ইহুদী বিতাড়ন ও আর্যশোণিতের বিশুদ্ধতা রক্ষা করলে জাতির মুক্তি ও উন্নতি ঘটবে—এ ধরনের ধোঁকাবাজিতে অশিক্ষিত অর্বাচীন না হয় প্রভাবিত হতে পারে, কিন্তু উচ্চশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক দার্শনিক চিন্তাবিদরা কেন নাৎসী প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে অযৌক্তিক তত্ত্বকে মেনে নেবে? বর্বরের মত আচরণ করবে?

তোমার প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে, তোমাকে crowd-psychology বা গণমনস্তত্ত্ব বুঝতে হবে, group ও crowd-এর পার্থক্য জানতে হবে। এই সম্পর্কে প্রথমে এ্যালডু হাক্সলীর মতামত শোন। "Quantitatively, a group differs from a crowd in size ; qualitatively, in the kind and intensity of the mental life of the constituent individuals. A crowd is a lot of people ; a group is a few. A crowd has a mental life inferior in intellectual quality and emotionally less under voluntary control than the mental life of each of its members in isolation. The mental life of a group is not inferior, either intellectually or emotionally, to the mental life of the individuals composing it and may, in favorable circumstances, actually be superior. The tone of crowd-emotion is essentially orgiastic and dynosiac." (The World of Aldous Huxley : New-York, 1947, p 513).

এ্যালডু হাক্সলীর এই বক্তব্য অবশ্য অংশত সত্য। কোনো উঁচু দরের আদর্শ অনুপ্রাণিত না হয়ে যদি অনেক লোক কেবলমাত্র আতঙ্ক বা নিরাপত্তা-হীনতার তাড়নায় একত্র মিলিত হয়, তবে নিঃসন্দেহে তাদের বুদ্ধ্যঙ্কের গড় নিম্নতম মাত্রায় গিয়ে দাঁড়ায়। কূটতার্কিক বিজ্ঞানী, যুক্তিবাদী দার্শনিক, মানবদরদী চিন্তাবিদ্-এর যুক্তিবুদ্ধি অশিক্ষিত অমার্জিত অসামাজিক লুম্পেনদের

সমমাত্রিক হয়ে যায়। সব মানুষ মাঝে মাঝে যুক্তিবুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে প্রক্ষোভস্রোতে গা ভাসিয়ে কিছুটা সময়ের জন্য ছুটি পেতে চায়। সীমিত ব্যক্তিত্ব ও ক্ষুদ্র অহং-এর বন্ধন মুক্ত হয়ে লক্ষ মানুষের আসুরিক শক্তির সঙ্গে একাত্মীভূত ক্ষমতার মদ পান করবার আকাঙ্ক্ষা তাদের মধ্যে জেগে ওঠে। আজকের দিনের শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বুদ্ধিমান, নির্বুদ্ধি সকলের মধ্যেই তাই মাদক দ্রব্য আর সুরা সেবনের আকণ্ঠ পিপাসা; আর বিরাট বিশাল জনতার মধ্যে মিশে গিয়ে সাইক্লোন টর্ণাডোর মত দুর্বার হবার আকুল বাসনা। আজকের মানুষ আত্মোন্নয়নের পথের সন্ধান হারিয়ে ফেলেছে, ঊর্ধলোকে যাবার উপায় খুঁজে পাচ্ছে না; তাই নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে ঢালু পিচ্ছিল পঙ্কিল নরকের নিম্নগামী পথে। সে পথ তাদের নিয়ে চলেছে "to the darkness of subhuman emotionalism and panic animality" (Ibid)। তাই হিটলারের মত ডিক্টেটর অতি সহজেই এদের পরিচালিত করে।

হাক্সলীর সব কথা মানা চলে না। আশাহত মিশনারীর দৃষ্টি দিয়ে তিনি জগৎকে দেখেছিলেন। নিজের মর্মপীড়া দূর করতে 'মেসকালিনের' আশ্রয় নিয়েছিলেন। তবে একথা সত্যি যে, আজকের পুঁজিবাদী সমাজের অনেক বুদ্ধিজীবি, অনেক তরুণ-তরুণীই হাক্সলীর মত মর্মপীড়ায় ভুগছেন এবং সম্মোহিত হয়ে কোনো যাদুকরের জাদুদণ্ডের নির্দেশে 'Orgiastic emotion' উপভোগের জন্য হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত হতে প্রস্তুত।

জনসমাবেশের ও গণহিষ্টিরিয়ার সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ নির্ণয়ের বেলায় এ্যালডু হাক্সলী নিরপেক্ষ সমাজ বিশ্লেষণের পরিচয় দিতে পারেন নি। তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবিলাসী মানসিকতার ফলে তিনি স্বভাবতই জনসমাবেশ বা ক্রাউড্-বিরোধী। প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যে গণচেতনার স্তর উন্নততর হতে পারে, এ বিশ্বাস তিনি পোষণ করতেন না। গণহিষ্টিরিয়ার প্রকোপ বা প্রাদুর্ভাব কোনো দেশে কোনো সময় বাড়লে বুঝতে হবে সমাজের রূপান্তরণের প্রয়োজন হয়েছে। হিষ্টিরিয়ার প্রধান উপসর্গ দেহাঙ্গের মাংসপেশীর আক্ষেপের মাধ্যমে মনের তলায় জমে ওঠা পাপবোধ, বিবেকদংশন, ভয়, বিক্ষোভ ইত্যাদির সাময়িক উপশম ঘটে। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, কেবলমাত্র জৈব-প্রবৃত্তি চরিতার্থের তাড়নায় আদর্শবিহীন জনসমাবেশ আত্মোন্নয়নের পরিবর্তে নিজেদের অবনয়নের দিকে নিয়ে যাবে এবং হাক্সলী সঠিক মন্তব্যই করেছেন যে,

তাদের মধ্যে 'subhuman stupidity and emotionality' প্রকাশ পাবে। গণদেবতার পরিবর্তে গণদানবের অভ্যুত্থান ঘটবে, গণহিষ্টিরিয়ায় আত্মপ্রকাশ করবে সেই দানব।

এখন বোধহয় তোমার কাছে গণহিষ্টিরিয়া ব্যাপারটা অনেকখানি স্পষ্ট হয়েছে। গণসম্মোহন গণহিষ্টিরিয়া সৃষ্টি ও গণহিষ্টিরিয়া আরোগ্য দুই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হতে পারে আগেই বলেছি।

প্রাচীনকালে উন্মাদনা সৃষ্টি করার প্রধান ভূমিকা ছিল ধর্মের, বর্তমানে সেই ভূমিকা রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক পার্টিগুলি গ্রহণ করেছে। আগের দিনের মত ছোট ছোট গুপ্ত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব, কম বেশি, সব দেশেই বিদ্যমান। মধ্যযুগের পর থেকে এই সব গুপ্ত সম্প্রদায় বা সমিতি আর প্রধানত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে উন্মাদনা সৃষ্টি করে না; রাজনৈতিক শ্লোগান মন্ত্রতন্ত্রের স্থান নিয়েছে। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের পরিবর্তে অথবা তার সঙ্গে, এদের কাজ আলোচনা, আত্মসমালোচনা, প্রকাশ্য কুচকাওয়াজ অথবা গোপনে গেরিলা যুদ্ধের কৌশল শিক্ষা। তারা বিচ্ছিন্ন ও বিপ্লবী চেতনায় আচ্ছন্ন। প্রতিটি ছোট দল মনে করছে তাদের শ্লোগানই একমাত্র সঠিক শ্লোগান, তাদের পদ্ধতি ও কৌশলই একমাত্র সঠিক কৌশল। তারা সম্মোহিত। 'ম্যাজিকো-মেডিক্যাল ম্যান' নয়, 'ম্যাজিকো-পলিটিক্যাল' ম্যান তাদের সম্মোহক। মাধ্যম—রেডিও টেলিভিশন মাইক্রোফোন নয়, প্রকাশ্য বক্তৃতামঞ্চও নয়;—গোপনে মুদ্রিত ও পরিবেশিত পার্টিপত্রিকা। সম্মোহন-অভিভাবনের ক্ষমতা তা বলে, এতটুকুও কম নয়। অন্যদিকে নড়বড়ে পুরণো সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টায় শাসকশ্রেণীর হাতে রয়েছে ব্যাপকভাবে গণসম্মোহন ও গণঅভিভাবনের ব্যবস্থা। অভিভাবনের প্রধান মাধ্যমগুলি, কোনো দেশে একচ্ছত্র পুঁজির করায়ত্ত কোথাও বা সবই প্রায় রাষ্ট্রায়ত্ত। নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা ও সর্বাত্মক মুক্তির উদ্দেশ্যে বিরোধী পক্ষ জনগণকে অসন্তোষ ও হিষ্টিরিয়ার অভিভাবন দিচ্ছেন; আর রাষ্ট্র-অধিকর্তারা জনসাধারণকে সম্মোহিত করে ধৈর্য অবলম্বনের নির্দেশ দিচ্ছেন। এছাড়া আছে সংসদীয় বিরোধীপক্ষ। তাঁরাও জনসাধারণকে সম্মোহিত অভিভাবিত করে চলেছেন, কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে ছাড়া তাঁরা গণহিষ্টিরিয়া সৃষ্টি করতে চান না। অবশ্য, এই রাষ্ট্রযন্ত্রই একদিন শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাঁরা করায়ত্ত করতে পারবেন—এই আশা তাঁরা পোষণ করেন। কাজেই

বিক্ষোভ বিশৃঙ্খলা এড়িয়ে চলা, অথবা নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে রাখতে চাওয়াটাই তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। তাছাড়া পুলিশ-মিলিটারী ইত্যাদি রাষ্ট্রশাসকের আজ্ঞাবহ—এটাও তাঁরা জানেন। এঁদের মাধ্যম রাষ্ট্রপ্রভুদের মত অপর্যাপ্ত না হলেও, সুসংগঠিত ও শক্তিশালী। এক ডাকে মাঠে ময়দানে লক্ষ লোক জড়ো করার ক্ষমতা এঁরা রাখেন। সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন যতই তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে, ততই গণহিষ্টিরিয়ার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। জমি থেকে উৎখাত অশিক্ষিত প্রাচীন ভাবধারায় আচ্ছন্ন চাষীরা এসে শহর নগরে ভিড় জমাচ্ছে। মজুরেরা ক্রমশ আধুনিক সভ্যতার পণ্যপূজায় দীক্ষিত হচ্ছে। পুরণো দিনের পারস্পরিক সংযোগের মাধ্যমগুলো লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বেকারের ভিড় বেড়েই চলেছে। অসন্তোষের আগুন সর্বস্তরে ধূমায়িত হচ্ছে। আবার পরিবহনব্যবস্থার উন্নতি নানাধরনের মানুষের মেশামিশি সহজ করে তুলছে। বুঝতেই পারছো, আমি উন্নয়নকামী দেশের ছবি তুলে ধরছি। এসব দেশে গণহিষ্টিরিয়া সৃষ্টির উপযুক্ত পরিবেশ, কাজেই সম্মোহনবাণ তুণ শূন্য করে নিক্ষেপ করা সত্ত্বেও হিষ্টিরিয়ার প্রকোপ ও প্রকাশকে রোধ করা যাচ্ছে না। উন্নত দেশের ছবিও খুব উজ্জ্বল বলে মনে হয় না। গ্রীক পুরাণের সুরা দেবতা তো ছিলেনই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভারতীয় পুরাণের গঞ্জিকা দেবতা। শুধু রাজনীতিক্ষেত্রে নয়, সব ক্ষেত্রেই মানুষ একই রকম আচরণ করছে। হাটে-বাজারে-ঘাটে-খেলারমাঠে, রেলষ্টেশনে, ক্ষেতে-খামারে, অতি তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা হৈ-হুজ্জত লেগেই আছে। ধর্ম এবং ভাষা উন্মাদনার পাশব রূপের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। তার সঙ্গে আরো অনেক তুচ্ছ উপসর্গও যুক্ত হতে পারে। আসলে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রীতির সম্পর্ক যতই শিথিল হচ্ছে, মানুষ যতই নিঃসঙ্গ হচ্ছে, ততই ব্যক্তি অনেকের সঙ্গে মিলে দৈন্যবোধ নিঃসঙ্গতা দূর করে নিরাপত্তা লাভের চেষ্টা করছে। কোনো সময় ধর্ম, কোনো সময় ভাষা, কোনো সময় অন্যধরনের দাবীদাওয়ার ভিত্তিতে মিলিত হতে চাইছে। আসল উদ্দেশ্য নিরাপত্তা লাভ। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই সেই মিলন সহজ স্বাভাবিক আদর্শভিত্তিক আত্মীয়তা না হয়ে, উন্মাদনাকারী হিষ্টিরিয়াতে পর্যবসিত হচ্ছে।

[১২]

এইবার 'ম্যাস মিডিয়া' অর্থাৎ গণমাধ্যমের আলোচনার সূত্রপাত করছি।

সেই সঙ্গে ম্যাকলুহানের 'মাধ্যম বিপ্লব' সংক্রান্ত তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। মার্শাল ম্যাকলুহানের মাধ্যম-বিপ্লবের (রিভোলিউশন ইন মিডিয়া) তাৎপর্য বুঝতে হলে গণমাধ্যমের গোড়ার কথা দিয়ে শুরু করতে হবে। তার আগে ম্যাকলুহানের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া দরকার। গত কয়েক বছর ধরে তাঁর লেখার বিশেষ ভঙ্গী ও বিশিষ্ট মতবাদের জন্য ম্যাকলুহান আমেরিকার সংস্কৃতি জগতে আলোড়ন এনেছেন। কিছুদিন আগে মারকিউসকে নিয়ে যে হৈচৈ হয়েছিল ছাত্র-তরুণ মহলে, সেই রকম বা তার থেকেও বেশি চাঞ্চল্য উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে এই মার্শাল ম্যাকলুহানকে নিয়ে। আজকাল নাকি ওদেশে শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক এমন পত্র-পত্রিকা খুব কমই প্রকাশ পাচ্ছে, যার মধ্যে তাঁর উদ্ধৃতি থাকে না অথবা তাঁর সম্বন্ধে অন্তত দু'চার কথা লেখা হয় না। তাঁকে বলা হয়—এই যুগের সব থেকে প্রতিভাশালী ব্যক্তি ও দুঃসাহসী ভবিষ্যদ্বক্তা। কী এমন তাঁর বক্তব্য যার জন্য তাঁর এত নাম, এত প্রতিপত্তি? আমাদের চোখের সামনে বিরাট বিপ্লব ঘটতে চলেছে অথচ আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি না। রেডিও, টেলিভিশন, ইলেক্‌ট্রনিকস, অটোমেশনের প্রসারের ফলে দুনিয়াব্যাপী যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিয়েছে ম্যাকলুহান তাঁর বিশিষ্ট ভঙ্গীতে সেই বিপ্লবের কথা লিখে ও বলে চলেছেন। শুধু বক্তব্যই যে নতুন তা নয়, অনেক নতুন নতুন কথাও তিনি আবিষ্কার করেছেন। মিডিয়াকে তিনি ঠাণ্ডা গরম দুভাগে ভাগ করেছেন। মিডিয়াই সংবাদ—(দি মিডিয়াম ইজ দি মেসেজ) তাঁর এই তত্ত্ব সাংবাদিক মহলে শোরগোল তুলেছে। কয়েক বছর আগেও কানাডার এই অধ্যাপককে বেশি লোকে চিনতো না; আজ তিনি ফোর্ডহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত এবং বিশ্ববিখ্যাত। আজকাল বিপ্লবের কথা, বিশেষ করে নতুন ধরনের কোনো বিপ্লবের কথা বললেই রাতারাতি বিখ্যাত হওয়া যায়। এ থেকে অনায়াসেই অনুমান করা চলে যে, সামাজিক আর্থনীতিক রাজনীতিক ক্ষেত্রে আমূল একটা পরিবর্তন প্রায় বেশির ভাগ মানুষই চাইছে এবং তার প্রয়োজন খুব তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। শুধু অভাব অনটনের দেশ এশিয়া আফ্রিকা নয়, প্রাচুর্যের দেশ আমেরিকাতেও বর্তমান অবস্থা অনেকের কাছেই দুঃসহ হয়ে উঠেছে। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, মাত্র কিছুদিন আগে 'উইদাউট মার্কস অর জেসাস্'-এর লেখক ফরাসী দেশের রেভেল বিদ্বজ্জন মহলে প্রধান

আলোচ্য হয়ে উঠেছিলেন। তিনিও লিখেছিলেন বিপ্লবের কথা। এশিয়া, আফ্রিকা, পূর্ব ইউরোপে নয়; বিপ্লব হবে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পীঠস্থান আমেরিকায়। কম্‌পিউটার-বিপ্লবের কথা তিনিও বলেছিলেন। 'প্রযুক্তি-বিপ্লব' এর উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু কথাটি বহু ব্যবহৃত, তাই জৌলুস নেই। ম্যাকলুহান জোর দিয়েছেন 'মিডিয়া-বিপ্লবের' উপর। একেবার আনকোরা না হলেও অনেকখানি বেশি চমক আছে কথাটিতে। মারকিউস ও রেভেল-এর 'বিপ্লবতত্ত্ব' নিয়ে অনেক আলোচনা আমাদের দেশে হয়েছে। পত্রপত্রিকার পাতায় তুমি নিশ্চয়ই অনেকবার তাঁদের নাম দেখেছ। সেই তুলনায় বলা চলে, ম্যাকলুহান অবহেলিত। তোমার তাগিদে ম্যাকলুহানের নাম পত্রিকার পাতায় ঠাঁই পাচ্ছে।

এবার গণমাধ্যমের গোড়ার কথায় যাওয়া যাক। তোমার ফরমায়েস মত আদিমাধ্যম—নাটক সম্বন্ধে তু'চার কথা বলেই সোজা একেবারে অন্তমাধ্যম টি-ভিতে চলে যাব। এ্যারিষ্টটল থেকে একলাফে ম্যাকলুহান।

গণহিষ্টিরিয়া সৃষ্টি ও নিরসনের জন্য গণমাধ্যমের প্রয়োজন। আগেই এ সম্পর্কে কিছু বলেছি। প্রাচীন কালে যাতুবিদ্যার সাহায্যে ব্যক্তিহিষ্টিরিয়া সারানো হত। কোনো দেশে যাতু চিকিৎসক স্তোত্রপাঠ করে বা গান শুনিয়ে রোগীর শারীরিক আক্ষেপ বাড়িয়ে দিতেন। এর ফলে, মনে হয়, তার অন্তরের চাপা ভয় ভাবনা ক্রোধ বিদ্বেষ সাময়িক ভাবে দূর হত, সে ভাল হয়ে উঠতো। কোথাও বা রোজা এসে মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়ফুঁকের সাহায্যে অথবা দেহের উপর উৎপীড়ন চালিয়ে ভর-হওয়া আত্মাকে তাড়িয়ে দিয়ে রোগীকে সুস্থ করে তুলতেন। গণহিষ্টিরিয়া প্রকাশ পেত সম্মিলিত নাচগান হৈ-হুল্লোড়ের মাধ্যমে, আবার গণহিষ্টিরিয়া দূর করতেও ব্যবহৃত হত ঐ একই মাধ্যম। ঐশী বা দৈবশক্তির অধিকারী বলে স্বীকৃত কোনো ব্যক্তি হতেন এই হিষ্টিরিয়া যজ্ঞের হোতা। সাধারণ মানুষের উপর এঁদের প্রভাব ছিল অসাধারণ। এঁরা নিজেরাও বোধ হয় ছিলেন হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত, অতি সহজেই এঁদের মনে বিষঙ্গিত অবস্থা দেখা দিত। সেই অবস্থায় এঁদের মুখ দিয়ে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দৈববাণী বেরিয়ে আসতো। অনেক সময় ভর করা প্রেতাত্মা বা দেবাত্মা রোগীর দেহ ছেড়ে যাবার আগে গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় সম্পর্কে কিছু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করে যেত। এখনো, জানো বোধ হয়, স্পিরিচুয়ালিষ্টরা মিডিয়াম হিসেবে হিষ্টিরিক টাইপের ব্যক্তিকে

ব্যবহার করে থাকেন। যাক সে কথা। প্রাচীন কালের ঐ সব 'প্রফেট' বা ভবিষ্যদ্বক্তারাই পরবর্তী কালের চারণকবি, লোকগায়ক। প্রাচীনতম গণমাধ্যম বোধ হয় নাচের সঙ্গে গান এবং কবিতা আবৃত্তি—নাটকের প্রাথমিক অবস্থা। গ্রীসে এবং আমাদের দেশে মহাকাব্যের অনেক পরে সংগঠিত নাটকের জন্ম, কিন্তু নাচগান অঙ্গভঙ্গীসহ একক অভিনয়ের দ্বারা প্রচার, লোকরঞ্জন, উন্মাদনাসৃষ্টির প্রয়াস অনেক পুরণো। নাটককেই আদি মাধ্যম বলা চলে।

নাটককে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যয়। ট্রাজেডি ও কমেডি। ট্রাজেডি সম্পর্কে এ্যারিষ্টটলের আলোচনা নিশ্চয়ই কলেজে থাকতে পড়েছ। দর্শকের মনে বিরেচকের কাজ করে ট্রাজেডি, ছোটবেলা থেকে শুনে আসছো। ডায়োনিসিয়ান উৎসবের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ও হৈচৈ-এর মাধ্যমে হিষ্টিরিয়া সৃষ্টি করে, মনের তলায় চাপা ভয় রাগ বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হত। ট্রাজেডির মাধ্যমেও ঐ ধরনের ব্যাপার ঘটতো। 'ডায়োনিসিয়ান্ কাল্ট'-এর মত কোনো নতুন ধর্মে দীক্ষা আর ট্রাজেডীর অভিনয় দর্শনে একই ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া ঘটে থাকে। পণ্ডিতদের মতে গ্রীক ট্রাজেডীর জন্ম হয়েছে ঐসব ধর্মীয় আচারবিধি পালনের উৎসব থেকে। এ্যারিষ্টটলের কথায় বলতে পারি: ট্রাজেডির কাজ—"through pity and fear to effect the purgation of emotions". ভেতরের প্রক্ষোভ বের করে দিয়ে জীবনকে নতুনভাবে গ্রহণ করতে সাহায্য করে ট্রাজেডি। ট্রাজেডির অভিনয় সম্পর্কে প্লেটোর নিষেধাজ্ঞার মূলে ছিল এই ধারণা যে নিষ্ঠুর ভাগ্য ও নির্দয় ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ববিরোধের চিত্র মানুষের মনে যে উন্মাদনা জাগায়, সেটা স্থিতাবস্থা বজায় রাখার অথবা ঐতিহ্য অনুসৃতির পক্ষে অনুকূল নয়। "Plato banned tragedy because it was subversive of the established order. Aristotle replied that a closer analysis showed it to be conservative of the established order...... he assumed that where there is maladjustment between the individual and the society, it is the individual that must be adapted to the society, not society to the individual" (Thomson ; Aeschylus and Athens. p 359). প্লেটোর ধারণার বশবর্তী হয়েই বোধহয় ইসলাম ধর্মগুরুদের কাছে নাচগান অভিনয় শাস্ত্র-বিগর্হিত। এই একই কারণে বোধহয় সংস্কৃত ভাষায় ট্রাজেডির অভাব। খৃষ্টধর্মীদের

মধ্যে কিন্তু পাপস্বীকারের (কনফেশন) মধ্য দিয়ে পাপস্খালনের বিধান ছিল। তাঁরা তাই ট্রাজেডীকে দোষাবহ মনে করেননি। অথচ এ্যারিষ্টটল সেই প্রাচীনকালেই একালের ফ্রয়েডিয়ান মনসমীক্ষকদের মত বুঝেছিলেন যে, ট্রাজেডির বিরেচনক্রিয়া (ক্যাথারসিস) সাময়িক উন্মাদনা সৃষ্টি করে। নাগরিকদের চাপা অসন্তোষ ঘৃণা দূর হয় এবং পরে তারা শান্তশিষ্ট ঐতিহ্য-অনুগামী হয়ে ওঠে। তিনি বুঝেছিলেন, শ্রেণী-সংঘাত, সম্ভাব্য অরাজকতা ও বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখতে ট্রাজেডি সহায়তা করবে। মানসিক চাপ লাঘব করার সব থেকে উপযোগী মাধ্যম হিসেবে ট্রাজেডীর গুণগান করেছিলেন এ্যারিষ্টটল। ফ্রমপ্রমুখ আধুনিক সাইকো-এ্যানালিষ্টদের মতই তিনি চেয়েছিলেন যে ব্যক্তি সমাজের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবে, সমাজ পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করবে না। এ্যারিষ্টটলের নাটকীয় সূত্র পরিহার করে ব্রেখট তাই নতুন সূত্র অনুযায়ী নাটক লেখার পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। নাটককে সত্যিকারের বিপ্লবের সহায়ক করে তুলতে চেয়েছিলেন। ট্রাজেডীতে যদি থাকে হিষ্টিরিয়া সৃষ্টির উপাদান, কমেডিতে আছে সম্মোহন সৃষ্টির উপকরণ। নিছক লোকরঞ্জন মানে দর্শকদের চোখে মোহ-অঞ্জন মাখানো। নাটক-অভিনয় ব্যয়সাপেক্ষ। রাজা জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া নাটক-অভিনয় সম্ভব ছিল না, কাজেই এই মাধ্যমটি প্রভুশ্রেণীর স্বার্থেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রয়োজিত হয়েছে। প্রচলিত রীতিবিরুদ্ধ নাটক যখনই সোজাসুজি সমাজ পরিবর্তনের বা বিপ্লবের কথা বলতে চেয়েছে, বিদগ্ধ সমালোচকরা তখনই নন্দনতাত্ত্বিক কূট আলোচনায় নাটকটিকে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন, অথবা রাজরোষে নাটক নাট্যকার অভিনেতারা সাজা পেয়েছেন।

গণমাধ্যমের আলোচনায় বিপ্লবের কথা বলতে হচ্ছে বাধ্য হয়েই। যে ম্যাক্‌লুহানের প্রসঙ্গ দিয়ে প্রবন্ধের সূত্রপাত করেছি, তিনি মাধ্যম-বিপ্লবের প্রবক্তা। তার বক্তব্য বুঝতে হলে দ্বন্দ্ব-সংঘাত-বিপ্লব সম্পর্কিত কিছু কিছু কথা, মুখরোচক না হলেও, তোমাকে শুনতে হবে। আর একটা কথা এখানেই জানিয়ে রাখি। এ্যারিষ্টলীয় বিধিসম্মত ট্রাজেডির বা রম্য কমেডির লেখকরা সকলেই যে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষপাতী কিম্বা শাসকশ্রেণীর লোক ছিলেন, এরকম কোনো ইংগিত আমার বক্তব্যে আমি দিতে চাইনি। ভুল করে যেন ভেবো না বিশ্ববিখ্যাত নাটকগুলোকে এবং নাট্যকারদের আমি হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছি। গণহিষ্টিরিয়া গণসম্মোহন সৃষ্টিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা বর্তমানে

আমাদের আলোচ্য। নাটকের দোষগুণ বিচার বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। ভুলো না সে কথা। আমার মতে গণহিষ্টিরিয়া গণবিদ্রোহের অসুস্থ সংস্করণ। গণমানসের অসন্তোষ অবিশ্বাস ঘৃণা ক্রোধের অভিব্যক্তি ঘটে গণহিষ্টিরিয়াতে। সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা যখন জনসাধারণের চাহিদা মেটাতে পারে না, সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিচালকরা যখন জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, তখন গণহিষ্টিরিয়ার অনুকূল অবস্থা তৈরী হয়। অসুস্থ সমাজ অনেক ব্যক্তিকে একযোগে অসুস্থ করে তোলে। রাষ্ট্রপরিচালকরা গণমাধ্যমের সাহায্যে জনতাকে সম্মোহিত করে সংযত রাখতে চান, কখনও বা কৌশলে সাময়িক উন্মাদনা সৃষ্টি করে তাদের শান্ত করতে চান। অপরদিকে, বিরোধীপক্ষ তাঁদের আয়ত্তাধীন মাধ্যমের সাহায্যে অসন্তোষ ঘৃণাকে বাড়িয়ে বিস্ফোরণ ঘটাতে চান, গণহিষ্টিরিয়াকে গণবিপ্লবে রূপান্তরিত করতে চান! অনেক সময় সত্যিকারের বৈপ্লবিক পরিস্থিতি না থাকা সত্ত্বেও অনেক ছোটখাটো দল বা সম্প্রদায় বিশেষ শক্তিসম্পন্ন নেতার জাদুবাক্যের মিডিয়ামের সাহায্যে গ্রুপহিষ্টিরিয়া সৃষ্টি করে নিজেদের মনে জমানো ক্রোধ, ঘৃণার বহিঃপ্রকাশের পথ খুঁজতে চান, নিজেদের সমাজ-বিচ্ছিন্নতার নিরসন চান। সব সমাজে মাঝে মাঝে সর্বাত্মক পরিবর্তনের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হয়, আংশিক পরিবর্তন বা উন্নয়নের প্রয়োজন সব সময়েই থেকে যায়। কাজেই গণহিষ্টিরিয়ার অনুকূল পরিবেশ না থাকলেও গ্রুপহিষ্টিরিয়ার অনুকূল অবস্থা সব সময়েই থাকবে। সেই দিক থেকে, তুমি যে প্রশ্ন তুলেছ, তার গুরুত্ব অপরিসীম।

এবার সোজাসুজি একেবারে ম্যাক্‌লুহানের কথায় আসা যাক। সংবাদপত্র সিনেমা রেডিও টেলিভিশন ইত্যাদি সব রকমের মাধ্যম এই প্রসঙ্গে এসে পড়বে একসঙ্গে। মিডিয়াবিপ্লব বলতে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন? অতি-আধুনিক ইলেক্‌ট্রনিক মিডিয়া, বিশেষ করে টেলিভিশন তাঁর আলোচ্য বিষয়। "আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং মিডিয়া: দি এক্‌সটেনশনস অফ্ ম্যান" বইটি (১৯৬৪) প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁব নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। 'ইলেক্‌ট্রনিক মিডিয়া' মানুষকে বদলে দিয়ে নতুনভাবে তার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত করতে চলেছে—এই হল ম্যাকলুহানের বক্তব্য। এই হল এক কথায়—'মিডিয়া বিপ্লব'। এই নতুন মাধ্যমটি শুধু চিত্তবিনোদনের আর একটি উপকরণ নয়, এর আকর্ষণ গভীর ও সুদূর প্রসারী। আমেরিকার জনজীবনে এর অসীম গুরুত্ব ম্যাক্‌লুহানের আগে অনেকেই বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু তাঁর আগে আর

কেউ বোধ হয় ভাবেননি যে মানসিকতার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাবার ক্ষমতা আছে 'টি-ভি'র। টেলিভিশন শিল্পীরা ক্রমশ খুব অল্প কথায় সংবাদ (ম্যাকলুহানের কাছে পণ্য-পূজার বিজ্ঞাপনই আসল সংবাদ) পরিবেশনের নতুন নতুন কৌশল আয়ত্ত করছেন। এর ফলে ভাষার বাঁধন ভেঙ্গে ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে অন্তরের যোগাযোগ স্থাপিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এ হল একটা দিক। অন্য দিকটির গুরুত্ব আরো বেশি। আমেরিকা ও অন্যান্য প্রযুক্তিকুশল শিল্পোন্নত দেশগুলির মানুষ ক্রমশ নিজেদের অসহায়ত্ব ও যন্ত্রনির্ভরতার জন্যে আতঙ্কিত হয়ে উঠছিল। প্রযুক্তিবিজ্ঞান ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের মত ক্রমশ স্রষ্টার নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যাচ্ছে, মানুষ ক্রমশ যন্ত্রের দাস হয়ে পড়ছে—এই দুশ্চিন্তায় ওদেশের চিন্তাবিদদের অনেকের আহারনিদ্রা প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। এই সময় ম্যাকলুহান মাভৈ বাণী শোনালেন। না, মানুষ মিথ্যে ভয় পাচ্ছে। ট্রানজিস্টর কমপিউটার, বিশেষ করে টেলিভিশন খণ্ডিতসত্তা অসম্পূর্ণ মানুষকে সম্পূর্ণ অখণ্ড মানুষে পরিণত করতে চলেছে। এই নতুন মিডিয়া মানুষের সবকটি প্রধান ইন্দ্রিয়কে একসঙ্গে উদ্দীপ্ত করে তাকে এক নতুন জগতের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম মানুষের ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়কে আলাদা আলাদা ভাবে উত্তেজিত করে তার সর্বাঙ্গীণ পরিণতিকে ব্যাহত করছিল। আজ এই ইলেক্‌ট্রনিক যুগ টেলিভিশনের দৌলতে সবকটি ইন্দ্রিয়ের পরিণতি ঘটিয়ে, কল্পনা ও পঞ্চেন্দ্রিয়কে সমন্বিত করে তার সত্তাকে বিকশিত করছে। এই সমন্বয়ের নাম দিয়েছেন তিনি—'সাইনেস্থেশিয়া' (Unified sense and imaginative life)। আমরা এতদিন অসুস্থ অসম্পূর্ণ ছিলাম, কমপিউটার সিবারনেটিক্‌স-এর দৌলতে সুস্থ ও সম্পূর্ণ হতে চলেছি। এই অসুস্থতা সম্পর্কে আমরা ছিলাম অজ্ঞ, কেননা আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি এতদিন একপেশে হয়ে অসংবদ্ধ ভাবে বেড়ে উঠেছে। তাঁর মতে ইলেক্‌ট্রনিক যন্ত্রদানবকে বশে আনার প্রয়োজন নেই, তাকে ভয় করার দরকার নেই, তার হাতে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণই আমাদের মুক্তি এনে দেবে। এই ইলেক্‌ট্রনিক যুগের আগে খণ্ডিত মানুষ বিশেষজ্ঞ ও যন্ত্রজ্ঞ হয়ে পড়ছিল ; বিশেষ জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজন ছিল বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি চালাতে। নতুন যুগে বিশেষজ্ঞ শ্রেণী থাকবে না, সবাই যন্ত্রবিদ্যায় সমান বিশেষজ্ঞ হবে। কাজেই মানুষ খণ্ডিত বা একপেশে হয়ে বেড়ে উঠবে না। হ্যাঁ, প্রযুক্তি বিপ্লবের ফলে কিছু লোক বাড়তি হবে, বেকার হবে।

কিন্তু তার পরিবর্তে তারা পাবে অবাধ মুক্তি ও নিজেদের পছন্দমত কাজ করার স্বাধীনতা। পারমাণবিক যুদ্ধ নিয়ে মাথা ঘামাতে তিনি নারাজ। কেননা তিনি মনে করেন, যুদ্ধ ছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন অসম্ভব। পশ্চাৎপদ দেশগুলোর উপর হামলা না চালালে তাদের ঘুম ভাঙবে না, তারা তাছাড়া শিল্পায়নের চেষ্টা করবে না, স্বনির্ভর হবে না। অবশ্য, এসবই সাময়িক এবং ভবিষ্যৎ শান্তির মহড়া ছাড়া কিছুই নয়। সব থেকে বড় কথা, মানুষকে চিন্তাভাবনা পরিকল্পনা কিছুই করতে হবে না; কমপিউটারই তার সব কাজের ভার নেবে। কম্পিউটার মানবসমাজকে ঠেলে নিয়ে এগিয়ে যাবে। এর জন্যে সামাজিক সম্পর্কের অদলবদল করতে হবে না, কোনো আদর্শের বুলি আওড়াতে হবে না। শেষ পর্যন্ত স্থাপিত হবে শান্তির রাজ্য, সাম্যের রাজ্য, প্রাচুর্যের রাজ্য। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ লোপ পাবে। মানুষ মাত্রেই হবে মানুষের friend, philosopher and guide. যদি ইতিমধ্যে ম্যাক্‌লুহানের লেখা না পড়ে থাকো, তা হলে নিশ্চয়ই তুমি এইসব পড়ে অবাক হয়ে যাবে। ভাববে আমি বোধ হয় তোমার সঙ্গে সস্তা রসিকতা করার চেষ্টা করছি। না, ঠাট্টা নয়। সত্যিই এইসব তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে, নতুন ভঙ্গীতে, অনেক কিছু নতুন নতুন শব্দ তৈরী করে লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রযুক্তিবিদ্যার ও যন্ত্রের খামখেয়ালীপনাকে বশে আনা যাবে না ভেবে হতাশ হয়ে প্রস্তরযুগে ফিরে যাওয়া শ্রেয় মনে করছিল যারা, তারা এসব আশার বাণী শুনলে বক্তাকে ভয়ত্রাতা মুক্তিদাতা মনে করবেই। ম্যাক্‌লুহানকে তাই আমেরিকার অনেক বিভ্রান্ত মানুষ আদিমকালের 'ম্যাজিকো মেডিক্যাল ম্যানের' আসনে বসিয়ে তাঁর সব কথা, সে যত অসম্ভবই হোক না কেন,—নতশিরে মেনে নিয়েছে।

ম্যাক্‌লুহানের মতে নতুন মাধ্যম নতুন পরিবেশ তৈরী করে মানুষের ইন্দ্রিয় উপলব্ধির ক্ষেত্রে নতুনত্ব নিয়ে আসে। এর ফলে মানুষ পরিবর্তিত হয়, ঐতিহাসিক বিস্ফোরণ ঘটে এবং নতুন সমাজ গড়ে ওঠে। চিত্রলেখন থেকে ধ্বনিনির্দেশক বর্ণমালার আবির্ভাব মাধ্যমবিপ্লবের প্রাথমিক ধাপ। ফলে একই সঙ্গে উদ্ভূত মানুষের ইন্দ্রিয়ের বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং ইউক্লিডের জ্যামিতি। ইতিহাসে কিন্তু লেখে যে, এই দুই ঘটনা (ধ্বনিনির্দেশক বর্ণমালা এবং ইউক্লিডের আবির্ভাবের মধ্যে সাতশো বছরের ব্যবধান) পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, অসম্পর্কিত।

এর পর এই বর্ণমালা যখন প্যাপিরাসের পাতায় লেখা হল তখন ঘটলো আর এক বিপ্লব। ফলে রোমসাম্রাজ্য গঠিত হল। এর পরের ইতিহাস—জোহান গুটেনবার্গের টাইপে ছাপা বাইবেল। এটা ঘটেছিল ১৪৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। ছাপার টাইপ জন্ম দিল সংবাদপত্র ও সংবাদ পরিবেশনের। ফলে নাকি ঘটলো ব্যক্তিবাদ ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ। গুটেনবার্গের অনেক আগে চীনে ছাপার হরফ আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং গুটেনবার্গের বাইবেলের অনেক পরে (১৫০৮) প্রথম সংবাদপত্র ছাপা হয়ে পাঠকের হাতে আসে। এবং এরও একশ বছর বাদে সংবাদপত্র নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে, এবং উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা ছিল নগণ্য। নিয়মিতভাবে সংবাদপত্রকে গণমাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে। তাঁর সমালোচকরা এই সব ত্রুটি অসঙ্গতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও ম্যাক্‌লুহান এবং তাঁর ভক্তদল অবিচলিত। থিয়েটার-মাধ্যম, সিনেমা মাধ্যম, রেডিও মাধ্যম নিয়েও অনেক মজার মজার কথা বলেছেন তিনি। প্রত্যেকটি মাধ্যম সমাজকে আমূল পরিবর্তিত করেছে। কীভাবে জানো? পুরণো মিডিয়ার সঙ্গে নতুন মিডিয়ার দ্বন্দ্ববিরোধ থেকে নতুন সমাজের জন্ম হয়েছে। তিনি লিখেছেন, "The history of all hitherto existing society is the history of Media Struggle". এখন মিডিয়া-যুদ্ধের বিবরণ কিছু শুনতে হবে। তাঁর কথাতেই বলছি। "When the press opened up the "human interest" key board after telegraph had reconstructed the press medium, the newspaper killed the theatre, just as T V hit the movies and the night club very hard". ('Understanding Media') ছাপাখানা থিয়েটারকে ধ্বংস করলো, টেলিভিশনের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সিনেমা প্রচণ্ড মার খেলো। কিন্তু আমরা জানি থিয়েটার সিনেমা দুইই ম্যাক্‌লুহানের দেশে এবং অন্যান্য জায়গায় বেশ ভালরকমই চালু আছে। ধনকুবেররা অবশ্য এখন নতুন মিডিয়াতে বেশি লাভের সম্ভাবনা দেখে সেটার পৃষ্ঠপোষকতার দিকে বেশি মন দিয়েছেন। ম্যাক্‌লুহান বিভিন্ন মিডিয়ার মধ্যে যে প্রতিযোগিতা দ্বন্দ্ববিরোধ দেখেছেন, সেটা প্রধানত মুনাফার প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

এইবার মিডিয়া-দ্বন্দ্বের তাৎপর্য ও সামাজিক পরিবর্তনে ম্যাক্‌লুহানী তত্ত্বকথার

বিবরণ। প্রথমে ছাপাখানার কথা। আদিম কৌমসমাজে ছাপার হরফ ছিল না, পড়াশোনারও বালাই ছিল না। শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে চলতো ভাববিনিময় ও পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ। আদিম মানুষ শুধু শব্দময় জাদুর জগতে বাস করত। বর্ণমালা আবিষ্কারের ফলে লেখাপড়ার প্রচলন ঘটলো। দর্শনেন্দ্রিয় মানুষকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের জগৎ থেকে অপসারিত করলো। জাদুর জগত থেকে নির্বাসিত, কৌমগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পশ্চিমী সভ্য জাতির সেবা করা ছাড়া তাদের আর কোনো পথ রইলো না। তারা নতুন সমাজ গড়ে তুললো নতুন মিডিয়ার সংস্পর্শে এসে। এই তত্ত্বে তথাকথিত সভ্যজাতির বঞ্চনা শোষণের কোনো ইংগিত পর্যন্ত নেই। শুধু এই নয়। ছাপাখানার দৌলতে সারা দুনিয়ায় যে সভ্যতা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তার প্রতি ম্যাক্‌লুহান খুবই নিষ্করুণ। এই সভ্যতা সংস্কৃতি মানুষকে উন্নত করেনি, বরং তার একটি ইন্দ্রিয়কে বিশেষ ভাবে পীড়িত করে, তার একরৈখিক বৃদ্ধি ঘটিয়ে তাকে অসম্পূর্ণ খণ্ডিত অসুস্থ করে তুলেছে—এই তাঁর অভিমত। ছাপাখানা মানুষকে জ্ঞান যুক্তি বিচার বুদ্ধি দিয়েছে মনে করে গুটেনবার্গের কাছে ঋণ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নেই। বিচার বুদ্ধি, র‍্যাশনালিটি, মানুষের সব চেয়ে বড় অভিশাপ। বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক, অসামাজিক, প্রজাতিবৈরী। ঘাবড়ে যাচ্ছো? এসবই ম্যাক্‌লুহানের কথা। আমার নয়। তিনি বলেছেন, চেতনার স্তরে বিচরণ করে মানুষ কোনোদিনই মুক্তি পাবে না।

ম্যাকলুহানের মতে গণমাধ্যম হিসেবে সিনেমার স্থান সংবাদপত্রের চেয়ে খানিকটা উঁচুতে। একযোগে দুটি ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপ্ত করে—শ্রবণ ও দর্শন। চোখ কান কেউই বঞ্চিত হচ্ছে না। কিন্তু এখানে আমরা কেতাবী বুলি অর্থাৎ বর্ণমালাসৃষ্ট অর্থপূর্ণ শব্দঝংকারই শুনছি, কাজেই আদিম শব্দের জাদুরাজ্য সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া সিনেমার মধ্যে থাকে গোটা একটা সঙ্গতিপূর্ণ বক্তব্য যা আমাদের চেতনার রাজ্যে একটা যুক্তিপূর্ণ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ভাবানুষঙ্গ সৃষ্টি করে। মানুষের কাছে ভাষার মাধ্যমে এই 'র‍্যাশনাল এ্যাপ্রোচ' ম্যাকলুহান পছন্দ করেন না। তিনি চান অবচেতনার স্তরের উদ্দীপনা, রঙ রেখা শব্দযোগে কল্পনা ও ইন্দ্রিয় উপলব্ধির সমন্বয়। রেডিও যদিও ইলেকট্রনিকসের দৌলতে একই সঙ্গে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে একই সংবাদ পাঠাতে পারে, তবুও সেটা উন্নত বা সঠিক মিডিয়া নয়। কেননা তাকে নির্ভর করতে হয় সেই ভাষার ওপর আর

তার আবেদন কেবলমাত্র একটি ইন্দ্রিয়ের কাছে এবং সেই ইন্দ্রিয়ের মারফত চেতনার স্তরে। টেলিভিশনের ক্ষেত্রে যে সব নতুন নতুন পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে তার সাফল্য থেকে মনে হয় রেখা রঙ শব্দ অনুভূতির এক নতুন জগৎ গড়ে উঠছে; যেখানে সর্বস্তরের সর্বভাষার সর্বদেশের মানুষ একই ভাবানুভূতিতে বাঁধা পড়তে চলেছে।

মিডিয়াই সংবাদ (মিডিয়া ইজ মেসেজ)। সমাজ বদলায় মিডিয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে, মিডিয়ার লড়াই সমাজের গতি পরিবর্তন সূচিত করে। ছাপাখানার দৌলতে পাওয়া জ্ঞান বিচারবুদ্ধি মানুষকে অসম্পূর্ণ খণ্ডিত করেছে, তাকে একরৈখিক বৃদ্ধির পথে নিয়ে গেছে। আর আজ ইলেকট্রনিক যুগে আমাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুসংস্থার অবচেতনার স্তর সম্প্রসারিত হচ্ছে—এই হল মোটামুটি প্রফেট ম্যাকলুহানের বাণী। এর সঙ্গে অবশ্য যোগ করতে হবে আর একটি মূল্যবান কথা। টেলিভিশন মিডিয়ার দৌলতে ছাপার অক্ষর ও পুঁথিপত্রের দরকার কমে আসছে। এমন দিন আসবে যখন নতুন ইলেকট্রনিক মিডিয়া অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে বাড়িয়ে দেবে, ভাষার, এমনকি কথা বলার, প্রয়োজনীয়তা আর থাকবে না। তখন ঘটবে সত্যিকারের মিডিয়া বিপ্লব, যার ফলে নতুন মানুষের ভেদাভেদহীন নতুন পৃথিবী গড়ে উঠবে।

অন্য সব বিপ্লবী চিন্তানায়কদের মত ম্যাকলুহানও বিপ্লব চান। তবে তাঁর বিপ্লবের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে মানুষের কোন ভূমিকা থাকবে না। তাঁর মতে, বিপ্লব আরম্ভ হয়ে গেছে। আমেরিকা থেকে ইয়োরোপ হয়ে এশিয়া আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়তে খুব দেরী নেই। এই বিপ্লবের জন্য সামাজিক দ্বন্দ্ব-বিরোধ, বণ্টন-উৎপাদন, প্রতিযোগিতা বৈরিতা নিয়ে চিন্তার প্রয়োজন নেই। শুধু প্রয়োজন ঘরে ঘরে টেলিভিশন সেট। মার্কস সম্পর্কে অনুকম্পা প্রকাশ করে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন যে, ভদ্রলোক মিছিমিছি পণ্যউৎপাদন, পণ্যবণ্টন নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। তিনি বুঝতে পারেননি যে, ইতিহাস তৈরী করছে মিডিয়া—জনগণ নয়। একটা জায়গায় কিন্তু মার্কস আর ম্যাকলুহানের দৃষ্টিভঙ্গীর মিল আছে। দুজনেই মনে করেন, সরল সহজ কৌমজীবন, যা সমাজের পরিবর্তনের জটিলতার মধ্যে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে—আবার বিবর্তিত হয়ে ফিরে আসবে: কিন্তু কিভাবে সেটা ঘটবে, তা নিয়ে দুজনের ধারণায় আশমানজমিন ফারাক। মার্কস-এর ধারণা তোমার জানা আর ম্যাকলুহানের

ধারণার কিছুটা আভাস অন্তত ইতিমধ্যে পেয়েছো। আরো একটু বিস্তার করে বলা যাক।

সমানাধিকারভিত্তিক কৌমসমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতার ফলে, আমরা জানি, প্রথম গণহিষ্টিরিয়ার উপযোগী পরিবেশ তৈরী হয়। আজ একচ্ছত্র পুঁজির কেন্দ্রীভূত শক্তির দাপটে এবং উৎপাদনশিল্পে অটোমেশন প্রয়োগের ক্রমবৃদ্ধির ফলে বিচ্ছিন্নতার ব্যাপকতা ও গভীরতা বেড়েই চলেছে। সাম্প্রতিক কালের শিল্পসাহিত্য মনস্তত্ত্ব সমাজতত্ত্বে তার নিদর্শন প্রচুর দেখতে পাবে। বুঝতে পারবে, আজকের খণ্ডিত সত্তা যন্ত্রাঙ্গ মানুষ কত বেশি অস্থির, চঞ্চল, ভয়ার্ত, বিদ্বিষ্ট। মনে হবে আজকের পরিবেশ গণ-হিষ্টিরিয়ার পক্ষে আরো বেশি উপযোগী। প্রযুক্তিবিপ্লব উৎপাদনে যে সামাজিকীকরণ নিয়ে আসছে, একচ্ছত্র মালিকানার পরিবর্তে সেই সামাজিকীকরণ ত্বরান্বিত করা বিচ্ছিন্নতা বিলোপের আবশ্যিক প্রাথমিক শর্ত। পরবর্তী শর্ত আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং পরিকল্পনা থেকে উৎপাদন পরিবেশনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। ব্যক্তিসম্পত্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত সম্প্রদায়, গিল্ড, উপজাতি, জাতি, রাষ্ট্র এযাবত বিচ্ছিন্নতাবোধকে প্রতিরোধ করে এসেছে এবং আংশিক সাফল্যলাভও করেছে। এ ব্যাপারে আমাদের দেশে বর্ণাশ্রম প্রথার সাফল্যের কথাও স্মরণীয়। বিচ্ছিন্নতাপ্রসূত নঙর্থক ধ্বংসাত্মক মানসিকতাকে সাময়িকভাবে অবরুদ্ধ করলেও, উচ্চতর সদর্থক স্তরে নিয়ে যেতে পারেনি। সমানাধিকার-ভিত্তিক কমিউনিষ্ট সমাজব্যবস্থা ছাড়া, যার সঙ্গে আদিম কৌমসমাজের খানিকটা মিল আছে, অন্য কোনো পরিবেশই বিচ্ছিন্নতাবিলোপে সক্ষম নয়। মানুষের মুক্তি, জৈব স্বভাব অতিক্রমণ, 'ট্রানসেনডেনটাল' অবস্থায় উত্তরণ, কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা ছাড়া সম্ভব নয়। কিন্তু তার আগে সমাজব্যবস্থার কয়েকটি স্তর পার হতে হয়। বর্ণ ধর্ম জাতি দেশ রাষ্ট্রের গণ্ডী ক্রমশ অতিক্রম করে মানুষ আজ প্রজাতির একজন বলে পরিচয় দেবার মত অবস্থায় এসে পৌছেচে, আবার অন্যদিকে এর বিপরীতে আত্মক্ষয়ী সংগ্রামে প্রজাতিবিলুপ্তির সম্ভাবনাও আজ প্রায় সমানভাবে বিদ্যমান। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে প্রত্যেকের লড়াই অথবা সবার জন্যে সকলের লড়াই—কোনটি মানুষ বেছে নেবে? শেষেরটি বেছে নেবে,—এই আশা আমরা নিশ্চয়ই পোষণ করব। এই হল মার্কসবাদীদের ধারণা।

ম্যাকলুহানও আদিম কৌমসমাজে প্রত্যাবর্তন করতে চান। তার জন্যে

উৎপাদন সম্পর্কের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন না। তাঁর ধারণা, মিডিয়া বিপ্লব মানুষকে স্বর্গরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে। টেলিভিশনের মাধ্যমে একই ধরনের অভিভাবন দিয়ে ধর্ম-জাতি-রাষ্ট্র-ভাষাকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্নতা নিরসন করে তিনি মানুষের প্রজাতিত্ব ও একত্ববোধকে জাগাতে চান। মার্কস চেয়েছিলেন গণচেতনাকে উন্নততর স্তরে নিয়ে গিয়ে সৌভ্রাত্রবোধ ও নতুন মানবিক সম্পর্ক স্থাপন করতে আর ম্যাকলুহান চেয়েছেন মানুষের অবচেতনাকে সম্প্রসারিত করে তার সামাজিক চেতনা, ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা, বিবেকের তাড়না, বিচারবুদ্ধির অবলুপ্তি ঘটাতে। জনশিক্ষার বিস্তার ও গণচেতনার বৃদ্ধির ফলে আজ মানুষ নিজের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ নিজে করতে চায়। ম্যাকলুহানের মতে এর ফলে বিচ্ছিন্নতা, আক্রমণমুখিনতা, হিংস্রতা, এককথায় গণহিষ্টিরিয়ার ব্যাপকতা বাড়বে, মানুষের স্বর্গরাজ্যে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হবে না। তিনি চান অনুগামিতা, নির্ভরতা, নিয়মানুবর্তিতা। "Electromagnetic technology requires utter human docility and quiescence of meditation such as befits an organism that now wears its brain outside the skull and its nerves outside its hide". তিনি চান অভিভাবনের সাহায্যে মানুষের প্রগতিপ্রবণতাকে রুদ্ধ করতে, মানুষকে সম্মোহিত রাখতে। মিডিয়ার মালিক ও পরিচালকদের ওপর পৃথিবীর রক্ষণাবেক্ষণের সব ভার তুলে দিয়ে দুনিয়ার অন্য সকলে শান্ত মনে প্রসন্নচিত্তে টেলিভিশনের পর্দার দিকে তাকিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধের আনন্দে আপ্লুত হয়ে গেলে ম্যাকলুহান নিশ্চিন্ত বোধ করেন। এরিক ফ্রমের মত তিনিও বোধ হয় মনে করেন, মানুষের মধ্যে বুদ্ধিযুক্তিনির্ভর প্রগতিপ্রবণতা নেই। শুধু অস্তিত্বের সমস্যা সমাধানের বাধ্যকারী অন্ধ-শক্তির তাড়নায় সে কাজ করে চলে। "Man has no innate 'drive for progress', but he is driven by the need to solve his existential contradiction" ....(E. Fromm : The Application of Humanist Psychoanalysis to Marx's Theory, Socialist Humanism, New York, 1966, p 233)। এরিক ফ্রমের মত তিনিও বোধ হয় মনে করেন, আজকের হোমো-কনসিউমেন্স (Homo-consumens)-এর মানসিকতা সমাজব্যবস্থা ও উৎপাদনসম্পর্ক-নির্ভর নয়, তার সত্তার বিকাশের একটি পর্ব।

ম্যাকলুহান বোধহয়, মনে করেন আজকের সমাজ-বিচ্ছিন্নতার জন্য দায়ী বর্ণমালাভিত্তিক শিক্ষাসংস্কৃতির ফলে মনের একরৈখিক বৃদ্ধি। "Homo-consumens is the man whose main goal is not primarily to own things, but to consume more and more, and thus to compensate for his inner vacuity. passivity, loneliness and anxiety".... (p 236—Ibid). নতুন মিডিয়া টেলিভিশন সর্বাত্মক বৃদ্ধি ও সমন্বয়ের পথ দেখিয়েছে; সেই পথেই মহামানবের মিলন ক্ষেত্র গড়ে উঠবে, মানুষ মুক্তির সন্ধান পাবে। মারকিউসের একমাত্রিক (one dimensional) মানুষ আর ম্যাকলুহানের একরৈখিক মানসিকতার মধ্যে খুব বেশি তফাৎ আছে কি? আছে। মারকিউস মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে লুম্পেন-বিপ্লবকে প্রাধান্য দিয়েছেন, আর ম্যাকলুহান প্রাধান্য দিয়েছেন মিডিয়া-বিপ্লবকে। একজন বিপ্লবকে গণহিষ্টিরিয়ার পর্যায়ে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন; অন্যজন অভিভাবন-সম্মোহনের সাহায্যে হিষ্টিরিয়াকে প্রশমিত করতে চেয়েছেন। আর এক জায়গায়—মার্কসবিরোধিতায়, এঁদের তিনজনেই (ফ্রম, মারকিউস্ ও ম্যাকলুহান) একমত।

মার্কস উন্নত ধরনের কমিউনিষ্ট সমাজ গড়তে চান। ম্যাকলুহান আদিম কমিউনিজমে ফিরে যেতে চান: যেখানে সমানাধিকার বড় কথা নয়, সমধর্মী জাদু-প্রভাবিত মানসিকতা আসল কথা। যেখানে মানুষ পদে পদে প্রকৃতির নিষ্ঠুর শক্তির কাছে পরাভূত, যেখানে খাদ্যস্বল্পতার দরুণ একদল অন্য দলের শিকার ও খাদ্য, যেখানে চেতনা অর্ধস্ফুট, বিচারবুদ্ধি অপরিণত—সেখানে ফিরিয়ে নিতে চান তিনি মানুষকে। তাঁর বক্তব্য একটু গভীরভাবে অনুধাবন করলেই বুঝতে পারবে, অসলে তিনি 'ষ্ট্যাটাস কো' বজায় রাখতে চান। নিজেদের, অর্থাৎ শিল্পোন্নত দেশের মানুষদের, তিনি আদিম স্তরে নিতে চান না নিশ্চয়ই, কেননা তাহলে তাঁর বিচ্ছিন্নতাবিলোপের বিশল্যকরণী টেলিভিশনকে ফেলে যেতে হবে। তিনি চান আফ্রিকা এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলোকে জাদুমন্ত্রে আচ্ছন্ন রাখতে। তাঁর কাছে সবচেয়ে অভীপ্সিত অবস্থাতে তিনি তাদের রেখে দিতে চান, যাতে তারা 'live happily in the tribal trance of resonating word magic and the web of kinship'. কিন্তু আমার মনে হয়, আফ্রিকা এশিয়ার মানুষ বিশশতকের এই অরফিউসের বাঁশী শুনে মোহিত হবে না।

জাতিগত বর্ণগত বিচ্ছিন্নতা, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার দরুণ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পশ্চাৎগামিতা, তারা অন্তভাবে দূর করতে বদ্ধপরিকর। তারা জাদুর যুগের আদিম সমাজে ফিরে যেতে চায়না, মিডিয়াবিপ্লব তাদের বিচ্ছিন্নতাবোধ দূর করতে পারবে না। "This Humanity cannot do otherwise than define a new humanism both for itself and for other ……. We, however, consider that the mistake, which may have very serious consequences, lies in wishing to skip the national period" (Franz Fannon : The Wretched Of the Earth : Penguin Books, 1967, p 198).

থিয়েটার, সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন যে কোনো ধরনের গণমাধ্যমই আজকের সমাজ ব্যবস্থায় খুব কম ক্ষেত্রেই জনগণের হাতে, ক্ষমতাচক্রই এ-সবের পরিচালক। জনগণকে পোষ মানানোর কাজেই গণমাধ্যমের ব্যবহার।

তা সত্ত্বেও নৈরাশ্যের কারণ দেখছি না। সবদেশের মানুষ আজ নিজেদের সার্বিক বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে সচেতন। তাদের সংযুক্তির আকুতি ও ব্যাকুলতা গণহিষ্টিরিয়াকে সুস্থ গণআন্দোলনের পথে নিয়ে যাবে, প্রজাতিকে টিঁকিয়ে রাখার সহজাত প্রবৃত্তি শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে, নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক স্তর অতিক্রম করে (অতিক্রমণের গতিবেগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিস্তার দৌলতে ক্রমবর্ধমান) সব মানুষ মিলে সত্যিকারের মানবসমাজ গড়ে তুলবে।